দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ

হেনা চৌধুরী, এম, এ

১৯৬১

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্স্

কলকাতা

মুদ্রক :

বুক সারভিস প্রাইভেট লিমিটেড

২২ ফরডাইস লেন, কলকাতা ১৪

প্রকাশক :

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

[পরিবেশক : বুক সারভিস প্রাইভেট লিমিটেড]

৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, তেতলা, কলকাতা ১২



উৎসর্গ

আমার বাবা

৺ সুরেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরীর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করলাম।

-গ্রন্থকার

১০৯/২০ হাজরা রোড,
কলকাতা ২৬

সূচীপত্র

স্মৃতি

সুভাষচন্দ্রের পত্র

Censored and passed

3. 3. 26.

জনসাধারণের পাঠের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় সম্বন্ধে কিছু লেখার সাহস আমার এখনও হয় নাই। কখনও হইবে কিনা জানি না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হয় না।

তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বৎসর কাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যে চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি? বিশেষতঃ, দেশবন্ধু সম্পর্কে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্ততঃ আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিবেন এবং তাঁর ব্রত উদযাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মর্ত্যলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না।

দেশবন্ধু নিজের কোষ্ঠীতে খুব বিশ্বাস করিতেন। আমি অবিশ্বাসী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস যে আমার মনের উপর সংক্রামক বিস্তার করে নাই একথা বলিতে পারি না। আমার যতদূর স্মরণ আছে, তিনি বহুবার আমায় বলিয়াছেন যে, সমুদ্রপারে দুই বৎসর কারাবাস তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে। কারাবাসের অবসানে তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিবেন, কর্তৃপক্ষের সহিত মিটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন। তারপর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। সত্যকথা বলিতে কি, সমুদ্রপারে আসার পর তাঁহার কোষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে সর্বদা আশঙ্কা যে তাঁহাকেও আসিতে হয়, কিন্তু সে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা শতগুণে দারুণ দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার, তথা ভারতের ভাগ্যে ঘটিল।

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেকদিন দেখা হইবে না।"

তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের শিগগির খালাস করে আনছি।"

হায়! তখন কে জানিত যে, ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না।

তাঁহার সেই শেষ স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ কি? এ প্রশ্নের সমাধান করিবার অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে, সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না।

যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মীতার বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা পর্যন্ত এই বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁহাদের উপকার ও মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন?

জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না, একথা একশোবার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুচরবর্গ এবং তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারিতেন? দেশবন্ধু জানিতেন, তাঁহার অহিংস সংগ্রামে এমন কতকগুলি সৈনিক আছে, যাহাদের উপর তিনি সর্বাবস্থায় নির্ভর করিতে পারেন। আজ আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি যে, দেশবন্ধুর পুণ্যজীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত তাঁহার শান্তিসেনা অটল অচলভাবে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে।

একদিন তাঁহার একজন নিকট-আত্মীয় তাঁহার কোন সহকর্মীর দোষ ও ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলেন, "I hate him." (আমি তাহাকে ঘৃণা করি।) তিনি অন্তরে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "আমার মুস্কিল, আমি তাকে ঘৃণা করতে পারি না।" ইহা ব্যতীত, বহিরঙ্গ লোকদের সহিত তাঁহার সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে অনেক ঝগড়া বিবাদ করিতে হইত।

এইরূপ বিবাদের সময় আমি স্বয়ং কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার কত গভীর বেদনা, তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার কত লাঞ্ছনা!

তাঁহার কারামুক্তির পর কলিকাতায় ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দনের জন্য

সম্ভ্য করেন। অভিনন্দনপত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তির ও ভালবাসার পূর্ণ অর্ঘ্য যখন তাঁহার নিকট নিবেদিত হইল, তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি ছিলেন চিরনবীন চিরতরুণ, তাই তরুণের বাণী তাঁহার মর্মে গিয়া আঘাত করিল। তিনি যখন সভায় অভিনন্দন পত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার বহিতেছে। নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাঙ্গলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বেশীদূর বলিতে পারিতেন না। উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। তিনি নির্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুই গণ্ড বাহিয়া পবিত্র অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন। তরুণেরাও কাঁদিল।

১৯২১ ও ১৯২১ সালে ৮ মাসকাল দেশবন্ধুর সহিত কারাগারে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সরকারের কৃপায় সেই ৮ মাসকাল আমি তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ ও অধিকার পাইয়াছিলাম, ইহা আমার পক্ষে চরম গৌরবের বিষয়। ১৯২১ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আমি মাত্র ৩।৪ মাস কাল তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলাম। সুতরাং সেই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভালরকম বুঝিবার সুযোগ আমার হয় নাই। তারপর যখন ৮ মাসকাল একত্রে বাস করিবার সুযোগ ঘটিল, তখন খাঁটি মানুষটাকে চিনিতে পারিলাম।

দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন, একথা আমি জেলখানায় ভালরকম বুঝিতে পারি। প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের পাহারার জন্য সঙ্গীনধারী গুর্খা সৈন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল একদিন সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন যে, গুর্খা সৈনিকের পরিবর্তে একজন রুলধারী হিন্দুস্থানী সেপাহী উপস্থিত। অমনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হে সুভাষচন্দ্র! শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী। আমরা কি এতই নিরীহ?" চেষ্টা করিয়া অথবা ভাবিয়া চিন্তিয়া রসিকতা করিতে হইত না। পর্বত নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার রসিকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছুটিত।

ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান ছিল এবং ইংরাজী কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। কারাগৃহে ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলি তিনি বারংবার পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সাহিত্য অবতারণা করিয়া তিনি যেরূপ সাহিত্যকে সজীব করিয়া

সর্বসাধারণের উপভোগের বস্তু করিতে পারিতেন, এরূপ কয়জন সাহিত্যিক করিতে বা পারিতেন, তাহা আমি জানি না।

দেশবন্ধুর নিন্দা ও কুৎসা না করিয়া যাঁহারা জলগ্রহণ করেন না, এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, বিপদের সময় তাঁহার শরণাপন্ন হইতে। এই জাতীয় কোন ভদ্রলোক ২০০ টাকার দাবী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন, "আমার তহবিলে মাত্র ৬০০ টাকা আছে, আমি কি করিয়া ২০০ টাকা দিই ?" ভদ্রলোকটি জিদ ধরিলেন ; তিনি বিলম্ব না করিয়া ২০০ টাকাই তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলেন।

কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময় অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। ভারতের জাতীয়তা বিষয়ক পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক পুস্তক আনাইয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি পুস্তকখানি লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সময়ের সংকীর্ণতার জন্য তিনি পুস্তকখানি জেলখানায় থাকিতে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিতে তাঁহাকে পুনর্বার কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। সে সময়ে রাজনীতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে তাঁহার সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল। রাজনীতি, কি ধর্মনীতি, কি অর্থনীতি জীবনের কোনক্ষেত্রেই মতের অনুসরণ বা অনুকরণ পছন্দ করিতেন না।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল ভারতের সকল ধর্মসম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের সাহায্যে সকল বিবাদ বিসম্বাদ দূর হইবে এবং জাতি ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে।

ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। অথচ সেই দেশবন্ধুই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসিতেন যে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। সেইজন্য তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে পারিতেন। দেশবন্ধু ধর্মমত হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল।

ভারতের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, একথা যেরূপ দেশবন্ধু জোর গলায় প্রচার

করিয়াছিলেন, প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না।

মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিস্টার, উদার প্রেমিক, পরম বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ, ও দিগবিজয়ী বীর হইতে পারে—এ প্রশ্ন স্বভাবতই সকলের মনে উদয় হয়। আমি নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির রক্ত সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙালী জাতির উৎপত্তি। রক্ত সংমিশ্রণেই বাঙালীর প্রতিভা এত সর্বতোমুখী এবং বাঙলার জীবন এত বৈচিত্র্যপূর্ণ। আর্যের ধর্মপ্রবণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও ভক্তিমত্তা, মঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল, অনুচিকীর্ষা ও বাস্তববাদ বাঙ্গলার সাগর সংগমে আসিয়া মিশিয়াছে। বাঙালী যে এক সংগে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ভাবুক, মায়াবাদ-বিদ্বেষী ও আদর্শবাদী, অনুকরণপ্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম, তাহা এই রক্ত সংমিশ্রণের ফল।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন বাঙালীকে তার্কিক ও নৈয়ায়িক করিয়াছে—এই প্রকৃতি দেশবন্ধুর চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে বড় ব্যারিস্টার করিয়া তুলিয়াছিল। খুব বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ন্যায় তিনি চুলচেরা তর্ক করিতে পারিতেন এবং অবিরাম বাক্যস্রোতের দ্বারা শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। ২।৩ শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে বড় নৈয়ায়িক হইতেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

দার্শনিক মত হিসাবে তিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদকে সবচেয়ে খাঁটি বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অনেক বিষয়ে সন্ন্যাসীর মত হইলেও সন্ন্যাস তাঁহার ধর্ম ছিল না। ভগবান যেরূপ সত্য, তাঁহার লীলাও তদ্রূপ সত্য; ব্রহ্ম সত্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়। অতএব ভগবানকে পাইতে হইলে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এসব বর্জন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। মনুষ্য হৃদয় নিত্য বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে জীবের সহিত ভগবানের, রাধার সহিত কৃষ্ণের অনন্ত লীলা চলিয়াছে। তিনি রসময়, তাই সকল রসের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। এরূপ মত যিনি পোষণ করেন, তিনি যে নেতিমার্গ হইতে পারেন না, একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ, দেশবন্ধু বিশ্বসংসারকে তথা মনুষ্য-জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

যে তন্ত্রের প্রভাবে বাঙালী শক্তিপূজা শিখিয়াছে, সেই তন্ত্রের প্রভাবে দেশবন্ধু অসাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াছিলেন। আদ্যাশক্তিকে সাধক মাতৃরূপে

আরাধনা ও পূজা করিয়া থাকে। বাঙালীর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বলিয়া বাঙালী জাতি হিসাবে মায়ের অনুরক্ত এবং ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিতে ভালবাসে।

দেশবন্ধুও মাতৃরূপের অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁহার মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আলিপুর জেলে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রায়ই তিনি আমাদের পড়িয়া শুনাইতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি বিভোর হইয়া যাইতেন। তখনই তাঁহাকে দেখিলে বোঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কি গভীর!

বাঙ্গলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গলার প্রাকৃতিক রূপে, বাঙ্গলার সাহিত্যে, বাঙ্গলার গীতিকবিতায়, বাঙালীর চরিত্রে সেই বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—একথা দেশবন্ধু জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না।

দেশবন্ধু তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে বাঙলাকে ভুলিয়া যাইতেন না বা কেবল বাঙলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না।

দেশবন্ধু বলিতেন, 'বাঙলাকে স্বরাজ আন্দোলনের অগ্রণী হইতে হইবে।' আর একটি কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বলিতেন, 'ভারতবর্ষের কোন আন্দোলন বাংলাদেশে চালাইতে হইলে তার উপর বাঙলার ছাপ দিতে হইবে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন বাঙলায় চালাইতে হইলে আগে বাঙলার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে।"

তিনি যখন যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন তাহা সাধন করিয়াছেন—তিনি দুর্বার বিক্রমে তখন যে পথে চলিতেন, কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারিত না। সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ন্যায় তিনি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার বেগে আপনার আদর্শের পানে ছুটিয়াছেন। তিনি যখন যাহা চাহিতেন, সমস্ত মনপ্রাণ ও বুদ্ধি দিয়া চাহিতেন। যাহা চাহিতেন তাহা পাইবার জন্য একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। পর্বতপ্রমাণ অন্তরায়ও তাঁহাকে ভীত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। নেপোলিয়ান যেমন বলিয়াছিলেন—"There shall be no Alps," তিনিও সকল বাধাকে সেইরূপ তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। কি সম্বল লইয়া তিনি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশে ও কাউন্সিল জয়ের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এসংবাদ যিনি জানেন, তিনিই এ উক্তির সমর্থন করিবেন। আমরা কোনপ্রকার অসুবিধার বা বাধার কথা তুলিলে তিনি বলিতেন, "তোমরা

একেবারে নির্ভরশা।" আমারও কাজ ছিল যেখানে কোনপ্রকার বিপদ বা অসুবিধার আশঙ্কা সেই কথাটি তুলিয়া ধরা। তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন, "Yoo young old man."

· জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তাঁহার ছিল এক ধ্যান, এক চিন্তা—স্বদেশসেবা এবং সেই স্বদেশসেবা তাঁহার ধর্মজীবনের অঙ্গস্বরূপ।

আলীপুরের বোমার মামলার অরবিন্দকে সমর্থনকালে দেশবন্ধু ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন :—

"He will be looked upon as the poet of patriotism, the prophet of Nationalism and the lover of humanity."

এই কথাগুলি কি দেশবন্ধু সম্পর্কেও প্রযোজ্য নয়? (সংক্ষেপিত)

আশীর্বাদ

শ্রীমতী হেনা চৌধুরীর লিখিত আমার স্বামীর জীবনকথা পড়ে ভাল লাগলো।

লেখিকার অন্তরের আবেগময়ী ভাষা অন্তর স্পর্শ করে। সুভাষের লেখা উধৃতি দিয়ে আরম্ভ করাতে আমার খুবই আনন্দ হয়েছে।

সঠিক তথ্যপূর্ণ লেখিকার গ্রন্থ বাঙ্গলা আদরে গ্রহণ করুক, এই আমার অন্তরের আশীর্বাদ।

৫নং নফর কুণ্ডু রোড,
কলকাতা ২৬
২৭-৪-৭০

শুভার্থিনী
বাসন্তী দেবী

কল্যাণীয়া স্নেহের শ্রীমতী হেনা চৌধুরীর লিখিত পিতৃদেবের জীবন কথা পড়ে মুগ্ধ হলাম।

এ বইখানির বৈশিষ্ট্য যে চিরাচরিত ভূমিকা না দিয়ে তার স্থান নিয়েছে বাংলা ও বাঙালীর গৌরব পিতৃদেবের প্রিয়তম পুত্রপ্রতিম সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধাঞ্জলি। এরপর আর ভূমিকার প্রয়োজন নেই বলেই আমি মনে করি!

এ গ্রন্থের ভাষা সরল ও মধুর। আর সবচেয়ে মধুর হয়ে ফুটে উঠেছে লেখিকার অন্তরের শ্রদ্ধা ও স্বদেশ প্রেম।

সঠিক তথ্যপূর্ণ এ বইখানি বাঙালীর চিত্ত স্পর্শ করে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হোক্, এ প্রার্থনাই করি।

অপর্ণা দেবী

মুখবন্ধ

"আমি হয়তো কাল মরিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইব, কিন্তু আমার প্রাণের ঠাকুরের কাছে আকুল প্রার্থনা করি যে, আবার যদি জন্ম হয়, তবে যেন আমার নিপীড়িত লাঞ্ছিত, অস্পৃশ্য চণ্ডাল নামে অভিহিত এইসব ভাই-ভগ্নীর মাঝেই জন্মগ্রহণ করিতে পারি।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এই ছিল অন্তিম কামনা। দেশকে তিনি ভালবেসেছিলেন—ভালবেসেছিলেন দেশের উচ্চনীচ ধনীদরিদ্র প্রতিটি মানুষকে। বিশেষ করে সমাজে অবহেলিত ও নিপীড়িত মানবতার প্রতি তাঁর হৃদয়ে ছিল সুগভীর বেদনা ও মমতা।

জাতির অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ে আজ প্রয়োজন—নতুন পথের। সুভাষচন্দ্র বলেছেন—অতীতকে অস্বীকার করে নতুন সৃষ্টি করা যায় না, অতীতের সৌধের ওপরেই গড়ে ওঠে ভবিষ্যতের ইমারত। আমাদের সেই অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে গেলে বাঙলা ও বাঙালীর গৌরব ও প্রিয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অমৃতময় জীবন ও বাণীকে অস্বীকার করা যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর মত, পথ ও দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন আজকের ভারতবর্ষেও এতটুকু কমেনি।

দেশবন্ধুর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবীর সম্মতি ও শুভেচ্ছা নিয়ে শুরু করলাম পথ চলা—তাঁর প্রতি রইল আমার সুনিবিড় শ্রদ্ধা। বড় কঠিন ব্রত! মাসের পর মাস কেটে গেল—এই মহাজীবনের সুনিবিড় ছায়ায়—তাঁর দেশপ্রেম, ত্যাগ, সাহস আমাকে মুগ্ধ করল! অভিভূত হয়ে গেলাম।

চলার পথে পেলাম লেখিকা-জীবনের অন্যতম বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশ্যামল মিত্রের (নালন্দা প্রেসের স্বত্বাধিকারী) আন্তরিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁর কাছ থেকে সাহস ও উৎসাহ না পেলে এই গুরু-দায়িত্ব সম্পাদন করা আমার দ্বারা সম্ভবই হতো না। তবে 'ধন্যবাদ' দিয়ে বা 'কৃতজ্ঞতা' জানিয়ে তাকে আমি ছোট করব না। আমি বিশ্বাস করি, বাবা-মা'র মত প্রকৃত বন্ধুর ঋণও কোনদিন শোধ হয় না। তাঁকে ধন্যবাদ দেবার ভার দিয়ে গেলাম বাঙলাদেশের প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের (অবশ্য যদি তাঁদের এ গ্রন্থ ভাল লাগে)।

এর পরই অন্তরের শ্রদ্ধা-ভালবাসার সংগে যাঁর নাম স্মরণ করতে হয়, তিনি দেশবন্ধুর প্রিয়কন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী। তাঁর সম্পর্কে লিখতে গেলে প্রথমেই বলবো যে দেশবন্ধুর মত তিনিও মানুষের দোষগুণ বিচার না করে মানুষকে ভালবাসেন। তাঁর স্নেহের ঋণ জীবনে শোধ হবার নয়। মাসাধিক-কাল ধরে তিনি আমার Script যত্ন করে দেখে দিয়েছেন। তার গ্রন্থ 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' থেকে উধৃতি নেবার অনুমতি দিয়েছেন। মায়ের মত তিনি আমার সব আবদার পূরণ করেছেন, ভুলত্রুটি দেখলে বকেছেন—অন্তরের নিবিড়তায় তিনি আমার আত্মীয়ের চেয়েও আপন হয়ে গেছেন।

এর পরই যাঁর নাম শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করতে হয় তিনি কবিশেখর কালিদাস রায়। কালিদাস রায় দেশবন্ধুর সাহচর্যে এসেছেন—তাই সে-সময়কার দেশবন্ধুর সাহিত্য জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা আমায় বলেছেন। আমার গ্রন্থের 'কবি ও সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন'-এর script তিনি শুনেছেন। ছেলেবেলা থেকেই এই কবির প্রতি ছিল আমার গভীর শ্রদ্ধা। আজ সে পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠল তার আন্তরিক স্নেহে,—তাই ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা নয়—রইলো শুধু প্রণাম কবিশেখরের উদ্দেশ্যে।

আধুনিক কবি ও বন্ধু শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ আমার এ গ্রন্থে একটি সুন্দর কবিতা দিয়েছেন ;—তাঁর এ কৃতজ্ঞতা জীবনে ভুলবার নয়।

শ্রদ্ধেয় ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীসন্তোষ কুমার বসুও নানা তথ্য দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। ডঃ মজুমদারকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর সন্তোষবাবু আমাকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করেন ; তাঁর উদ্দেশে রেখে গেলাম ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কলকাতা করপোরেশনের অফিস (৫নং সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোড) ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দকে। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই মীরা পাকড়াশী, সুভাষ বাবু ও মিঃ চ্যাটার্জীকে—বইএর ব্যাপারে তাঁরা যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন, তার তুলনা হয় না।

সবশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি—অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্সের শ্রদ্ধেয় ডঃ অসীম বর্ধনকে। পাণ্ডুলিপি সংশোধন, সম্পাদনা, পুনর্লিখন ও প্রুফ সংশোধনের কাজে এবং আরও নানা ব্যাপারে তিনি প্রকৃত বন্ধুর মত আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে এত অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব নেওয়া অন্য কোন প্রকাশকের পক্ষে কতটা সম্ভব হত

জানি না। তার এই প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, ভবিষ্যতেও তাঁর সংগে কাজ করবার প্রেরণা যোগাবে।

আর একজনের কথা না লিখলে অকৃতজ্ঞতা হয়ে যাবে—তিনি অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর শ্রীমতী উষা ভট্টাচার্য—যিনি দুর্যোগের দিনে বন্ধুর মত, দিদির মত সহায়তা করেছেন।

এরপর, বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকারা যদি আমার এ পরিশ্রমলব্ধ গ্রন্থটিকে প্রীতিভরে গ্রহণ করেন—তবেই বুঝব, বাঙালী আজও বেঁচে আছে। শুধু তাই নয়, আমার শ্রমকেও সার্থক মনে করবো।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ

প্রথম অধ্যায়

জন্মভূমি ও পিতৃপরিচয়

জন্মভূমির সঙ্গে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের সুগভীর নাড়ীর যোগ বিদ্যমান—তাই এখানে ভৌগোলিক তাঁর দেশকালের সীমানা হারিয়ে ফেলে সমগ্র বিশ্বের মানবকে এক অখণ্ড রূপ দান করেছেন। একটা জিনিষ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, মহা-পুরুষদের জীবনে জন্মভূমির প্রভাব খুবই বেশী। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় উনবিংশ শতাব্দীর নবযুগের অন্যতম পুরোধা কবি মাইকেল মধুসূদনের জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম ভালবাসার কথা। সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে বসে তিনি লিখে চলেছেন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী, স্মৃতিপটে জেগে উঠল 'কপোতাক্ষ নদ', বটবৃক্ষ, দ্বাদশ শিবমন্দির—জন্মভূমির এমনি আরও কত ছোটখাট জিনিস যা শাশ্বত রূপ লাভ করল তাঁর অমর লেখনীতে।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত তেলীরবাগ গ্রামের বিখ্যাত যদুনন্দন বংশে চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। পৈতৃক বাসভূমির প্রতি তাঁর অন্তরে যে কী সুগভীর দরদ, অপরিসীম মমতা এবং অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের ডোমসার অভিভাষণে: তিনি বলেছেন; "যে দেশেই যাই না কেন, যত বিদেশেই ঘুরিয়া বেড়াই না কেন, যখনই মনে করি আমি বিক্রম-

পুরবাসী তখনই প্রাণে প্রাণে একটা গর্ব অনুভব করি। বিক্রমপুর যে আমার শরীরের শিরায় শিরায় অস্থিমজ্জাগত। আমরা যে কিছুতেই ভুলিতে পারি না আমরা বিক্রমপুরবাসী। এই যে ভাব যাহা সকল চিন্তা, সকল সাধনার মধ্যে আপনাকে জানাইয়া দেয়, এই যে স্মৃতি যারা ফুলের গন্ধের সঙ্গে জড়ান গন্ধের মত আমাদের জীবনে জড়াইয়া আছে, এই ভাব ও স্মৃতিকে জাগ্রত দেবতার মত আমাদের হৃদয়মন্দিরে জাগাইয়া রাখিতে হইবে।

"যেমন সমগ্র বাংলাদেশের একটা চিরন্তন বাণী আছে, আমাদের বিক্রমপুরের সেইরূপ একটা বাণী আছে। আমরা কান পাতিয়া তাহাই শুনিতে চাই। সে বাণী শুধু আমাদেরই জন্য।

"শুনিয়াছি গ্রামে তুলার চাষ হইত, সূতা ও কাপড় তৈয়ারী হইত। আইরলের কাগজ এখনও পাওয়া যায়। যে শঙ্খশিল্প এখন ঢাকার গৌরব, বিক্রমপুর তাহার জন্মস্থান। আমাদের কুম্ভকারেরা হাঁড়ি পাতিল বানাইত ও তাহার সঙ্গে কত রকমের শত শত মূর্তি গড়িয়া তুলিত। সোনা রূপার কাজ বিক্রমপুরের গৌরব ছিল। স্থপতিশিল্পে আমাদের দেশ প্রধান ছিল। রাজনগরে সৌধরত্নমালা আমাদের স্বদেশবাসীরাই গাঁথিয়া তুলিয়াছিল। প্রস্তর শিল্পে আমাদের দেশে খুঁজিলে অপূর্ব ভাস্কর-কীর্তি এখনও পাওয়া যায়। যেসব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া কলাবিদেরা মোহিত হইয়া গিয়াছেন। আমাদের ঝিনুকের অলঙ্কারে আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্য ছিল। আমরা মাটির পুতুল, ন্যাকড়ার পুতুল দেশে দেশে ছড়াইয়া দিতাম, আমরা কাঁসার থালা ঘটি, বাটি দিয়া দেশ ভরিয়া দিতাম।

"আরও কত কি, ছিল কে জানে। সবই যেন স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকদের কাছে দাবী যে, তাঁহারা দেশের শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ কাহিনী আমাদের ভাল করিয়া শুনাইবেন।"

পিতৃভূমির ঐতিহ্য এবং গৌরব যে কতখানি তাঁর বুক ভরে রেখেছিল তার পরিচয় উপরোক্ত এই ভাষণ। পিতৃভূমিকে এমন নিবিড়

করে ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই স্বদেশমাতৃকার শৃঙ্খল-বেদনা তাঁর হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল, তাই তাঁর মুক্তিকামনায় আড়াই হাজার বছর আগে কপিলাবস্তুর রাজা সিদ্ধার্থ যেমন করে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু দেখে বিচলিত হয়ে সংসার ত্যাগ করে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হ'য়ে হয়েছিলেন বুদ্ধ, তেমনি করে চিত্তরঞ্জন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশমাতৃকার চরণে দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে হয়েছিলেন 'দেশবন্ধু'। এখানে তাঁর জীবনে মিশে আছে বুদ্ধের ত্যাগধর্মের সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর অবতার-পুরুষ চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম। মানুষের প্রতি সুগভীর প্রেমের ফলেই তিনি হয়েছিলেন তাঁদের নেতা। বাংলা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় অপরিসীম নেতৃত্বের ক্ষমতা আমরা দেখেছি পরবর্তীকালে তাঁরই হাতে গড়া এবং প্রিয়শিষ্য সুভাষচন্দ্রের মধ্যে, যিনি সুদূর আরাকান ও ইম্ফলে মুক্তিসেনা গঠন করে ব্রিটিশ রাজশক্তির ভিত্তিভূমিকে কম্পিত করেছিলেন। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

জন্মভূমি ও পিতৃ পরিচয়

এবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। দেশবিভাগের ফলে বিক্রমপুর আজ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত। কিন্তু এ দেশের প্রাচীন ইতিহাস সত্যই ঐতিহ্যপূর্ণ। এই বিক্রমপুর থেকে দেশেবিদেশে চালান যেত নানা বিলাসিতার দ্রব্য-সম্ভার, এ দেশ থেকেই গৌড়ীয় রীতির প্রচলন হয়েছিল সারা ভারতবর্ষে।

শুধু কি তাই। এর বুকে কান পাতলে আজও শুনতে পাওয়া যাবে কেদার রায় চাঁদ রায়ের বীরত্বের কাহিনী, এই পুণ্যভূমিতে জন্মেছিলেন দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান, শীলভদ্র, বীরসেন প্রভৃতি কত অসংখ্য জ্ঞানী গুণী মানুষেরা যাঁদের গৌরবের কথা ভেবে আজও গর্বে বাঙালী জাতির বুক ভরে ওঠে।

এই ইতিহাসপ্রধান দেশ এবং ঐতিহ্যপূর্ণ নগরী বিংশশতাব্দীর

বাংলামায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তান চিত্তরঞ্জন দাশের পৈতৃক বাসভূমি। মহত্ব, ঔদার্য, সৎসাহস, বিশেষ করে দানশীলতার জন্য তৎকালে এই দাশ-পরিবার সমাজে বিশেষ প্রাধান্য ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। চিত্ত-রঞ্জন তাঁর জীবনে অপরিসীম দানশীলতার প্রভাব এই বংশ থেকেই পেয়েছিলেন। কিন্তু যা তিনি পেয়েছেন তার অনেক বেশী দান করে গেছেন, এ পরিবার ধন্য হয়ে গেছে এমনি একটি ক্ষণজন্মা, সর্বত্যাগী, স্বদেশপ্রেমিক সন্তানকে লাভ করে। চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বরের তিন ছেলে কালীমোহন, দুর্গামোহন এবং ভুবনমোহন। কাশীশ্বরের জেঠতুত ভাই জগবন্ধুর কোন পুত্র সন্তান ছিল না বলে তিনি ছোটছেলে ভুবনমোহনকে জগবন্ধুর কাছে দত্তক দিয়েছিলেন। এ ঘটনা থেকেই এ পরিবারের সুগভীর ভ্রাতৃপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তীকালে আমরা দেখি ভুবনমোহনের তিন ছেলে হলেন—চিত্ত রঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন এবং বসন্তরঞ্জন। তিনি আপন কনিষ্ঠ পুত্র বসন্ত রঞ্জনকে বড় ভাই কালীমোহনের নিকট দত্তক দেন। বসন্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু হলে চিত্তরঞ্জন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "ওকে দত্তক দেওয়া হয়েছিল তাই ও অভিমান ভরে চলে গেল।"

কাশীশ্বর—দানশীলতার জন্য কাশীশ্বরের খ্যাতি ছিল দেশ জুড়ে। তিনি সরকারী উকিল ছিলেন এবং উপার্জন ভালই করতেন, কিন্তু যা আয় করতেন তা সবই ব্যয় হতো অতিথিসেবায়, আর পথিকদের পরিচর্যায়। শুধু ব্যয় করেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিজে অতি-থির ছদ্মবেশে অতিথিশালায় উপস্থিত হয়ে দেখতেন তাঁদের উপযুক্ত পরিচর্যা হচ্ছে কিনা; এ প্রসঙ্গে একটা গল্প প্রচলিত আছে—একদিন দুপুর রাত্রি, তিনি নৌকা করে ছদ্মবেশে গিয়ে অতিথিশালায় সংবাদ পাঠালেন যে একজন অতিথি এ রাতের মত অতিথিশালায় আশ্রয় চায়। কিন্তু কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করল না। এমন কি অতিথিশালায় স্থান পর্যন্ত দিল না। তিনি কোনরূপ আত্মপরিচয় না দিয়ে সে রাত্রের মত ফিরে এলেন। পরের দিন কর্মচারীদের ডেকে

এ ঘটনার জন্য সাবধান করে দিলেন। আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেন, অতিথি নারায়ণ তাই তার সেবার মধ্য দিয়েই তো মানুষ ভগবানের সেবা করে। এ সত্যের উপলব্ধি আমরা দেখেছি বিবেকানন্দের মধ্যে, দেখেছি চিত্তরঞ্জনের মধ্যে চিত্তরঞ্জন তাঁর মার শ্রাদ্ধের দিন গরীব-দুঃখী-দের সঙ্গে একাসনে খেতে বসেছিলেন। দিক্‌পাল ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের এই মানবপ্রেম সেদিন সবাইকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরা আজও তাঁর আতিথেয়তার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে অশ্রুসজলনয়নে স্মরণ করেন। চরিত্রের এ গুণটি চিত্ত-রঞ্জন পিতামহের নিকট থেকেই পেয়েছিলেন বললে অন্যায় হবে না।

জগবন্ধু—ভুবনমোহনের পালক পিতা জগবন্ধু রাজসাহী জেলার উকিল ছিলেন এবং তিনি যথেষ্ট রোজগার করতেন, কিন্তু ভাই কাশী-শ্বরের মত তিনিও আপন উপার্জনের অধিকাংশ অর্থই ব্যয় করতেন গরীব আত্মীয়স্বজনদের জন্য এবং অতিথিদের সেবায়।

জগবন্ধু জ্ঞানানুরাগী এবং সুকবি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর জীবনে কবিত্বশক্তি এই পিতামহের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

তৎকালে জগবন্ধু দাশ রচিত 'নারায়ণ সেবা' এবং 'হরির লুটের পুঁথি' পূর্ববঙ্গের অনেক গৃহে অতি সমাদরে পাঠ করা হ'তো।

ভুবনমোহন (পিতা)—চিত্তরঞ্জনের বাবা ভুবনমোহন দাশ কলকাতা হাই-কোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এটর্নী ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন তিনি। কেস সাজাবার ক্ষমতা তাঁর ছিল অদ্ভুত। পরবর্তীকালে পুত্র চিত্তরঞ্জন পিতার নিকট হতে এই গুণটি লাভ করে আইনজীবিগণের মধ্যে রথীশ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন।

ভুবনমোহনের চরিত্র ছিল তেজস্বী ও নির্ভীক। ঊনবিংশ শতা-ব্দীর বাংলাদেশে যে পাশ্চাত্য প্রভাবের ঢেউ সমগ্র শিক্ষিত বাঙালীর জীবনের ভিত্তিমূলকে ধ'রে নাড়া দিয়েছিল, তার প্রভাব ভুবনমোহনের জীবনকে তাঁর আদর্শ ও নিষ্ঠা থেকে একতিল বিচ্যুত করতে পারেনি।

মনে প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। সাহেবিয়ানা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না।

ভুবনমোহন এবং তাঁর তুই ভাই কালীমোহন এবং তুর্গামোহন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তুর্গামোহন উত্তোগী হয়ে সে যুগে বরিশাল জেলায় তাঁর বিমাতার বিবাহ দেন। এই ঘটনা নিয়ে সারা দেশময় আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ভুবনমোহনের দাদা কালীমোহন এই ঘটনার পর স্ত্রীর গঞ্জনার বাধ্য হ'য়ে প্রায়শ্চিত্ত করে ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করলেন।

চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও ধর্ম নিয়ে কোনদিন কোনরকম গোঁড়ামি তাঁর মনে স্থান পায়নি। তিনি মনোযোগ সহকারে আমাদের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন, কারণ প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম তো আমাদের শাস্ত্রকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। সর্বধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শেখাই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় ধর্ম, এই ছিল তার অন্তরের বাণী। তিনি বলতেন, "ধর্মভাব আসে মানুষের অন্তর থেকে, ভূ-সম্পত্তির মত ধর্ম কখনও পিতা থেকে পুত্রে বর্তান উচিত নয়।" অতএব হিন্দুর ছেলে হ'লেই যে হিন্দু, ব্রাহ্মের ছেলে হ'লেই যে ব্রাহ্ম হতে হবে এ-মত তিনি মানতেন না। তিনি বলতেন, "পিতামাতার কর্তব্য সন্তানদের ধর্মশিক্ষায় উদারভাবে শিক্ষিত করা। প্রাপ্তবয়সে যদি তারা তাদের ধর্মমত বেছে নেয় তবে পিতা-মাতার তাতে বাধা প্রদান করা উচিত নয়।" ধর্ম সম্পর্কে তাঁর এই মহান্ আদর্শের প্রভাব যে পরবর্তীকালে পুত্র চিত্তরঞ্জনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তা আমরা চিত্তরঞ্জনের জীবনে দেখেছি।

চিত্তরঞ্জন নিজে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করেছিলেন এবং বিয়ের সময় 'আমি হিন্দু নই' একথা বলতে তাঁর খুবই কষ্ট হয়েছিল। তাই পরবর্তী জীবনে এর প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন নিজের তুই মেয়ে এবং এক ছেলেকে হিন্দুমতে বিয়ে দিয়ে। জাতের বাধাও তিনি মানতেন না; কারণ তাঁর তুই মেয়ের মধ্যে একজনকে কায়স্থ এবং অপরজনকে ব্রাহ্মণের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন তিনি। আসলে নানাবিধ

সামাজিক সংকীর্ণতায় ঘোরতর বিরোধী ছিলেন তিনি। পিতামাতার শ্রাদ্ধও তিনি করেছিলেন বৈদিক মতে। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই কীর্তনের প্রতি খুব গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন তিনি এবং ধীরে ধীরে বৈষ্ণবধর্ম তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আসলে মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের মধ্যেই তিনি মানুষের মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনুকূল ঠাকুরের মা মনোরমা দেবীর নিকট হ'তে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এইরূপে ব্রাহ্ম পিতার পুত্র হ'লেও পিতার উদার ধর্ম চিত্তরঞ্জনকে আপন ধর্মমত বেছে নিতে সাহায্য করেছিল। জড়পদার্থের মত, একটা অসার, অচল ধর্মভয় তাঁর মনকে গ্রাস করেনি আর তাঁর অন্তরে ধর্মের এই মুক্ত বাতায়ন রচনা করে গেছেন পিতা ভুবনমোহন।

ভুবনমোহন ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকাই পরে 'Bengal Public Opinion' নাম গ্রহণ করে। তখনও তিনি এর সম্পাদক ছিলেন এবং আরও পরে এই পত্রিকা 'Bengali' পত্রিকার সঙ্গে মিশে যায়। এই Bengali-র সম্পাদক ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

এই পত্রিকা সম্পাদনা করে তিনি তৎকালীন সাংবাদিকদের মধ্যে যথেষ্ট সমাদর ও প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই পত্রিকায় তাঁর অনেক তথ্যপূর্ণ এবং মূল্যবান প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হতো যা তৎকালীন পাঠকসমাজে খ্যাতি অর্জন করেছিল। তবে তাঁর শেষ বয়সের দুটি রচনা যা তাঁকে খ্যাতির উচ্চশিখরে তুলে দিয়েছিল তা হলো—'A few thoughts of the Brahmo Samaj' এবং 'An Open Letter to the President of the Samaj' এই প্রবন্ধ দুটিতে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য সম্পর্কে ব্রাহ্মদের দৃষ্টিভঙ্গি সজাগ হয়।

তাঁর তেজস্বিতা শুধু তাঁর স্বাধীন ও নির্ভীক প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়নি, পত্রিকা সম্পাদনাকালেও তিনি যথেষ্ট নির্ভী-

তার পরিচয় প্রদান করেছেন। এ-প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য : একবার তিনি Bengal Public Opinion-এ কলকাতা হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতির বিচারের ত্রুটির উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেন। ঘটনাক্রমে এর কিছুদিন পরেই ভুবনমোহন একজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর পক্ষে আপীল করবার জন্য উক্ত বিচারপতির নিকট উপস্থিত হন। বিচারপতি প্রতিশোধ গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেলেন—তিনি ভুবনমোহনের আপীলে মন না দিয়ে তাঁর প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখান। কর্তব্যপরায়ণ ভুবনমোহন বললেন, "আমার প্রতি যদি মাননীয় বিচারপতির কোন রাগ থাকে তবে তার ফলে এই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর প্রতি অন্যায় বিচার হইবে না, আশা করি।" তাঁর এই উক্তির ফলে আসামী সুবিচার লাভ করে। আদালতগৃহে এই নির্ভীকতার ঘটনা আমরা পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জনের জীবনে বারেবারে দেখেছি। কলকাতা করপোরেশনের প্রথম সময়ের কমিশনারদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ভুবনমোহনের জীবনে এই তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার সঙ্গে মিলে ছিল মধুরতা ও কোমলতা। তিনি ভালবাসতেন গান, স্বহস্তে পরিচর্যা করে নানাদেশ থেকে নানারকম গাছপালা এনে পুরুলিয়ার বাড়ীতে তৈরী করেছিলেন অপূর্ব সুন্দর ফুলের বাগান। সেখানে ঋতুতে ঋতুতে নানা ফুল তাদের আনন্দবার্তা নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠত। ফুল ফোটার মত আনন্দ তিনি পেতেন সংগীত রচনা করে, আবার নিজের রচিত গানে সুরারোপ করতেন তিনি নিজেই। কনিষ্ঠ পুত্র বসন্তরঞ্জনের মৃত্যুতে শোকাকুল পিতৃহৃদয় যে সংগীতটি রচনা করেছিলেন তা নীচে দেওয়া হলো :

"(মাগো) তোমারি রতন, তোমারি সদন
যাইতে বারণ করিতে পারিনি।
তুমি চাইলে পরে তুমি ডাকলে পরে
যাইতে বারণ করিতে পারিনি।"

তাঁর এই গানের মধ্যে শাক্তকবি রামপ্রসাদের প্রভাব বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়।

মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, সদালাপী, দাতা, স্বজন-বৎসল ও বন্ধুপ্রিয়।

আর এই বন্ধুপ্রীতির ফলস্বরূপই তিনি দেউলিয়া খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। উপার্জিত অর্থ একদিকে যেমন তিনি অকাতরে দান করতেন, তেমনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে কখনও তা ফেরত চাইতেন না। ফলে ধার নেবার বন্ধুর সংখ্যা ক্রমশই চলল বেড়ে, কিন্তু তাও তাঁকে এমন করে পথে বসাতো না যদি না তিনি নির্বিবাদে বন্ধুদের জন্য জামিন হতেন। বন্ধুবান্ধব এবং এমন কি পরিচিতজনেরা ক্রমে ভুবনমোহনকে তাঁদের সংসার-জীবনের দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে, কর্মোন্নতির জন্য তাঁকে জামিন হবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। তাঁর সুগভীর মানবদরদী মন এদের কষ্টে করুণায় বিগলিত হলো, ফলে তিনি নির্বিবাদে জামিন হতে লাগলেন। কিন্তু সেই বন্ধু ও পরিচিত জনেরা সুখের মুখ দেখে উপকারী বন্ধুকে ভুলে গেলেন—ফলে ভুবন-মোহন ঋণের দায়ে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়লেন, এবং পাওনাদারদের তাগাদা ও অপমান থেকে বাঁচবার আর কোন উপায় না দেখতে পেয়ে, বাধ্য হয়েই তিনি দেউলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হলেন। এই সময় তাঁর দাদা কালীমোহন ভুবনমোহনকে এই ঋণের দায় থেকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সাগরপ্রমাণ ঋণের কাছে তাঁর সে চেষ্টা শুধু কয়েক ফোঁটা শিশিরবিন্দুর মত হয়ে রইল—কেবল শাশ্বত হয়ে রইল তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম।

মাতা নিস্তারিণী দেবী—চিত্তরঞ্জনের জননী, নিস্তারিণী দেবী ছিলেন কল্যাণময়ী আদর্শ জননী; ত্যাগ, ক্ষমা, প্রেম ও পবিত্রতার এক জীবন্ত বিগ্রহ। পরে দুঃখের কাহিনী শুনলে তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। প্রার্থী কোনদিন তাঁর দুয়ার থেকে শূন্যহাতে ফিরে যেত না। কারুর দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা শুনলে তাকে তিনি প্রাণপণ সাহায্য

করতেন ; এ বিষয়ে দাসী-চাকর কোন ভেদজ্ঞান ছিল না। বিশাল সংসারের গৃহিণী ছিলেন তিনি,—সকলের প্রতি তাঁর ছিল সমদর্শিতা, তাই তাঁর সংসারে আশ্রিত এবং প্রতিপালিত প্রত্যেকেই নিস্তারিণী দেবীর স্নেহধারায় অবগাহন করে ধন্য হতো। তিনি অর্থবান স্বামীর স্ত্রী ছিলেন, তাই বলে সাজপোশাকে বা অন্য কোনরকম বিলাসিতা তাঁর ছিল না, খুব সাদাসিধে ভাবে থাকতেন তিনি। কোনদিনই অলঙ্কার-বিভূষিতা হয়ে বা মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করে থাকতেন না। স্বামী যেদিন দেউলিয়া হলেন সেদিন তিনি তাঁর সব অলঙ্কার খুলে দিয়েছিলেন স্বামীর হাতে। এ দিয়ে যদি স্বামীর সামান্যতম উপকারও হয় এই ছিল তাঁর আশা ও শেষ সান্ত্বনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্ম : ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর

শিক্ষাজীবন—বাল্যে ও যৌবনে

কলিকাতা ও লণ্ডন

ইংরাজী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর কলকাতার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে ভুবনমোহনের বাসাবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। সেদিন দেবতারা স্বর্গ থেকে এই নবজাত শিশুটিকে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন নিশ্চয়। আর ভারতমাতা তাঁর এই যোগ্য সন্তানটিকে জানিয়েছিলেন অভিনন্দন। চিত্তরঞ্জন ছিলেন বাবা-মার দ্বিতীয় সন্তান এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং প্রথম পুত্রের মুখ দেখে বাবা-মা'র হৃদয় আনন্দে আকুল হয়ে উঠেছিল কিন্তু তাঁরা কি সেদিন কল্পনাও করতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের এই সন্তানটির মধ্য দিয়ে ভারতবাসী দেখতে পাবে তাদের আগামী দিনের জাতীয় জীবনের মুক্তির নেতাকে, লাভ করবে ভারত-বর্ষের ইতিহাসের অন্যতম মহামানবকে!

এই শিশুর শৈশবশিক্ষার দিনগুলো কাটে ঐশ্বর্য আর আনন্দের মধ্যে—বাবা, মা, ঠাকুমা সকলেরই নয়নের মণি তিনি। বিশেষ করে ঠাকুমাকে তিনি খুব ভালবাসতেন।

চিত্তরঞ্জনের জন্মের পর তাঁর বাবা ভুবনমোহন পটলডাঙ্গার বাসা-বাড়ী ছেড়ে ভবানীপুরে কাঁসারীপাড়া রোডে এবং পরে এলগিন রোডে জেনারেল হাসপাতালের সামনে (বিজলী-হাউস) উঠে এলেন। এই বাড়ী ছেড়ে এলেন বকুলবাগানের বাসাবাড়ীতে এবং সবশেষে এসে স্থায়িভাবে বাস শুরু করলেন তাঁর দাদা কালীমোহনের ১৪৮ নম্বর রসারোডের বাড়ীতে—যে বাড়ীটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমানের 'চিত্ত-রঞ্জন সেবাসদন' হাসপাতাল। কালীমোহন এই বাড়ী তাঁর পালিত-পুত্র বসন্তরঞ্জনকে দিয়ে যান। বসন্তরঞ্জন বিবাহের পর অপুত্রক অব-

স্থায় মারা যান, সুতরাং এ বাড়ীর উত্তরাধিকারিণী হলেন তাঁর মা নিস্তারিণী দেবী। মায়ের মৃত্যুর পর এ বাড়ীর মালিক হলেন চিত্তরঞ্জন এবং তাঁর মেজোভাই প্রফুল্লরঞ্জন। প্রফুল্লরঞ্জন পাটনা হাইকোর্টের জজ হয়ে যখন পাটনায় স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য গেলেন তখন তিনি তাঁর অংশ চিত্তরঞ্জনকে বিক্রি করে দিয়ে গেলেন। প্রচুর জমি নিয়ে প্রকাণ্ড বাড়ী, পুকুর, খেলার মাঠ সবই ছিল বাড়ীর মধ্যে, আর ছিল একটি শিবমন্দির যা আজও পথিকরা এ হাসপাতালের পাশ দিয়ে গেলে দেখতে পাবেন। ওখানেই নাকি কালীমোহনকে দাহ করা হয়েছিল। একদিন শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পদধুলিতে ধন্য হ'ত এ গৃহ, তাঁদের আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হ'ত কত সন্ধ্যা। আবার গভীর রাজনৈতিক আলোচনা ও তর্কে মুখর হয়ে উঠত এর কক্ষ। লোকমান্য তিলক, রবীন্দ্রনাথ, মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে কে না এসেছেন এখানে? কিন্তু সেই পুণ্যতীর্থের স্মৃতিচিহ্নকে স্মরণ করে সে গৃহের সামান্য একটি কক্ষও রাখা হয়নি আমাদের জাতীয় সম্পত্তিরূপে। আমরা এ নিয়ে অভিযোগও জানাইনি, দুঃখও করিনি। আমরা আজকের বাঙালী দলাদলি আর হানাহানির নির্মম আবহাওয়ায় পুষ্ট হয়ে ভুলতে বসেছি আমদের জাতীয় ঐতিহ্যকে! তাই চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতি আজ বাঙালীর কাছে শুধু অতীতের ইতিহাসের একটা পৃষ্ঠামাত্র, যার পাতায় সঞ্চিত হয়েছে শুধু মহাকালের ধুলোবালি, কিন্তু সেই ধুলো সরাবার দায়িত্ব যে আমাদের, এ উপলব্ধিটুকুও আমরা হারাতে বসেছি! সুতরাং তাঁর এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চরণস্পর্শে পূত সেই পবিত্রনিকেতন নিয়ে ভাববার সময় কই?

এ বাড়ীটি সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত আছে। এ গৃহটির মালিক ছিলেন এক বৃদ্ধা। তাঁর ছেলেমেয়ে ছিল না। বৃদ্ধাটি যখন খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন, তখন তাঁর জ্ঞাতি এবং আত্মীয়েরা অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সহায়সম্বলহীনা,

পুত্রকন্যাহীনা বিধবা নারীর মনে মর্মান্তিক দুঃখ হলো—মৃত্যুকালে তিনি অভিশাপ দিয়ে গেলেন, 'এ বাড়ীর যে মালিক হবে তারই বংশ থাকবে না।' বৃদ্ধার এ অভিশাপ সত্য হলো কালীমোহনের জীবনে, পালিতপুত্র বসন্তরঞ্জন মারা গেলেন হঠাৎ, অল্পবয়সে এবং অপুত্রক অবস্থায়। বাড়ীর মালিক হলেন চিত্তরঞ্জন, তাঁরই একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন বিবাহের পর পিতার মৃত্যুর মাত্র এক বছর বাদে অপুত্রক অবস্থায় পৃথিবীর মায়া কাটালেন। বৃদ্ধার অভিশাপের কথা চিত্তরঞ্জন জানতেন এবং থেকে থেকেই এজন্য তাঁর মনটা খারাপ হয়ে যেত। পরে বর্ধমানের মহারাজার আলিপুরের বাড়ীটি তিনি বসবাসের জন্য ক্রয়ও করেছিলেন, কিন্তু এ বাড়ীর মায়া কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর আর নতুন বাড়ীতে যাওয়া ঘটে উঠল না। তাঁর ভাবাবেগপূর্ণ মনে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনের এই স্মৃতির তীর্থকে ছেড়ে যেতে প্রাণে ব্যথা লেগেছিল—কিন্তু পরিণামে এতবড় একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও সামান্য একজন নারীর অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলেন না, একথা ভাবতেও দুঃখ হয়।

রসারোডের বাড়ী থেকেই চিত্তরঞ্জনের বিদ্যালয়জীবন শুরু হয়। তিনি ভর্তি হলেন লণ্ডন মিশনারী স্কুলে। বাড়ীর গাড়ী করে স্কুলে যাতায়াত করতেন, সাহেবী ও সুদৃশ্য পোষাক পরিধান করতেন তিনি, এইজন্য সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহের ছাত্ররা তাঁকে সসম্মানে পরিহার করে চলত—কিন্তু মুগ্ধ হয়ে যেত তাঁর ব্যবহারে, যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও কথাবার্তা, স্বভাবটিও ছিল শান্তশিষ্ট; কোনদিন কারুর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতেন না! আর সেই শৈশব বয়স থেকেই ছিল দরদী মন—সামান্য জলখাবারের পয়সা থেকে নিজে না খেয়ে গরীব বন্ধুদের খাওয়াতেন। অতএব তাঁর ব্যবহারে সহপাঠীরা সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। পয়সা ফুরিয়ে গেলে বালক ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠতেন, বা রে! সব যে ফুরিয়ে গেল! প্রভাতবেলার সূর্য যেমন দিনের গতিপথ নির্দেশ করে, এই তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা

আভাস পাই আগামী দিনের ত্যাগী চিত্তরঞ্জনের—যিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন অকাতর পরিশ্রমে, আবার সেই অর্থ বিনা দ্বিধায় মুক্তহস্তে দান করেছেন মানুষকে, পাত্রমিত্রের বিচার করেন নি। সে কথা পরে বলবো।

এই স্কুল-জীবন থেকেই তাঁর চরিত্রে দুটি গুণ বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল—(1) কবিত্ব-শক্তি, (2) বাগ্মিতা-শক্তি।

স্কুলে পড়াশুনায় তিনি ভালই ছিলেন বিশেষ করে ইংরেজীতে তাঁর বেশ দখল ছিল, কিন্তু অঙ্ক ক্লাসের ঘণ্টাটা পড়লেই মেজাজটা যেত বিগড়ে। মাষ্টারমশাই বোর্ডে অঙ্ক বোঝাচ্ছেন আর বালক চিত্তরঞ্জন তাঁর খাতা ভর্তি করে কি লিখে চলেছেন। মাষ্টারমশাই ভাবছেন বুঝি অঙ্কই কষছেন ছাত্র, তাই তিনি কিছু বলতেন না, কিন্তু ঘণ্টা পড়লে তা বন্ধুদের এনে দেখাতেন। বন্ধুরা তাদের সহপাঠী এই বালকটির কবিতা-রচনার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত, বন্ধুদেঃ তা তিনি পড়ে শোনাতেন। বাড়ী থেকেও কবিতা লিখে আনতেন,—সেদিনের সেই কিশোর কবিটির মধ্যেই জন্মলাভ করেছিল আগামী দিনের 'মালঞ্চ,' 'মালা,' 'সাগরসংগীত'-এর কবি। কবিতা রচনা করতে তিনি যেমন শশবে বয়স থেকেই ভালবাসতেন, শুধু তাই নয় এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতাও ছিল, তেমনি ভালবাসতেন কবিতা আবৃত্তি করতে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়' এবং হেমচন্দ্রের 'ভারতসংগীত' কবিতা দুটি আবৃত্তি করে তিনি খুব আনন্দ পেতেন এবং ছেলেবেলা থেকেই এ দুটি কবিতা তাঁর অতি প্রিয় ছিল। আর প্রিয় ছিল তাঁর বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা—ক্লাসে বসে আড়াল করে আনন্দমঠ পড়তেন। এই থেকেই বোঝা যায় স্বদেশপ্রেমের বীজ তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল। ইংরেজীতে যাকে 'patriot' বলে, চিত্তরঞ্জন ছিলেন সেই 'Born Patriot'; তাই দেশের ডাকে, মায়ের ডাকে উপেক্ষা করতে পেরেছেন রাজ-ঐশ্বর্য, ভোগসুখ, আরাম সবকিছুকে। শিবের মত দারিদ্র্যকে ভূষণ করে ভারতীয় সাধনার

মূলকথা সর্বরিক্ত বৈরাগ্যের সাধনায় নিজের জীবনকে দীক্ষিত করেছেন তিনি আর প্রেমের দুঃখলীলাকে সহচর করে মানুষের কল্যাণের জন্য, তার মঙ্গলের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য, তথা আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাধীনতালাভের জন্য প্রকৃত নিঃস্বার্থ প্রেমিকের মত আত্মবিলোপ ঘটিয়েছেন তিনি—যার ফলে অকালমৃত্যু এসে তাঁকে ভারতমাতার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সে অবশ্য অনেক পরের কথা।

কবিত্ব-শক্তির মত আর একটি শক্তি তিনি জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন বলা চলে, তা হচ্ছে বক্তৃতাদানের ক্ষমতা। স্কুল ছুটির পর বিকেলবেলা বন্ধুদের নিয়ে যে-কোন বিষয়ের উপর ঘন্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করে যেতেন। কেবলমাত্র স্কুলেই নয়, বাড়ীতেও তিনি ভাইবোনদের নিয়ে এইভাবে বক্তৃতা দিতেন। সেই কিশোর বয়স থেকেই তাঁর বক্তৃতার মধ্যে এমন একটি আকর্ষণী-শক্তি ছিল যে ছেলেমেয়ের দল তাঁর বক্তৃতা মুগ্ধ হয়ে শুনত এবং বুঝতেই পারত না কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত। শৈশব থেকেই একটি নিরাসক্ত মন ছিল তাঁর। কেউ কোন জিনিস চাইলে তা তিনি সহজেই দিয়ে দিতে পারতেন।

তাই বলে শিশুসুলভ স্নিগ্ধ শ্যামল মনটি তিনি হারাননি। ছুটির দিন দুপুরবেলা, ঘুমিয়ে পড়তেন আমবাগানের ছায়ায়—পাশে পড়ে থাকত কাঁচা আম আর ছুরি। খাবার ব্যাপারে একটু ভুলো মন ছিল তাঁর, মা মনে করিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত খাবারের থালা বা দুধের বাটির কথা তিনি বেমালুম ভুলে যেতেন। অবশ্য পরবর্তী জীবনে ভোজনরসিক বলে। তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ছেলেমানুষ বয়সে তাঁর প্রিয় ছিল রসগোল্লা, এক পয়সায় একজোড়া রসগোল্লা পাওয়া যেত। পরবর্তী জীবনে তিনি বলেছেন—"কোথায় যে গেল সেই রসগোল্লা! এইসব রসগোল্লায় পালিশ আছে কিন্তু রস নেই।" রসগোল্লায় অবশ্য রস ঠিকই ছিল কিন্তু তাঁর যে শিশুসুলভ মনটিই গিয়েছিল হারিয়ে!

এই শিশুই যৌবনে পদার্পণ করে ষোল বছর বয়সে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন—হারিয়ে গেল জীবন-পাতার কচি কিশলয়ের আনন্দে ভরা কলরবমুখর দিনগুলি। বুঝি বা সেই এক পয়সা জোড়ার রসগোল্লার রসটুকুও। ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। এই সময় ছাত্র পরিষদের সভাপতি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করে চিত্তরঞ্জন হয়ে উঠলেন ছাত্র পরিষদের অন্যতম নেতা। পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন যখন রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন তখন এই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'Bengali' পত্রিকায় লিখেছিলেন "চিত্তরঞ্জন কাজের লোক নহেন, এতদিন পালিয়ে ছিলেন, এখন হঠাৎ নেতা সেজেছেন, নেতা হতে হলে কাজ চাই।" এই উক্তির তলায় তিনি সই করেছিলেন 'An old member of the Indian Association'। কিন্তু চিত্তরঞ্জন লেখাটি দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। এই সময় তিনি বাংলাভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অন্যতম ভাষারূপে মর্যাদা দেবার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁর এই আবেদন গ্রাহ্য করেন নি। তাঁর এই স্বপ্ন সফল হয়েছিল আরও অনেক পরে—যখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হলেন।

কলেজ-জীবনে তাঁর বাগ্মিতা-শক্তি আরও উৎকর্ষ লাভ করে—কলেজের অধিকাংশ ডিবেট প্রভৃতিতে যোগদান করে তর্ক ও বক্তৃতা দ্বারা তিনি সকলকে মুগ্ধ করতেন। একবার এই ছাত্র পরিষদের অধিবেশনে তিনি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'শকুন্তলা' তত্ত্বের আলোচনা করে বিশেষ খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জন করেন। এ থেকেই তাঁর শুধু পাণ্ডিত্য নয়, সুগভীর সাহিত্যজ্ঞানেরও পরিচয় লাভ করা যায়। ইংরেজী কবিদের মধ্যে তাঁর প্রিয় কবি ছিল রবার্ট ব্রাউনিং, আর

বাংলা-সাহিত্যে তাঁর প্রিয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্র। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তাঁর অন্তরে যেন এক ভাবলোকের সৃষ্টি করত।

শেষ হয়ে গেল কলেজ জীবনের স্বপ্নভরা চারটি বছর—১৮৯০ খ্রীঃ তিনি সসম্মানে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে B. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে 'রেভেনসা' জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করলেন। চিরচঞ্চল যৌবন ঊর্মিমুখর সাগরের সংস্পর্শে এসে উত্তাল হয়ে উঠল। বাবা, মা, আত্মীয়স্বজন সকলের মনে অনেক স্বপ্ন ও আশা। ছেলে I. C. S. হয়ে দেশে ফিরে এসে জেলাবিশেষের শাসনকর্তা নিযুক্ত হবেন। এর চেয়ে বড় সম্মানের পদ তখনকার দিনে আর কিছু ছিল না। কিন্তু সেদিন কে জানত যে ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে বসে ভারতমাতার এই শ্রেষ্ঠ সন্তানটির জীবননদীর গতিপথ বিপরীত মুখে প্রবাহিত করে দেবেন?

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসলেন, কিন্তু ২।১টি প্রশ্নের উত্তর লেখার পর উত্তরপত্র তাঁর মনোমত না হওয়ায় সে বছরের মত ওখানেই পরীক্ষা দেওয়া শেষ হয়ে গেল। পরের বছর ১৮৯৩ সালে পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু এবার এল আরেক বাধা এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে জীবনের চলতি পথে এই বাধাবিপত্তির উপলবন্ধুর পথ ভাঙতে ভাঙতে অনেক শক্তি ব্যয় হয়ে গেছে চিত্তরঞ্জনের জীবনে। কিন্তু বাধাবিপত্তি কখনও তাঁকে সংকল্প থেকে একচুলও বিচ্যুত করতে পারেনি। 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। যা তিনি ভেবেছেন তা বাস্তবে রূপলাভ না করা পর্যন্ত তাঁর স্বস্তি ছিল না, শান্তি ছিল না।

পরীক্ষা আসন্ন কিন্তু তার চেয়েও বড় কাজ তাঁর সামনে—দাদাভাই নৌরজী পার্লামেন্টের সভ্য নির্বাচিত হবার চেষ্টা করছেন। যুবক চিত্তরঞ্জন দেখলেন যে, দাদাভাই নৌরজী যদি পার্লামেন্টের সভ্য

হন তবে ভারতবর্ষের কল্যাণ হবে, কারণ ভারতের মুখপাত্র হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে কথা বলার মত একজন লোক থাকবেন। তাই নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি দাদাভাই নৌরজীর সমর্থনে নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। একজন অধ্যয়নরত যুবকের এই স্বদেশপ্রীতি ও অপরিসীম বাগ্মিতা-শক্তি দেখে ইংরেজ-জাতি মুগ্ধ হয়ে গেল। ইংল্যাণ্ডের নানা পত্রপত্রিকা চিত্তরঞ্জনের স্বদেশপ্রেমকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল। সফল হোল এই প্রচেষ্টা। দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচিত হলেন ঠিকই, কিন্তু চিত্তরঞ্জন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারলেন না। অঙ্কে সামান্য নম্বরের জন্য I. C. S. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন তিনি। আবার অনেকে বলেন, চিত্তরঞ্জনের মধ্যে স্বদেশপ্রীতির এই জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ দেখে চতুর ইংরেজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে না নিয়ে তাঁর চেয়ে কম নম্বরের ছাত্রকে নিয়েছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় এই অকৃতকার্যতা নিয়ে পরবর্তী জীবনে পরিহাসচ্ছলে তিনি বলতেন—"I came first in the unsuccessful list."

তাঁর বাবা, মা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা তাঁদের এই স্বপ্নভঙ্গে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। তার কারণ তাঁরা তো সেদিন ভাবতেও পারেন নি যে তাঁর এই পরাজয় ভগবানের আশীর্বাদ হয়ে নেমে আসবে চিত্তরঞ্জনের জীবনে। এবার তিনি সংকল্প করলেন ব্যারিস্টারি পড়বেন—শ্রীঅরবিন্দের ভাগ্যবিধাতাই বোধ হয় অলক্ষ্যে বসে তাঁকে এ পথে পরিচালিত করলেন।

একাগ্রচিত্তে সুরু করলেন আইন অধ্যয়ন, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও চলছিল। এই সময় তাঁর রচিত একটি নাটক প্রসিদ্ধ ইংরেজ অভিনেতা আরভিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে সেই নাটকটি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি গীত রচনাও করেছিলেন। পড়াশুনায় আবার এলো আরেক বাধা—জেম্স্ ম্যাকলীন নামক ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একজন সদস্য ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের গোলামের

জাতি বলে অভিহিত করায় চিত্তরঞ্জনের চিত্ত বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এত বড় স্পর্ধা সহ্য করা যায় না। তিনি লণ্ডনে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রদের আহ্বান করে একটি সভা করলেন। সেই সভায় চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা নিয়ে দেওয়া হলো।

"It was not her sword and bayonet that won for her this vast and glorious empire, it was not her military valour that achieved this triumph (cheers), it was in the main a moral Victory or a moral triumph, England might well be proud of. But to attribute all this to the sword and then to argue that the policy of the sword is the only policy that the ought to be pursued in India, is to my mind absolutely base and quite unworthy of an Englishman (cheers). Our Legislative Councils are only guided shames, splendid lies, magnificent do nothings (cheers). We have men in those councils who have no business to be there and others are studiously excluded without whom no legislature in any country can be perfect. We want Indians of the right sort, but His Excellency the Viceroy takes precious good care to nominate only men of certain stamp, men either weak in intellect or persons in inclination—men entirely out of touch with the teeming millions of my countrymen and men whom you, gentlemen in this country, call aristocratic model."

(অনুবাদ) "পার্লামেন্টের বক্তৃতায় আমি একাধিকবার এইরূপ উক্তি শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছি যে ইংল্যাণ্ড নাকি তরবারির সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন আর এই তরবারির সহায়তা বলেই ভারতবর্ষে

স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবে। একথা প্রকৃত নহে, বাস্তবিক ইংল্যাণ্ড এরূপ কিছুই করে নাই। এই বিশাল সাম্রাজ্য তরবারি বা বন্দুকের সাহায্যে অধিকৃত হয় নাই, এই বিজয়-গৌরব রণশক্তিতে অর্জিত হয় নাই. প্রকৃতপক্ষে ইংল্যাণ্ডের এই গৌরব নৈতিক বলেই লব্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক এই সম্বন্ধে তরবারির শক্তির উল্লেখ এবং ভারতে একমাত্র এই শক্তিই অনুসৃত হইবে—এইরূপ শক্তি আমার বিবেচনায় অত্যন্ত হেয় এবং ইংরেজের পক্ষে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

"আমাদের ব্যবস্থাপক সভা লজ্জাকর এক প্রহসন মাত্র। যাহারা ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য তাহাদের করার কিছুই নাই এবং এমন সব ব্যক্তিদের অভিনিবেশ সহকারে ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে রাখা হইয়াছে যাহাদের ছাড়া কোন দেশের ব্যবস্থাপক সভাই সার্থক রূপ লাভ করিতে পারে না। আমরা যোগ্য ভারতীয়দেরই চাই। আমাদের রাজশক্তি যত্নসহকারে এমন সব ব্যক্তিদের নির্বাচন করিয়াছেন যাহারা ব্যক্তিত্বহীন এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন—এই সমস্ত লোকদের দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে প্রাণের কোন সংযোগ নাই। এ দেশের ভদ্রমণ্ডলীর ভাষায় ইহাদিগকে বলে অভিজাতমণ্ডলী।"

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন যখন রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন তখন অনেক আক্রমণ তাঁকে সহ্য করতে হয়। অনেকে বলেন যে রাজনৈতিক গগনে তিনি হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছিলেন, দেশের সেবা করবার সঙ্কল্প তাঁর ছিল না; আবার অনেকে বলেন, মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে চিত্তরঞ্জন এ পথের পথিক হয়েছেন—কিন্তু লণ্ডনে অধ্যয়নরত একটি ছাত্রের মুখে উপরোক্ত বক্তৃতা শুনে কি আমরা এই সমস্ত মতামতকে মেনে নিতে পারি ? আমরা কি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারি না জননী জন্মভূমিকে তিনি স্বর্গের চেয়েও বড় মনে করতেন, প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন ? তা না হলে ২২।২৩ বছরের যুবকের চোখে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় আমাদের ব্যবস্থাপক সভার ত্রুটি

এমন করে চোখে পড়ল কেন? পরবর্তী জীবনে দেখেছি যখন তিনি স্বরাজ্যদল গঠন করলেন তখন তাঁর অন্যতম সঙ্কল্প ছিল Council-এ প্রবেশ। এই নিয়ে নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ হলেও তিনি আপন সঙ্কল্পে অটুট থেকেছেন এবং শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেছেন। এ থেকে কি আমরা একথা বলতে পারি না যে দেশের দুঃখ-দুর্দশা সব তিনি তরুণ বয়স থেকেই তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে দেখেছেন এবং তার বেদনা সারা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন? আগেই বলেছি তিনি হচ্ছেন 'Born patriot'; patriot যুবকের এই বক্তৃতায় পার্লামেণ্টে অধিকাংশ সদস্য ম্যাকলীনের প্রতি বিরূপ হলেন। ম্যাকলীনকে তাঁর এই অভদ্র আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হ'লো, কিন্তু তাতেও তাঁর অপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা হলো না—পরে তাঁকে পার্লামেণ্টের সদস্যপদ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো।

এই ঘটনা ইংল্যাণ্ডের শিক্ষিত মহলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করল—কারণ যে ভারতবাসীকে ইংল্যাণ্ড চিরকাল হেয় বলেই জেনে এসেছে, তাদের মধ্যেও যে তেজ আছে, মনুষ্যত্ব আছে, বিশেষ করে স্বদেশপ্রেম আছে, এ দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ইংল্যাণ্ডের অধ্যাপক, মন্ত্রীমণ্ডলী এবং ছাত্রমহলে চিত্তরঞ্জনের নাম পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরই উদারনৈতিক দল মিঃ গ্ল্যাডস্টোনের সভাপতিত্বে ওল্ডহ্যামে একটি সভা আহ্বান করলেন আর সে সভায় ভারতীয় অবস্থা জানাবার জন্য যুবক চিত্তরঞ্জনকে আমন্ত্রণ জানানো হলো।

চিত্তরঞ্জন সেই সভায় ভারতের দুঃখ-দুর্দশার কথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—"কি উপায়ে বৈদেশিক বণিকের প্রতিযোগিতায় ভারতের শিল্প-বাণিজ্য লোপ পেয়েছে, কি প্রকারে সরকারী চাকরিতে ভারত সরকার অধিকসংখ্যক ইউরোপীয়ান নিয়োগ করে ভারতবর্ষীয়দের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করেছেন, কি উপায়ে

ভারতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য বিদেশে চালান দেবার ফলে ভারতবাসী দিনের পর দিন অনাহারে মরতে বসেছে। রেলপথাদি বিস্তৃত হবার ফলে জলনিকাশের অভাব হেতু বঙ্গবাসী দিনের পর দিন ম্যালেরিয়ার কবলে নিপতিত হচ্ছে। ভারতের রাজস্বের শতকরা ৬৫ ভাগই ব্যয়িত হয় সৈন্যবিভাগে।"

দেশের এই সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তাঁর অন্তরের গভীরে ফল্গুস্রোতের ন্যায় চিরপ্রবাহিত ছিল, দিকৃপাল ব্যারিস্টার C.R. Das-কে দেখে কেউ তাঁর মর্মের গভীরের এই ছবিটির খোঁজ পাননি। অন্তরের এই গোপন ছবিটি তিনি আঁকলেন পরবর্তী জীবনে নানা বক্তৃতায় এবং তাঁর একমাত্র সাধনা হলো দেশের এই সমস্ত সমস্যা দূর করে দেশকে স্বাবলম্বী করে তোলা, স্বরাজের স্বর্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেশকে স্বাধীন করে তোলা।

এমনিভাবে নানাস্থানে স্বদেশ-প্রীতিমূলক বক্তৃতা দিয়ে তিনি লণ্ডনে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্রসমাজে গৌরবের আসন লাভ করলেন কিন্তু সেই সঙ্গে পড়াশুনাও নিশ্চয় মন দিয়েই করেছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মিডল টেম্পল থেকে চিররঞ্জন ব্যারিস্টারি পাস করলেন। জীবননাট্যের একটি অধ্যায়ের ঘটল পরিসমাপ্তি। বলাকার পাখায় ডানা মেলে উড়ে গেল ছাত্রজীবনের দায়দায়িত্বহীন পরম নির্ভাবনার সুখের দিনগুলো।

ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। চার বছর বিলেতে বাস করলেও তাঁর আচার-ব্যবহারে, সাজপোষাকে এতটুকু বিলেতী ছাপ পড়লো না। বোম্বাই বন্দরে নেমে তিনি বন্ধুবান্ধবদের ভারতীয় কায়দায় হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। বাড়ী এলেন, মাতাপুত্রে মিলন হলো। মা আনন্দের আতিশয্যে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ছেলে সেবাযত্ন করে তাঁকে সুস্থ করলেন। (ছেলেবেলা থেকেই চিত্তরঞ্জন ছিলেন মাতৃগতপ্রাণ। তিনি বলতেন, যে মাকে না ভালবাসে সে জীবনে বড় হতে পারে না।) এই সময়কার কথা প্রমদা দেবী বলেছেন,

"আমার খুব মনে আছে,—বিলাত হইতে আসিয়াই চিত্তদাদা ধুতি পরিলেন, পাঞ্জাবী গায়ে দিলেন। তারপর খুব বড় একটা থালায় আমাদের সকল ভগিনীদের লইয়া খাইতে বসিলেন। চিত্তদাদা খুব আমোদ করিয়া খাইতে লাগিলেন। তিনি খাইতে পারিতেন খুব।" সাহেবিয়ানার প্রতি তিনি কোনদিন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। কারণ তিনি বুঝেছিলেন আপন জাতির বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে, অন্য জাতির ব্যর্থ অনুকরণ করে জগতের ইতিহাসে কোন জাতি বড় হতে পারে না। তাছাড়া জীবনের কোন ক্ষেত্রেই অনুকরণ বা অনুসরণ জিনিসটা তিনি ব্যক্তিগতভাবে খুবই অপছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন জাতির নবজীবনের পথিকৃৎ—নিজের জীবন, ধন, মান ও প্রাণ দিয়ে তিনি তার মুক্তির ইতিহাসে রচনা করে গেলেন নতুন অধ্যায়। সুতরাং তাঁর জীবনের মত বা পথ কারুর জীবনের চলার পথের পাথেয়কে অনুসরণ করে গড়ে ওঠেনি। সে পায়েচলা পথে তিনিই প্রথম দুর্গম অভিযাত্রী—তারপর বহুদিন বাদে সে পথের পথিকৃত হয়েছেন সুভাষচন্দ্র। বাঙালী জাতির রাজনৈতিক জীবনের কর্ণধার চিত্তরঞ্জন, আর তাঁর পুত্রপ্রতিম প্রাণপ্রিয় সহকর্মী সুভাষচন্দ্র। তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। এঁরা দুজন বাঙালীর জাতীয় জীবনে এনেছেন সাহস, শক্তি, ত্যাগ, বীর্য ও ক্ষমার আদর্শে গড়া এক আলোকোজ্জ্বল রক্তরাঙা প্রভাতের নব অরুণোদয়ের স্বপ্ন।

কিশোর বয়সের কাব্যরচনা

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ

(অপর্ণা দেবী সম্পাদিত 'কবিচিত্ত' থেকে)

জয়জয়ন্তী (ঝাঁপতাল)

ভক্তিপুষ্প দিয়ে মাগো! গাঁথিয়াছি হৃদিহার
বড় সাধ দিব তুলে ওই চরণে তোমার।
ব্যথা মোর স্মরি যত দহে হৃদি দহে তত
আশা কত হয় হত, বহে হৃদে নীরধার।

পাপচক্ষে দেখি যবে মোহপূর্ণ এই ভবে
বড় ভয় হয় প্রাণে, কাঁদে প্রাণ বারবার
তোমা যদি করি ভয়, তবে আর কিসে ভয়
মোহ যাবে আলো হবে সংসারের অন্ধকার।
তুমি যদি আলো করে থাক মা হৃদয় 'পরে
দুঃখ মোর সুখ হবে, দূরে যাবে অন্ধকার।

কেন কাঁদ হৃদয়

(১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত)

হৃদয় হৃদয় মোর
নাহি কিরে বল তোর
ফিরাইতে এই স্রোতে ?
দুর্বল শিশুর মত
ভাসিবি কি অবিরত
মিছে আশা বুকে করে ?
মুছে ফেল অশ্রুজল
কাঁদিয়ে বল কি ফল
কাঁদিবি কাহার তরে ?
যার তরে রাখ প্রাণ
যে তোরে দেয় না প্রাণ
কেন প্রাণ কাঁদ তবে ?
সাহসে করিয়া ভর
আসিয়া হৃদয়ে বল
দাও তরী ভাসাইয়া।
যদি বা গরজে ঘন
উঠে ঝড় করে রণ
দেয় তরী ডুবাইয়া—
কি ভয় কি ভয় তোর

ওরে হৃদয় আমার
উঠিবে রে সাঁতারিয়া।

লণ্ডনে আইন অধ্যয়নকালে রচিত গীতাবলী

(১)

তুই

প্রভাতের তারা তুই
প্রভাতে ফুটিবি শুধু
স্বপনের পদ্ম তুই,
আমার পরাণ বঁধু।
প্রভাতের পানে চেয়ে
অরুণিম আঁখি তোর,
আয়রে নিলাজ মেয়ে
তুই যে প্রভাত চোর।

(২)

আঁধার ভুলিতে চাই

আঁধার ভুলিতে গিয়ে—আঁধারে ডুবিয়া যাই।
আঁধারের পায় পায়
পরাণ ধরিতে চায়
একটু বহিলে বায় কে যে আমি ভুলে যাই।
ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে
আঁধার আঁধার তার—
জীবনের কাজ মোর রহিল পড়িয়া,
মায়ার বাঁধন তায়; যখনি ভাঙ্গিতে চাই
বিস্মৃতি-সাগরে আমি তখনি ডুবিয়া যাই।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মজীবন—১৮৯৪ খৃঃ ১৯২০ খৃঃ

বিবাহ

[কর্মজীবন ঃ ১৮৯৪ খ্রীঃ। ১৯২০ খ্রীঃ ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ

চিত্তরঞ্জনের জীবননাট্যে শুরু হলো দ্বিতীয় অঙ্ক। এর সূচনায় যেমন দেখতে পাই দুঃখকষ্টের ইতিহাস, পরিসমাপ্তিতে তেমনি যশ, খ্যাতি, সম্মান ও প্রভূত অর্থ উপার্জনের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের একটা চলতি কথা আছে 'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।' ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের জীবন তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যারিস্টার হয়ে তিনি শুরু করলেন হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস। কষ্টের অমাবস্যা-রাত্রি ঘরে-বাইরে সর্বত্র তাঁর জীবনে ঘন অন্ধকারের ছায়া ফেলল।

হাইকোর্টে তখন এস. পি. সিংহ, বি. সি. মিত্র এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি দিক্‌পাল ব্যারিস্টারদের প্রবল প্রতাপ। এঁদের সঙ্গে তরুণ অর্থহীন এবং সদ্য-ইংল্যাণ্ড-প্রত্যাগত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনকে প্রথমে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। হাইকোর্টে তিনি তেমন সুবিধে করে উঠতে পারছিলেন না বলে তাঁকে প্রায়ই মোকদ্দমা নিয়ে মফঃস্বলে যেতে হ'তো। Fee ছিল মাত্র ৫১ টাকা—এদিকে হাইকোর্টে নিয়মিত উপস্থিত হতে না পারার জন্য পসারও জমিয়ে তুলতে পারছিলেন না—কিন্তু কি করবেন, অর্থ উপার্জনই তখন তাঁর জীবনের একমাত্র সাধনা। যেমন করে হোক টাকা রোজগার করতেই হবে। অবশ্য সেটা সৎপথে নিশ্চয়। ব্যারিস্টারির আয়ে সংকুলান হচ্ছিল না বলে তিনি সিটি কলেজে 'Law Lecturer'-এর চাকরি নিলেন। এই তো গেল বাইরের চিত্র।

ভিতরের অবস্থা আরও শোচনীয়। পিতা ভুবনমোহন ঋণের

জালে জর্জরিত হয়ে দেউলিয়া আদালতের আশ্রয় নিয়েছেন। কর্ম থেকেও অবসর নিয়েছেন তিনি। বাবা, মা, ভাইবোন মিলে সুবৃহৎ পরিবার; আর তা পরিচালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব একলা চিত্তরঞ্জনের। ব্যারিস্টারি করতে গেলে যে আড়ম্বরের প্রয়োজন তা যোগাবার মতও পয়সা নেই। কি কষ্টে যে তাঁর দিন চলত সে কথা তিনি আর তাঁর অন্তর্যামী ছাড়া বোধ হয় কেউ জানে না। সামান্য বাজার-খরচের একটা টাকাও অনেক সময় কষ্টে জোগাড় করতে হতো, সামান্য ২।৪ পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচাবার জন্য হাইকোর্ট থেকে হেঁটে ভবানীপুর আসতেন, খাবার পয়সা থাকতো না বলে তিনি টিফিনেও কিছু খেতেন না। দুঃখকষ্টে মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন তরুণ ব্রীফলেস ব্যারিস্টার, কিন্তু তাঁর প্রশস্ত আনন একদিনের জন্যও ম্লান হয়নি। ভুবনমোহনের তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। চিত্তরঞ্জন কষ্টের মধ্যেও ভাইবোনদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং দুই ভাইকেই বিলেত পাঠিয়েছেন। অবিবাহিতা বোনদের যোগ্য পাত্রে বিয়ে দিয়েছেন, আর বাবা-মার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে প্রখরভাবে দৃষ্টি রেখেছেন। এত দুঃখের মধ্যেও তাঁর জীবনে এলো প্রজাপতির পাখায় ভর করে মিলনদিনের শুভলগ্ন।

বিবাহ

১৮৯৭ খ্রীঃ বিক্রমপুরের নওগাঁনিবাসী বিজনী স্টেটের দেওয়ান বরদানাথ হালদারের (মুখোপাধ্যায়) জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তী দেবীর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন চিত্তরঞ্জন।

বরদানাথ তাঁর কন্যার সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বিবাহ দেবেন একথা জানতে পেরে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁদের অভিযোগ চিত্তরঞ্জন চালচুলোহীন দেউলিয়া পিতার পুত্র, আর্থিক সচ্ছলতা তাঁর মোটেই নেই। নেই ব্যবসায়ে পসার।

তিনি সুরাপান করেন এবং তাদের মতে উচ্ছৃঙ্খল এবং

ঈশ্বর বিদ্রোহী এইসব বিশেষণে তিনি বিভূষিত হয়েছিলেন তাঁর 'মালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'বারবিলাসিনী' এবং 'ঈশ্বর' এই কবিতা দুটির জন্যে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন 'কবিরে খুঁজ না তাঁর কাব্যে' —কিন্তু তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজ শুধু এই কবিতা দুটি দিয়েই চিত্তরঞ্জনের চরিত্র বুঝে ফেললেন যেন! সুতরাং এঁদের মিলনে প্রাণপণ বাধার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের পেছনে থাকে ভগবানের অমোঘ নির্দেশ, তাই মানুষের তথা ব্রাহ্মসমাজের এই বাধা তাঁদের মিলনের পথরোধ করতে পারল না। কারণ তাঁদের দুই পরিবারে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। চিত্তরঞ্জনকে জামাতারূপে পেয়ে বরদানাথ খুবই খুশী হয়েছিলেন এবং বিয়ের আগে মেয়েকে বলেছিলেন, "বাসন্তী, তোকে যার হাতে দিচ্ছি একদিন দেখবি ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তার নাম ধ্বনিত হবে, হয়তো আমি তখন থাকবো না কিন্তু তুই এটা নিশ্চয় দেখবি—।" বাসন্তী দেবী বলতেন, "দেবতুল্য আমার বাবার সে ভবিষ্যৎবাণী তো মিথ্যে হয়নি।"

ব্রাহ্মসমাজের রীতি অনুসারে চিত্তরঞ্জন বাসন্তী দেবীকে বিয়ের সময় পনেরো টাকা দিয়ে একটি চুনি ও পান্না-বসানো আংটি দিয়েছিলেন। পরে এই নিয়ে বাসন্তী দেবী ছেলেমেয়েদের বলতেন, "থাক থাক, তোদের বাবা হাতী দিয়েছে ঘোড়া দিয়েছে আর বলতে হবে না, পনেরো টাকার আংটি দিয়ে তোদের বাবা মাথা কিনেছে আর কি!" (অপর্ণা দেবী—মানুষ চিত্তরঞ্জন।)

কিন্তু সেই আংটিটির প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম মমতা। স্বামীর প্রথম দেওয়া ভালবাসার উপহারকে তিনি যেমন যোগ্য সম্মান দিয়েছেন, তেমনি স্বামীর জীবনে এনেছেন ভালবাসার অমৃততীর্থ—সুখে-দুঃখে ঐশ্বর্য-সম্পদে সব সময় কল্যাণময়ীরূপে তিনি মানুষ চিত্তরঞ্জনের জীবনের পাত্রকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন প্রেমের মাধুরীতে। বাসন্তী দেবীর মত সহধর্মিণী না পেলে চিত্তরঞ্জন কতখানি 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' হতে পারতেন সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। স্বামীর জীবনে তিনি শুধু-

মাত্র স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন সঙ্গিনী, বান্ধবী, সচিব এবং পরামর্শদাত্রী। স্ত্রী হয়ে শুধুমাত্র সংসারধর্ম পালন করেই তিনি স্বামীর প্রতি তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি, স্বামীর দেশসেবায় সহকর্মিণীরূপে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাসিমুখে কারাবরণ করেছেন। আবার তিনি চিত্তরঞ্জনের সাহিত্য জীবনেও ছিলেন অন্যতম প্রেরণাদাত্রী, সমালোচক এবং পাঠিকা।

আসলে সে যুগের মেয়ে হয়েও আধুনিক যুগের মেয়েদের মত—'ঘর ও বাহির'কে জীবনের সঙ্গে এক করে নিয়েছিলেন বাসন্তী দেবী। তাঁর হাতের রান্না ছিল অপূর্ব। এ সম্পর্কে অপর্ণা দেবী বলেছেন, "আমার একমাত্র ভাই ভোম্বল (চিররঞ্জন) যখন মারা গেল, তখন মা তাঁর বউ সুজাতাকে নিত্য নতুন রকমের নিরামিষ রান্না করে খাওয়াতেন।"

বাসন্তী দেবী আজও জীবিতা কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী বলে কে তাঁকে কতটুকু সম্মান দেন? মনে হয় এতবড় একজন মহাজীবনের সহধর্মিণী যিনি, তিনি তো দেশমাতা হিসাবেই পূজিত হবার কথা। এই উপলব্ধি ছিল সুভাষচন্দ্রের মধ্যে। তিনি বাসন্তী দেবীকে শুধু 'মা' বলে ডাকতেন না, মায়ের মত সম্মান করতেন, আবদার করতেন। সুভাষের মা বাসন্তী দেবীকে বলতেন, "দিদি, সুভাষ আধখানা আমার ছেলে আর বাকী আধখানা আপনার।" (এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এই দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বরাবরই ছিল।)

রাত্রিবেলা বাসন্তী দেবী সুভাষচন্দ্রকে বলতেন, "বাবা, তুমি বাড়ী যাও; তোমার মা ভাববেন।" সুভাষচন্দ্র হেসে উত্তর দিতেন, "কেন, আমি তো আমার মায়ের কাছেই রয়েছি।"

১৯১৯ খ্রী: নিখিল ভারতীয় মহিলা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে বাসন্তী দেবীকে সভানেত্রী পদে বরণ করা হয়েছিল। এই সভার অভিভাষণে তিনি বলেছিলেন—"মনে রাখিবেন, আমাদের আদর্শ সতী, সাবিত্রী ও সীতা। যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহা হইলে বর্তমান

কালের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য সেই ভারতীয় আদর্শকে সংস্কার করিয়া লউন কিন্তু ভারতের সেই চিরন্তন আদর্শকে নষ্ট করিবেন না।"

এই অভিভাষণের আদর্শই ছিল বাসন্তী দেবীর জীবনের আদর্শ, তাই তিনি স্বামীকে সুখী করতে পেরেছিলেন। নিজেও সুখী হয়েছিলেন, কিন্তু নির্মম ভাগ্যবিধাতার নিষ্করুণ অভিশাপের মত তাঁর জীবনে নেমে এল দুঃখের পর দুঃখ। ১৯২৫ খৃঃ চিত্তরঞ্জন মারা গেলেন। সে শোক ভুলবার সময়টুকু পর্যন্ত না দিয়ে একমাত্র পুত্র ভোম্বল পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেল ১৯২৬ সালে।

আজ তিনি বৃদ্ধা। অশক্ত হয়ে পড়েছেন তবুও মনের তন্ত্রীতে বেজে চলেছে অতীতের সেই সমারোহপূর্ণ দিনের করুণ রাগিণী, মনের মণিকোঠায় অতীতের সে দিনগুলি আজও ছায়াছবির মত আসা-যাওয়া করে, আর চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায় বর্তমান।

চিত্তরঞ্জনের দুই কন্যা ও একমাত্র পুত্র। ১৮৯৮ খৃঃ জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণা দেবীর জন্ম হয়। অপর্ণা দেবী ছিলেন চিত্তরঞ্জনের চোখের মণি। এই মেয়েকে না দেখলে তাঁর দিন কাটত না। এমন কি বিয়ের পরও রোজ রাত্রের খাওয়া বাবার সঙ্গে বসেই খেতে হতো বাপের বাড়ীতে। তিনি যখন অন্তিমযাত্রার জন্য দার্জিলিং যান, তখন অপর্ণা দেবীকে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত কোন অসুবিধের জন্য তিনি বাবার সঙ্গে যেতে পারেন নি। সেদিন তো আর তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে এ জীবনে আর বাবার সঙ্গে দেখা হবে না। তা হলে বাবার এ অনুরোধ কখনও ঠেলতেন না। চিত্তরঞ্জন তখন রসিকতা করে বলেছিলেন, "মাটি আর মেয়ে কোনদিন আপন হয় না।" বাবার শেষ সময়ে তিনি পাশে ছিলেন না—এ দুঃখ আজও তিনি ভুলতে পারেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে অপর্ণা দেবী খুব বিলাসী ছিলেন এবং তাঁর এই বিলাসিতার উপকরণ জুগিয়েছেন বাবা। ভাল এবং দামী জামাকাপড় ছাড়া তিনি পরতেন না, বিলিতি প্রসাধনদ্রব্য ছাড়া

ব্যবহার করতেন না—কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ফলে যেদিন বাবা জেলে গেলেন, সেদিন তিনি খদ্দর পরিধান করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বামীও স্ত্রীর অনুসরণ করলেন। চিত্তরঞ্জন যখন স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, তখন অপর্ণা দেবী এ ব্যাপারে বাবাকে খুব সহায়তা করেন—অনেক পরিশ্রম করে প্রচুর টাকা তিনি তুলে দিয়েছিলেন। এ সময়কার একটা মজার ঘটনা তিনি তাঁর 'মানুষ চিত্তরঞ্জনে' লিখেছেন—

"পিতৃদেব জেলে থাকাকালীন আমরা তাঁর নির্দেশে তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য চাঁদা তুলতাম। গয়নাগুলো আমরা গায়ে পরে বাবাকে দেখতে যেতাম। সুভাষচন্দ্র আমাদের এই অলঙ্কার-সজ্জা দেখে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কি, হলো! গায়ে ব্যাঙ্ক চাপিয়ে এসেছেন যে!' তখন তাঁকে আমাদের বোঝাতে হ'লো যে, এ না হলে তো কারা-গারের মধ্যে ব্যাঙ্ক আনা সম্ভব নয়।" আজও তাঁর দেশের জন্য আছে সুগভীর দরদ ও মমত্ববোধ। জীবনে অনেক দেখেছেন তিনি; বহু অভিজ্ঞতার পুণ্য সঞ্চয় এক মহাপুণ্য জীবনের নাম অপর্ণা দেবী, যিনি দেশবন্ধুর আদরে এবং আদর্শে গড়া। ১৮৯৯ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনের এবং ১৯০১ সালে কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীর জন্ম হয়। চিররঞ্জন হয়ত পিতার মত নামযশ বা খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি কিন্তু নীরব কর্মী হিসেবে তিনি চিরদিন পিতার সঙ্গে থেকে দেশের কাজ করে গেছেন। অসহযোগের সময় তিনি জেলে গেছেন এবং তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের সময়ও কারাবরণ করেছেন। ইংরেজ সরকার তাঁর ওপর খুবই অত্যাচার চালিয়েছিল, দেশকে সুগভীরভাবে ভাল না বাসলে এই অত্যাচার সহ্য করা কি তার পক্ষে সম্ভব হ'তো? কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস চিররঞ্জন দাসকে মনে রাখবে না, আর এর জন্য দায়ী শুধু ইতিহাস নয়—নিষ্ঠুর মহাকাল। বিয়ের মাত্র

ছয় বছর বাদে তিনটি কন্যাসন্তান রেখে জীবনের মধ্যাহ্নবেলায় ঝরে গেল একটি সদ্যফোটা ফুল।

তিন পুত্রকন্যা নিয়ে চিত্তরঞ্জনের সুখী ও পরিপূর্ণ বিবাহ-জীবন পূর্ণতা লাভ করেছিল—কিন্তু আইন ব্যবসায়ে তখনও তিনি ভাঙা হাল নিয়ে তরী বেয়ে চলেছেন। কলকাতা আর মফঃস্বল করে দিন কাটে; আর্থিক দুশ্চিন্তায় মন সব সময়ই ভারাক্রান্ত থাকে, কিন্তু মনের দাবিকে উপেক্ষা করে সংসারের দাবির জন্য দেউলিয়া পিতাকে ঋণমুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করতে লাগলেন তিনি—শেষে ১৯০৬ সালে জুন মাসে চিত্তরঞ্জনও দেউলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হলেন। এর ফলে তাঁর পসারের আরও ক্ষতি হলো—কারণ এর সঙ্গে তো সামাজিক মানসম্মানের প্রশ্নও জড়িত ছিল। লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হয়ে তিনি লোক-সমাজ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইলেন, মক্কেলরাও তাঁর কাছে আসতে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন। এত যন্ত্রণার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে পিতার ব্যথার ব্যথী হতে পেরেছেন। তিনি বলতেন, "পুত্র যদি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় তবে কেন তার ঋণের অংশীদার হবে না?"

কিন্তু জীবনে দুঃখের শ্রাবণরজনীর বারিধারা শান্ত হয়ে জীবনবৃন্তে উদয় হলো শরতের প্রসন্ন আকাশের, আর তা হবে না বা কেন? আইনজীবীর রক্ত যে বংশপরম্পরায় তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত—চিত্তরঞ্জনের দুই পিতামহ কাশীশ্বর এবং জগবন্ধু সরকারী উকিল ছিলেন। কালীমোহন, দুর্গামোহন এবং ভুবনমোহন তিনভাই ছিলেন আইনব্যবসায়ী। চিত্তরঞ্জনের মেজভাই প্রফুল্লরঞ্জন দাশ পাটনা হাইকোর্টের জজ ছিলেন এবং সর্বকনিষ্ঠ ভাই বসন্তরঞ্জনও ব্যারিস্টার ছিলেন। তবে চিত্তরঞ্জন এ বংশের আইনজীবিদের মুখ উজ্জ্বল করে গেছেন আপন প্রতিভা দিয়ে শুধু তাই নয়, তাঁর বিশ্লেষণ-শক্তি অন্তর্দৃষ্টি বিচারবুদ্ধি দিয়ে ভারতের আইনজীবীর ইতিহাসে তিনি আপন নাম লিখে গেছেন স্বর্ণাক্ষরে।

'সন্ধ্যা' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মামলাকে কেন্দ্র করে চিত্তরঞ্জনের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়, আর তা পূর্ণতা লাভ করে আলিপুর বোমার মামলাকে ঘিরে। এরপর ব্যারিস্টার C. R. Das হয়ে উঠলেন কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারদের মধ্যাহ্নগগনের সূর্য। তাঁর তেজের কাছে অনেক নামী নামী জজ, ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিভা ম্লান হয়ে গেছে। একের পর এক বিরাট বিরাট মামলা পরিচালনা করে অপরিমিত অর্থের অধিকারী হলেন তিনি—দুঃখের মেঘ কেটে গেল। এল ময়ূরের পাখা মেলে রাজসুখসমারোহের দিনগুলি। খাবার টেবিল ভরে উঠল দেশী ও বিলিতী নানা উপাদেয় খাবারে। সর্বোৎকৃষ্ট বিলিতী ব্রাণ্ডি এক পেগ্ করে খেতেন তিনি প্রতিদিন। তাছাড়া দামী তামাক চুরুট সবই চলতো, পরিচ্ছদেও ছিল অপরিসীম বিলাসিতা, ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন তিনি কিন্তু তা হওয়া চাই সর্বোৎকৃষ্ট। বাইরে কোথাও যেতে হলে পুরো কম্পার্টমেণ্টখানা রিজার্ভ না করলে তিনি যেতে পারতেন না। আর সে সময় দু'হাতে খরচ করতেন তিনি। কুলীদেরই হয়ত দু আনার জায়গায় দু টাকা বকশিশ দিতেন। এ নিয়ে কেউ অভিযোগ করলে বলতেন, আমরা কি ওদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিই? দাড়ি কামিয়ে নাপিতকে দিতেন দশটাকা। বড় মেয়ের বিয়েতে একলাখ টাকা খরচা ক'রে বাড়ী সাজালেন। লক্ষ্মীর আশীর্বাদে অজস্রতার মধ্যে জীবনকে নতুন ধারায় বইয়ে দিলেন তিনি। এর সূচনা ঘটেছিল 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। যদিও একটা কথা বলে রাখা ভাল, এইসব স্বদেশী মামলা করে বেশার ভাগ জায়গায়ই তিনি পারিশ্রমিক নেননি বা নামমাত্র নিয়েছেন, কিন্তু এই মামলাসমূহকে কেন্দ্র করেই তাঁর আইনজ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং অনেক বিখ্যাত দেওয়ানী মামলা তাঁর হাতে একের পর এক আসতে থাকে যা তাঁকে বিত্তশালী করে তোলে।

এখানেও কি আমরা স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জনের পরিচয় পাই না?

হাইকোর্টে তখন তো নামী ব্যারিস্টার অনেকেই ছিলেন; আর আলিপুর বোমার মামলার পূর্বে চিত্তরঞ্জনের নাম তো এমন দিগন্ত-প্রসারী হয়নি, কিন্তু কই তাঁরা তো ফি না নিয়ে এমন সর্বশক্তি দিয়ে এইসব মামলা হাতে নিয়ে স্বদেশপ্রেমিক যুবকদের বাঁচাবার জন্য এমন মনপ্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করেন নি? অরবিন্দকে মুক্ত করে চিত্তরঞ্জনের কোন্ স্বার্থ সিদ্ধ হলো? এখানে লোকে তাঁর নামযশই বড় করে দেখল কিন্তু তাঁর নামযশকে কি অতিক্রম করে যায়নি তাঁর সুগভীর স্বদেশপ্রেম? স্বদেশপ্রেমিক সহায়সম্বল ও অর্থহীন এই বিদ্রোহী যুবক-দের প্রতি চিত্তরঞ্জনের চিত্তের আন্তরিক মমতা ছিল, আর চিত্তরঞ্জন না থাকলে এদের হয়ে কথা বলবার কেউ থাকতো না। তিনি বলতেন, এদের স্বদেশপ্রেমের কথা মনে পড়লে অন্তর শ্রদ্ধায় ভরে যায়।

১। বন্দেমাতরম্ মামলা (১৯০৭ খ্রীঃ)

'বন্দেমাতরম্' এই দুটি শব্দের মধ্যে জেগে উঠল বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ। আর সেই জাগরণের মন্ত্রকে নামরূপে গ্রহণ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর দেশের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ জন্ম নিল 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা। 'India for Indians' 'ভারত ভারতবাসীর' এই তেজোদ্দীপ্ত বাণী ললাটে বহন করে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হতো 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা বা অস্ত্রহীন বাঙালীর লেখনীর তরবারি! পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের অগ্নিবর্ষী লেখনীর আঘাতে ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে উঠল। সচকিত হয়ে তাঁরা দেখলেন যে, এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের আড়ালে ভারতবর্ষের নতুন পথের ইঙ্গিত। এরপর ১৯০৭ খ্রীঃ ২৭শে জুন 'Politics for Indians' এবং ২৮শে জুন যুগান্তর মোকর্দমা প্রকাশিত হবার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদককে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করা হলো। কিন্তু তখনকার দিনে পত্রিকায় সম্পাদকের নাম ছাপা হতো না। অতএব অরবিন্দ শাস্তির

দায় থেকে অব্যাহতি পেলেন এবং এই পত্রিকার মুদ্রক হরিচরণ তিন মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ইংরেজ সরকার এইবার সাক্ষীরূপে বিপিনচন্দ্র পালকে তলব করলেন। চিত্তরঞ্জনকে এই মামলায় আসামীপক্ষের ব্যারিস্টার দেওয়া হয়। চিত্তরঞ্জন বিপিন পালকে কোর্টে হলফ করতে নিষেধ করেন এবং আসামীর পক্ষ সমর্থনে নিম্নলিখিত জবানী পাঠ করে সমগ্র বিচারশালাকে স্তম্ভিত করেন। কারণ তিনি দেখলেন যে বিপিনচন্দ্রের সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হবেন, ফলে জাতির নবজীবনের উন্মেষপথে পরম সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত এই 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাটি উঠে যাবে—তাই তিনি বিপিনচন্দ্রকে আদালতে হলফ করতে নিষেধ করেছিলেন।

আসামীর জবানীতে চিত্তরঞ্জন বললেন :

I honestly believe that prosecutions like that of 'Bandemataram' are unjust and injurious because they are subversive to the rights of the people and injurious because they are calculated to stifle freedom of thought and speech, nor are they justified in the interests of the public peace.

Is not an individual at liberty if he has conscience to come forward and say that although I feel that in an ordinary case it is my duty to do so, but hereof find that you are stifling of speech and writing and that you are curtailing the liberty of the people, is not a man in such a case at liberty to say that although I consider it my duty in an ordinary case but in a case like this my conscience tells me not to help in what is not the administration of justice but in what is unjust, unrighteous and iniquitous prosecution which depends upon the whims and caprices of the people who are somewhere outside. If a man who acts according to the

dictates of his conscience is to be prosecuted then all that he can say is that in the history of nations no right was ever secured anywhere in the world except through sufferings of the individuals. I stand upon my right which is the birth right of every human being to say that my conscience is against this and my conscience tells me in emphatic language not to assist in a prosecution of this iniquitous character and if for this I am to be punished, 'well', let it be so.

"এই মোকদ্দমার সৃষ্টি অবধি আমার ধারণা যে, ইহা অন্যায় ও সাধারণের স্বাধীনতার পরিপন্থী। সুতরাং সাধারণের শান্তির জন্য আমি কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করিতেছি।" (আসামী)

"আমি জিজ্ঞাসা করি সাক্ষী হইলেই কি বিবেকবাণীর আদেশানুযায়ী কাজ করিবার অধিকার লুপ্ত হয়; সাক্ষীর কি একথা বলিবার অধিকার নাই যে যদিও হলফ করা বা সাক্ষ্য দেওয়া তাহার কর্তব্য সন্দেহ নাই বটে, যেখানে তাহার ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব, সত্য বলিবার শক্তি হৃত, স্বাধীন ইচ্ছা প্রতিহত, যে মোকদ্দমা পরিচালনে ন্যায়ের মর্যাদা সংরক্ষিত হয় না, যেখানে শাসনযন্ত্রের যথেচ্ছাচারিতা নিবারণ করিতে ধর্মাধিকরণের কোন আধিপত্য নাই, সেই বিচার-আদালতকে সাহায্য না করিলে কি বাস্তবিকই তাহার অপরাধ হয়? ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় এ সমস্ত মোকদ্দমার সাক্ষ্য দেওয়া কর্তব্য হইতে পারে, কেননা সেখানে যে ক্ষমতায় এই সমস্ত অভিযোগ এবং মোকদ্দমা পরিচালিত হয় তাহা গণতান্ত্রিক মুখাপেক্ষী; আবশ্যক হইলে উহা সেই ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্তু যেখানে সেই ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয় তথায় আমি এইরূপ ন্যায়বিরুদ্ধ অভিযোগে সহায়তা প্রদান না করিলে কেন দণ্ডার্হ হইব আর যদি বিবেকের অনুশাসন মানিবার জন্য বাস্তবিক আমার অপরাধ হইয়া থাকে, ব্যক্তির জন্মগত অধিকারবলে কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত কার্য করিলে যদি সত্যই আমার

দণ্ড হয়, যদি ন্যায়বিরুদ্ধ অসঙ্গত ধর্ম-বিগর্হিত অভিযোগে সহায়তা প্রদান না করিলে আমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয় তবে আমিও মুক্তকণ্ঠে নিবেদন করিতেছি যে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই দেখিতে পাই যে কেহই দুঃখভোগ বা কারাভোগ ব্যতীত স্বীয় অধিকারলাভে সমর্থ হয় না—এবং আমিও অবনতমস্তকে আপনার প্রদত্ত শাস্তিভোগ করিতে প্রস্তুত আছি।"

চিত্তরঞ্জনের এই বক্তৃতার পর বিচারক যেন একান্ত নিরুপায় হয়েই আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য বিপিনচন্দ্র পালকে ছয়মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

২। ব্রহ্মবান্ধব ও সন্ধ্যা পত্রিকার মামলা (১৯০৭-৮ খৃঃ)

জীবনে বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার উপলব্ধিপূর্ণ একটি নাম ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৬১ সালে কলকাতা শহরের এক বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ পরিবারে। সে সময়ে দেশে একদিকে রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্মের অপ্রতিহত প্রভাবে ভেসে চলেছে নব্য বাংলার যুবকদল, আর অপরদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা তাদের জীবনে যোগাচ্ছে নব অনুপ্রেরণা —সে অনুপ্রেরণা দেশাত্মবোধের! কলেজ-জীবনে তিনি সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন, আবার কেশব সেনের ব্রাহ্মধর্ম তাঁকে টানত, ফলে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এতেও তাঁর অন্তর তৃপ্ত হলো না, পরে তিনি রোমান ক্যাথলিক পাদরিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আবার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। মনে হয় অন্তরের প্রকৃত মুক্তি কোন পথে তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি—তাই ধর্মের ঘাটে ঘাটে সেই পরমের অন্বেষণ করে গেছেন তিনি। এই সময়েই বাবার দেওয়া নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিত্যাগ করে নাম নিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

প্রথমে ইনি সিন্ধুদেশে 'Conquered' নামক একটি পত্রিকা পরিচালনা করেন, পরে কলকাতায় এসে 'Twentieth Century' নামে একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে তার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এমনি করে দিন কাটতে লাগল।

তারপর হঠাৎ এসব ছেড়ে চলে গেলেন লণ্ডন। সেখানে হিন্দুদর্শন ও ধর্মনীতি সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করলেন—ইংরেজ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ দেখলেন যে ভারতীয় বেদান্তদর্শনের মধ্যে জানবার অনেক আছে,—সূচনা ঘটল Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত-চর্চার।

সারা ইউরোপ পরিভ্রমণ করে ফিরে এলেন কলকাতায়, পুনরায় ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন—রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান প্রায়শ্চিত্ত করে হলেন ব্রাহ্মণ। হয়ত যা তিনি চেয়েছিলেন বা অন্বেষণ করেছিলেন তা তিনি পাননি কিংবা গীতার উক্তি 'স্বধর্মে নিধন শ্রেয়'—এ কথাটাই মনে হয়েছিল তাঁর!

দেশের প্রতি সুপ্ত মমত্ববোধ ব্রহ্মবান্ধবের অন্তরে চিরকালই ছিল, —সেই মমত্ববোধ রূপলাভ করল 'সন্ধ্যার' মত একটি পত্রিকার মধ্য দিয়ে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা এই পত্রিকা বের হ'তো ব্রহ্মবান্ধবের সম্পাদনায় এবং পত্রিকাটির মুখে ছিল মজলিসী হাসি।

ব্রহ্মবান্ধবের অপূর্ব লেখনীতে ব্যঙ্গের তরবারি ঝলমল করে উঠতো।

'Pen is mightier than the sword'—একথাটা ইংরাজেরা বাঙালীজাতির জাতীয় জীবনের এই নব পত্রিকাসমূহের মধ্য দিয়ে নূতন করে উপলব্ধি করেছিলেন। এবার তাদের রোষদৃষ্টি পড়ল জনসাধারণের জন্য সম্পাদিত 'সন্ধ্যা' পত্রিকাটির ওপর। এই সময় অগাস্ট মাসে ব্রহ্মবান্ধব রচিত 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' প্রবন্ধটির জন্য পত্রিকাটির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনলেন ইংরেজ সরকার।

যে সমস্ত কথার মধ্য দিয়ে তারা রাজদ্রোহের গন্ধ পান সেগুলির মধ্যে হাস্যরস ও ব্যঙ্গের ছুরিকা সমস্ত আদালতগৃহকে মুখরিত করে তুলেছিল।

'আজ ত্রয়োদশী তিথি বড় সিদ্ধিদায়ী।
কালীঘাটে জোড়া পাঁটা একটা কালো একটা সাদা
আমাদের পোয়াবারো
ফিরিঙ্গীর তেরো—
যুগান্তরের রক্তারক্তি
টিকটিকির ফাটিল পিত্তি।'

এই পত্রিকার মামলায় রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন ব্রহ্মবান্ধব—মামলার ভার নেবার জন্য এগিয়ে এলেন নিখিল রাজদ্রোহীর অন্তরের দেবতা চিত্তরঞ্জন। ১৯০৭ সালে ২৩শে সেপ্টেম্বর মামলার বিচার আরম্ভ হলো জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের আদালতে। চিত্তরঞ্জন তাঁর তনুমনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে পরিশ্রম করতে লাগলেন মোকদ্দমাটিকে জয়যুক্ত করবার জন্য।

সারাদিন কোর্টে মামলা পরিচালনা করতেন, আবার রাত্রিবেলা ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে নিজের বাড়ীতে বসে মামলার বিষয় আলোচনা করতেন। একজন তপস্যারত যোগী আর অপরজন ঋষি—দুয়ের তন্ময় আলোচনার মধ্য দিয়ে সময় গড়িয়ে গিয়ে কখন যে রাত গভীর হয়ে যেত তা কারুরই খেয়াল থাকত না। চিত্তরঞ্জন আর তাঁকে বাড়ী যেতে দিতেন না—দুজনে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। ব্রহ্মবান্ধব বাসন্তী দেবীর হাতের রান্না খুব ভালবাসতেন।

খাওয়া শেষ হলে শুয়ে পড়তেন মেঝেতে—চিত্তরঞ্জন অনেক অনুনয় করতেন বিছানায় শোবার জন্য, কিন্তু ভূমিশয্যা ছাড়া তিনি গ্রহণ করতেন না। সর্বত্যাগী ঋষির অন্তরের এই নিস্পৃহতা চিত্তরঞ্জনকে যথেষ্ট আনন্দ দিত।

মামলা চলাকালীন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে

কিংসফোর্ডের মনান্তর ঘটে—চিত্তরঞ্জনের সেদিন শরীরটা খুব খারাপ, তিনি টিফিনের সময়ও উঠতে না পারার দরুন কিছু খাননি। বেলা পাঁচটা বেজে গেছে। তিনি এবার উঠতে চাইলেন কিন্তু কিংসফোর্ডের তা ইচ্ছে নয়। চিত্তরঞ্জন বললেন, "আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে এই মোকদ্দমার কাজ আমি এখন করিতে পারিব না।"

কিংসফোর্ড : আমি মোকদ্দমা আর বন্ধ রাখিতে পারিব না।

মিঃ দাশ : আমি তাহা হইলে এই মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কোর্টের অনুমতি চাহিতেছি।

এর পর আর উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই আত্মাভিমানী চিত্তরঞ্জন আদালতগৃহ পরিত্যাগ করলেন এবং কিংসফোর্ডের নিকট বিচার না হয়ে যাতে অন্য আদালতে বিচার হয় সেই জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করলেন। জজ ক্যাসপারস তাঁর সেই আবেদন অগ্রাহ্য করলেন।

ব্রহ্মবান্ধব দীপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন—'আমি ইংরেজের আদালত মানি না। ইংরেজ সরকারের সাধ্য নাই আমাকে জেলে পাঠায়। আমি আমার জবাব লিখিয়া আনিয়াছি।' এই বলিয়া তিনি একখানি কাগজ চিত্তরঞ্জনের হাতে দিলেন। চিত্তরঞ্জন অসীম মনোযোগ সহকারে তা পড়তে শুরু করলেন।

"I accept the entire responsibility of the publication, management and conduct of the newspaper 'Sandhya' and I say that I am the writer of the article 'Ekhan theke gechi premer daye' which appeared in the 'Sandhya' of the 13th August 1907 being one of the articles forming the subject-matter of this prosecution. But I do not want to take part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of swaraj I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and

whose interest is and most necessarily be in the way of our true national development."

(অনুবাদ) "সন্ধ্যা কাগজের প্রকাশকের এবং কর্মাধ্যক্ষের সমস্ত দায়িত্ব আমার এবং আমি স্বীকার করিতেছি যে ১৯০৭ খ্রীঃ ১৩ই আগস্ট তারিখে 'সন্ধ্যা'য় প্রকাশিত 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে' প্রবন্ধটির লেখক আমিই। কিন্তু আমি এই বিচার মানি না। কারণ বিধিনির্দিষ্ট স্বরাজ দাবির আমি যেটুকু কার্য করিয়াছি—তাহার জন্য আমি যে বিদেশীরা ঘটনাক্রমে আমাদের শাসনকর্তা হইয়াছে এবং আমাদের জাতীয় উন্নতি যাহাদের স্বার্থের বিরোধী সেই বিদেশীর নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহি।"

ব্রহ্মবান্ধবের এই জবাবদিহি পাঠ করে চিত্তরঞ্জন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন—আজও একজন বাঙালীর মনে এমন সাহস, নির্ভীকতা সর্বোপরি স্বদেশপ্রেম আছে যার সন্ধান তিনি ব্রহ্মবান্ধবের মধ্যে নতুন করে পেলেন।

চিত্তরঞ্জন এই জবাবদিহি পত্রখানি আদালতে দাখিল করলেন।

এরপর মামলা মুলতুবী রইল, তারিখ পড়ল ২৩শে অক্টোবর—কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব তখন ক্যাম্বেল হাসপাতালে শয্যাশায়ী—সুতরাং বাধ্য হয়ে তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হলো। ২৭শে অক্টোবর—ক্যাম্বেল হাসপাতাল থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট গেল—যে ব্রহ্মবান্ধব যেরূপ অসুস্থ তাতে একমাসের আগে তাঁর আদালতে উপস্থিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর হবে না। কিন্তু উপরওয়ালা এক নাটকীয় পরিণতির মধ্য দিয়ে সেই এক মাস সময়কে অনন্তকালের হাতে পৌঁছে দিলেন—আমি ইংরেজ আদালতের বিচার মানি না। সত্যই মাটির পৃথিবীর আদালতে তাঁর সব বিচার শেষ হয়ে গেল। ভগবানের আদালতে ন্যায়ের বিচারের জন্য এই ঋষিতুল্য ব্যক্তি ১৯০৭ খ্রীঃ ২৭শে অক্টোবর বেলা ৯টার সময় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেন ব্যঙ্গ করে ইংরেজ সরকারকে বলে গেলেন 'ইংরেজ সরকারেরও সাধ্যও নেই যে আমায় জেলে পাঠায়।' মামলায় যবনিকা পড়লো।

এ দুটি মামলা ও প্রধানতঃ আলিপুরের বোমার মামলা পরিচালনা করে চিত্তরঞ্জনের নাম ছড়িয়ে পড়ল, যদিও অর্থ তিনি গ্রহণ করেন নি কিন্তু এই যশঃলক্ষ্মীকে কেন্দ্র করেই একদিন ধনলক্ষ্মী স্বয়ংবরা হয়ে তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন বরমাল্য—এ কথাটা ভুললে চলবে না। মনে পড়ে ছেলেবেলায় জ্যাঠামশায় দুর্গামোহন প্রশ্ন করেছিলেন 'চিত্ত বড় হয়ে কি হবি ?'

বালক চিত্তরঞ্জন নির্ভয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—"আর যাই হই উকিল হবো না; উকিলরা সব জুয়াচোর।" আজ সেই তিনিই দেখালেন অনুশীলন, অধ্যবসায় ও ধৈর্য থাকলে আইনব্যবসায়ও কিছু করা যায়। জীবনে কোনক্ষেত্রে ফাঁকি দিয়ে তিনি জয়লাভ করতে চাননি। একদা ব্রীফলেস ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন হাইকোর্ট থেকে হেঁটে বাড়ী আসতেন, পেছন ফিরে দেখতেন অস্তিম সূর্যের রক্তিম আভায় হাইকোর্টের চূড়োগুলো লাল হয়ে গেছে। কবি চিত্তরঞ্জন হয়ত ব্যর্থতার মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেদিকে তাকিয়ে ভাবতেন, আমার জীবনও কি কোনদিনই এমনি বর্ণময় হয়ে উঠবে না ? এলো রক্তিম আভার সেই পরম লগ্ন বিংশ শতাব্দীর বাংলার বিদ্রোহীদের কেন্দ্র করে—যারা স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করেছে—গান্ধীজীর ভাষায় যারা সন্ত্রাসবাদী! চিত্তরঞ্জনের প্রাণে চিরকালই এই বিপ্লবীদের জন্য সুগভীর দরদ ছিল, তার কারণ এদের প্রদর্শিত পথ হয়ত ঠিক নয়, কিন্তু এরা দেশকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। দেশের জন্য হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে যেতেও পরোয়া করে না।

১৯১৭ খৃঃ এদের সম্পর্কে তিনি ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে বলেছিলেন, "প্রথমেই আমাকে বলতে হয় যাদের এনার্কিস্ট বল তারা বস্তুতঃপক্ষে এনার্কিস্ট নয়। দেশপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ কোন নির্দিষ্ট পথ দিয়ে চলবে একথা কোন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসেই দেখা যায় না। বরং নানা মত ও নানা পথ এসে একসঙ্গে শক্তিশালী হয়ে সুনির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তাই বিপ্লব-

বাদীদের এই দেশাত্মবোধ ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে আমি মনে করি।"

আশ্চর্য সাদৃশ্য গুরুশিষ্যে। এই বিপ্লববাদীদের সম্পর্কে সুভাষ-চন্দ্রের মতবাদটা না বলে পারছি না। তিনি বলতেন, "বিপ্লব মানে শুধু ধ্বংস নয়, সৃষ্টিও—তার এক হাতে রণতূর্য, অন্য হাতে সৃজনমুখর বাঁশরী। তাই একই সঙ্গে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে ধ্বংস ও সৃষ্টির আহ্বান।"

শ্রী অরবিন্দ ও আলিপুর বোমার মামলা (১৯০৮-০৯ খ্রীঃ)

বাংলার নবজাগরণের বিপ্লবী কর্মী শ্রীঅরবিন্দ। 'শ্রী অরবিন্দ' অবশ্য হয়েছিলেন এই ঘটনার পরে। কর্মী ও দেশপ্রেমিক অরবিন্দের সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি কথা বলবো।

১৮৭২ খ্রীঃ কলিকাতাতেই তাঁর জন্ম—বাবা বিখ্যাত সিভিল সার্জন ব্রাহ্ম ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ, দাদামশাই ব্রাহ্ম-সংস্কারক রাজনারায়ণ বসু।

ছেলেবেলা থেকেই লণ্ডনে মানুষ তিনি। চিত্তরঞ্জনের আমন্ত্রণে তিনি যখন বাংলাদেশে এলেন তখন বাংলা কথাবার্তা জানতেনই না। কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী, তাই এই অসুবিধেকে সহজেই অতিক্রম করেছিলেন। 'Plain living and high thinking'—ভারতবর্ষের এই প্রাচীন আদর্শই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ—হিন্দু ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করে-ছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে দিয়েছিলেন নতুন ব্যাখ্যা। এসব কথা অবশ্য তাঁর পরবর্তী জীবনের ঘটনা।

লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন এবং দশম স্থান অধিকার করেন—কিন্তু অশ্বারোহণে অপটুতার দরুন তাঁকে সিভিল সার্ভিসের চাকরিতে গ্রহণ করা হয়নি।

তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নামকরা ছাত্র; তাছাড়া বহু ভাষায় ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। সুতরাং ভারতের মাটিতে পা দিয়েই বরোদার গায়কোয়াড়ের সহায়তায় তিনি বরোদা কলেজে ১৫০০৲ টাকা মাইনের প্রিন্সিপ্যালের চাকরি পেলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল, বাংলাদেশের এই দুর্দিনে সুখের আশায় দূরে সরে থাকতে মন চাইল না—বাংলার অরবিন্দ ফিরে এলেন বাংলায়।

বাংলাদেশের বিপ্লববাদীদের ইতিহাসে নবযুগ আনয়নের জন্য, না চিত্তরঞ্জনের ভাগ্যকে যশঃ ও অর্থের হিমালয়শিখরে পৌঁছে দেবার জন্য, তা কে বলতে পারে! এই দুয়ের জন্যই প্রয়োজন ছিল অরবিন্দের আবির্ভাবের। বাংলাদেশে আগমন করে তিনি হয়ে উঠলেন এই বিপ্লবী যুবক দলের নেতা।

এখানে এসে National College-এ মাত্র ৭৫৲ টাকার চাকরি নিলেন তিনি। কোথায় ১৫০০ টাকা আর ৭৫ টাকা!

সারা বাংলাদেশ অরবিন্দের এই ত্যাগে মুগ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সেদিন কি বাঙালী জানত অরবিন্দ এই ত্যাগের মধ্য দিয়ে জন্ম দিয়ে গেলেন বাংলার আর এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর—সব্যসাচী যেমন দু-হাতে গড়েন, তিনি তেমন দু-হাতে বিলান—নিঃশব্দে, গোপনে! সে কাহিনী শুনতে হলে একটু ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে হবে।

অরবিন্দ বাংলায় এসে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু সে পত্রিকার মামলায় তিনি জড়াননি। এইবার আলিপুর বোমার মামলায় তিনি বেশ ভালভাবেই জড়িয়ে গেলেন।

মামলার ঘটনা

১৯০৮ খ্রীঃ ১লা মে তারিখে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়লেন পুলিসের হাতে মজঃফরপুর স্টেশনে। সারা মজঃফরপুর শহরে হৈ-চৈ

পড়ে গেল। তাদের অপরাধ তাঁরা কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে মিসেস কেনেডী নামক একজন ইংরেজ মহিলাকে হত্যা করেছেন। এই কিংসফোর্ড যে কে তার পরিচয় তো আমরা পেয়েছি। ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন আর প্রফুল্ল চাকী আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্য রিভলবারের সাহায্যে নিজেই নিজের শেষ বিচার করলেন। কিন্তু প্রভুভক্ত একজন ভারতবাসী পুলিস কর্মচারীর হাত থেকে তবুও তিনি রেহাই পেলেন না।

জনৈক স্বদেশীয় পুলিস কর্মচারী ভাবলেন তদন্তের জন্য আর কেন কষ্ট করে সমগ্র মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে যাওয়া। তার চেয়ে সহজ উপায় মুণ্ডটা কেটে নিয়ে যাওয়া।

তাই তিনি করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকীর এই কাটামুণ্ডটি কলকাতার একটি থানার প্রাঙ্গণে যত্নসহকারে প্রোথিত আছে। হায়রে! স্বদেশপ্রেমিকের প্রতি কী সুগভীর সম্মান!

এই ঘটনার পর ইংরেজ সরকারের টনক নড়ে উঠল—তাঁরা ভাবলেন সন্ত্রাসবাদীতে ছেয়ে গেছে দেশ! এদের এই বিপ্লবের কাছে না শেষ পর্যন্ত পরাভব মেনে এমন সোনার দেশ ভারতের মাটি ছেড়ে পালাতে হয়! সুতারাং সাবধান হওয়া দরকার। শুরু হয়ে গেল ঘোর ধরপাকড় এবং খানাতল্লাসী। মুরারীপুকুর থানার বাগানে পুলিস গ্রেপ্তার করলো বারীন্দ্র ঘোষ (অরবিন্দভ্রাতা), উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। গ্রে স্ট্রিটে নিজের বাড়ীতে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে অরবিন্দ ভাবছিলেন নিজের দেশের ভবিষ্যৎ—ঘরে ঢুকলেন ক্রেগান সাহেব। তিনি অরবিন্দকে প্রশ্ন করলেন, শুনলাম আপনি নাকি B. A. পাস করেছেন?

অরবিন্দ—আপনার কি তাতে সন্দেহ হচ্ছে?

সাহেব—আপনার মত শিক্ষিত লোক এই ঘরে এমনি ভাবে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে থাকতে লজ্জা করে না?

অরবিন্দ হেসে বললেন—আমরা গরীব।

সাহেব—ও, তাই ডাকাতি করে রাতারাতি বড়লোক হবার মতলব ?

অরবিন্দ একথার উত্তর দিলেন না।

গ্রেপ্তার করা হলো অরবিন্দকে।

এসব মোকদ্দমায় প্রচুর টাকার দরকার, কারণ তেমন বড় ব্যারিস্টার না দিতে পারলে মুক্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আর এই বিপ্লবী যুবকদের শক্তি, উন্মাদনা, সাহস, সবই আছে, নেই শুধু অর্থ। কারণ জীবনে নিজের স্বার্থের কথা না ভাবলে মানুষ কোনদিনই এ পৃথিবীতে অর্থের মালিক হ'তে পারে না। আর এই যুবকরা দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য সমর্পণ করেছে মনপ্রাণ—তাই অর্থ রোজগার করবার মত এবং অর্থের কথা চিন্তা করবার মত সময়ই বা তাদের কই ?

অরবিন্দের আত্মীয়স্বজনেরা চাঁদা তুলে সংগ্রহ করলেন ২১ হাজার টাকা। মামলার ভার দিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর হাতে। মামলায় প্রায় কোনই কাজ হলো না, কিন্তু শেষ হয়ে গেল ১৬ হাজার টাকা। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা এবার দুর্ভাবনায় পড়লেন। এই বিরাট মামলা টাকা না হলে চলবে কি করে ? কিন্তু টাকা কই ?

অনেকে বললেন, 'সন্ধ্যা' ও 'বন্দেমাতরমের' মামলা করে তো চিত্তরঞ্জনের বেশ নাম হয়েছে, তাঁর হাতে মামলা দাও না কেন ?

অরবিন্দের শ্বশুর ভূপালবাবু একথা শুনে নাক কোঁচকালেন।

এদিকে জেল থেকে সংবাদ পাঠালেন অরবিন্দ যে তাঁর ইচ্ছে এ মামলা পরিচালনার ভার চিত্তরঞ্জনের হাতে দেওয়া হোক। এবার অরবিন্দের তরফ থেকে কৃষ্ণকুমার মিত্র এসে চিত্তরঞ্জনকে এ মামলা গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করলেন। চিত্তরঞ্জন সানন্দে সম্মতি দান করে বললেন, "অরবিন্দ কি কেবল আপনাদেরই বন্ধু, আমার কেহ নহে ? আমি জানতাম এ মামলা পরিচালনার ভার আমাকেই গ্রহণ করতে হবে—ব্রহ্মবান্ধব বলছেন।"

তাঁর একথায় সকলে সচকিত হয়ে উঠলেন, কারণ ব্রহ্মবান্ধব অনেক দিন পরলোকে।

চিত্তরঞ্জন কুষ্টি, অদৃশ্যবাদ এবং পরলোকতত্ত্ব—এসবে খুবই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্ল্যানচেটে প্রায়ই আত্মা আহ্বান করতেন। একদিন এইরূপ আহ্বান করে প্রশ্ন করলেন—কে আপনি?

উত্তর—আমি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

—আপনি কেন আসিয়াছেন?

—তোমাকে একটা কথা বলিতে। তুমি অরবিন্দের মামলা গ্রহণ করিও।

আত্মা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এরপর এলেন উল্লাসকরের মা, বললেন—"আমি শুধু আমার ছেলের জন্য আসিনি, সব ছেলেদের বাঁচাবার ভার তুমি নাও বাবা।"

চিত্তরঞ্জন উল্লাসকরের জননীকে প্রণাম করে বললেন, "আপনার আশীর্বাদে আমরা যেন জয়ী হই।"

শুরু হলো তাপস চিত্তরঞ্জনের জীবনে দুশ্চর সাধনা। গভীর আইনের জগতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন তিনি, ঘুচে গেল দিনরাত্রির ব্যবধান। কতদিন কাজ করতে করতে সকাল হয়ে যেত খেয়াল থাকতো না তাঁর। এ সময়কার কথা অপর্ণা দেবী তাঁর 'মানুষ চিত্তরঞ্জন'-এ লিখেছিলেন, "রসারোডের কোলাহলপূর্ণ বাড়ী নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এক-একদিন এমনও দেখেছি যে তাঁর উঠে এসে খাবার সময়ও থাকতো না। ঠাকুরমা বাবার অফিসঘরে গিয়ে কতদিন তাঁকে খাইয়ে দিয়েছেন। মা পাশ থেকে সন্তর্পণে এটা ওটা এগিয়ে দিতেন। আমরা শুনতাম আমাদের দেশের সোনার ছেলেদের জীবন বিপন্ন, বাবা তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।"

প্রায় ৮।১০ মাস ধরে চলল মামলা। বিনা ফিতে এতবড় একটা মামলা পরিচালনা করার দরুন অন্য মামলাও হাতে নেওয়া সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। ফলে আর্থিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল হয়ে

পড়ল। ঋণ করতে হলো অনেক টাকা, ধীরে ধীরে জ। [illegible] থেকে বিলাসিতার উপকরণগুলো বাদ পড়তে লাগল। কিন্তু সাধক তন্ময় হয়েছেন কঠোর তপস্যায়, তাঁর একমাত্র সাধনা এদের মুক্ত করা। রোজ সকালবেলা কোর্টে আসতেন তিনি এবং কোর্ট বন্ধ হওয়ার পর বাড়ীর পথে রওনা দিতেন। কোনদিন এই মামলা ছেড়ে এক মিনিটের জন্যও যেতেন না অন্য কোথাও। তিনি বলতেন, "অরবিন্দ নয়, যেন আমি নিজেই অভিযুক্ত হয়েছি, নিজেকে সমর্থন করতে নিজেই দাঁড়িয়েছি।"

শুরু হলো বিচার। মহামহিমান্বিত ভারতসম্রাটের বিচারপতির কক্ষ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ।

বিচারপতি প্রবেশ করলেন তাঁর গাম্ভীর্য নিয়ে। ওদিকে আসামীদের মধ্য থেকে আসামী উল্লাসকর আনুনাসিক কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এ দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।'

স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিচারপতি।

শুরু হলো ঐতিহাসিক বিচার। আদালতের মধ্যে বীচক্রফ্‌টের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বাধে আইনের ঘোরতর বিবাদ—চিত্তরঞ্জন নিজের ব্যাখ্যা কিছুতেই বদলাতে রাজী নন—বীচক্রফ্‌টও নাছোড়বান্দা! হঠাৎ খুবই রাগের সঙ্গে বীচক্রফ্‌ট বলে উঠলেন, "You are talking nonsense."

ব্যস! আর যায় কোথায়! জ্বলে উঠলেন প্রখর আত্মমর্যাদাজ্ঞান-সম্পন্ন চিত্তরঞ্জন। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "You are on the Bench Sir, and that language should not come from your mouth. Have you been anywhere else I would have made you known how to answer."

"দুঃখের বিষয় আপনি বিচারপতির আসনে, এ ঘটনা যদি অন্য জায়গায় ঘটত তবে আমি উপযুক্ত উত্তর দিতে পারতাম।"

তাঁর এই জবাবে জনাকীর্ণ-মুখর আদালত ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। বাঙালী বোধ হয় নতুন করে অনুভব করে,—না, বাঙালী আজও মরেনি।

চিত্তরঞ্জনকে সামনে দেখে বোধহয় অরবিন্দ অন্তরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন; তাই তিনি বলেছিলেন, "যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন।" এরপর তিনি জেলের মধ্যে নারায়ণ দর্শন করতেন বলে শোনা যায়। আর এ ঘটনাই পরবর্তীকালে পূর্ণ পরিণতি এনেছিল পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দের মধ্য দিয়ে।

এই সময় গোলযোগ বাধল অরবিন্দের ভ্রাতা বারীনের একটা চিঠি নিয়ে। চিঠিটা এই :—

Dear Brother,

We must have sweets all over India, ready-made for the Imergency. I wait for your answers—

Yours

Barindra K. Ghose

আদালতের ভাষায় এই sweets হলো বোমা এবং এই চিঠিটা নাকি সুরাট কংগ্রেসের পরই বারীন্দ্র তাঁর দাদা অরবিন্দকে লিখে সন্ত্রাসবাদীদের প্রস্তুত হবার ইঙ্গিত জানিয়েছেন।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন তাঁর সুগভীর আইনজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে, এ চিঠি জাল। আর প্রমাণস্বরূপ তিনি নিম্নের কারণগুলি দেখালেন :—

প্রথমতঃ, পুলিসের কথায় তাঁরা দুজনেই তখন সুরাটে, সুতরাং তাকে এই রকম একটা ভয়ঙ্কর চিঠি ডাকমারফত পাঠাবার কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। বারীন্দ্র যে সুরাটে গিয়েছিলেন তার উপযুক্ত প্রমাণও পুলিস প্রদর্শন করতে পারেন নি।

দ্বিতীয়তঃ, বারীন্দ্র অরবিন্দকে মেজদা বলে ডাকতেন; অতএব বড় ভাইকে চিঠিতে 'Dear Brother' বলে কখনও সম্বোধন করতে

পারেন না। তাছাড়া কোন বিপ্লবী বোকার মত এই রকম একটা দুঃসাহসিক চিঠিতে নিজের নাম স্বাক্ষর করে না।

তৃতীয়তঃ, বারীন্দ্রের মত একজন শিক্ষিত লোক imergency এই রকম ভুল বানান কখনই লিখতে পারেন না।

চতুর্থতঃ, চিঠিটা পায় পুলিস অরবিন্দের গ্রে স্ট্রিটের বাড়ীতে। অরবিন্দকে তো পুলিস দারুণ একজন বিপ্লবী বলে মনে করেন, সুতরাং এইরকম একজন লোক এই ধরনের একখানা ভয়ঙ্কর চিঠি নিয়ে সারা ভারতবর্ষময় ঘুরে বেড়ালেন, তা কেমন করে সম্ভব হলো ?

এই সমস্ত অকাট্য যুক্তি থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় চিঠিখানি জাল। আদালত চিত্তরঞ্জনের এই যুক্তি মেনে নেয়। সেসন কোর্ট থেকে হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স ও মিঃ উডরফের এজলাসে মামলার শুনানি আরম্ভ হলো—এলো জাতীয় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ ; চিত্তরঞ্জনের বিচারবুদ্ধি, যুক্তির কাছে পরাভূত হয়ে গেল চতুর ইংরেজ সরকার।

শুরু করলেন চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা : It is suggested that I preached the ideal of freedom to my country which is against the law, I plead guilty to the charge. If that is the law here I say I have done that and I request you to convict me but do not impute to one crime. I am not guilty of deeds against which my whole nature revolts and which having regard to my mental capacity in something which could never have been perpetrated by me.

If it is an offence to preach the ideal of freedom I admit having done it—I have never disputed it. It is for that I have given up all the prospects of my life. It is for that I come to Calcutta to live for it and to labour for it. It has been one thought of my waking hours, the dream of my sleep. If that is my offence, there is no necessity to

bring witnesses into thebox to depose to different things in connection with that. Here am I and I admit it. My whole submission before the court is this. Let not the scene enacted in connection with the sedition trial of the Bandemataram andbe enacted over again but let the whole trial go into a side issue.

If that is my offence let it be so stated and I am cheerful to bear any punishment. It pains me to think that crimes repellent to me and against which my whole nature revolts, should be attributed to me and on the strength not only of evidence on which the slightest reliance cannot be placed but on my writings which breathe and breathe only of that high ideal which I felt, I was called upon to preach. I have done that and there is no question I have ever denied it. I have adopted the principles of political philosophy of the West and I have assimilated that to the moral teachings of Vedantism. I felt I was called upon to preach my country to make them realise that India had a mission to perform in the comity of nations. If that is my fault, you can chain me, imprison me, but you will never get of me a denial of that charge. I venture to submit that under no offence of the law do I come for preaching the ideal of freedom and with regard to which I have been charged, I submit that there is no evidence on the record and it is absolutely inconsistent with every thing that I thought that I wrote and every tendency of my mind discovered in the evidence.

I appeal to you therefore that a man like this

who is being charged with the offence with which he has been charged, stands not only before the Bar of this court but before the Bar of the High court of History and my appeal to you is this, that long after this controversy will be hushed in silence, long after this turmoil this agitation will have ceased, long after he is dead and gone he will be looked as the poet of pariotism, prophet of nationalism and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed not only in India but across distant seas and lands. Therefore I say that the man in this position is not only standing before the Bar of this court but before the Bar of the High Court of History. The time has come for you, Sir, to consider your judgment and for you gentlemen to consider your verdict. I appeal to you, Sir, in the name of all the traditions of the English Bench from that most glorious chapter of English History. I appeal to you, in the name of all that is noble, of all the thousands of principles of law which have emanated from the English Bench and I appeal to you in the name of the distinguished Judges who have administered the law in such a manner as to compel not only obedience but the respect of all those in the cases in which he had administered the law, I appeal to you in the name of glorious chapters of English History and let it not be said that an English Judge forgets to establish justice. To you gentlemen I appeal in the name of this very ideal that Aurobindo preached in the name of the traditions of our country and let it not be said that two of

his countrymen were overcome by passions and prejudices and yielded on the clamour of the moment."

বঙ্গানুবাদঃ "আমি যে স্বাধীনতার আদর্শ জনসমাজে প্রচার করিয়াছি তাহা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া যদি আমি অভিযুক্ত হইয়া থাকি তবে আমি মুক্তকণ্ঠে আমার অপরাধ স্বীকার করিতেছি। এই স্বাধীনতা-প্রচারই যদি এই দেশে আইনবিরুদ্ধপরিগণিত হয় তবে আমার দণ্ড হয় হোক, ক্ষোভ নাই। যে বিষয়টিতে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, যে কদর্য বিষয়ের কল্পনায়ও আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, যাহা আমার মানসিক গতি ও প্রকৃতি অনুসারে কখনই আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, আমার প্রতি সেই ভীষণ অপরাধ যেন কখনও আরোপিত না হয়। স্বাধীনতা-ধর্ম প্রচার যদি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, তবে আমি স্বীকার করিব যে আমিই অপরাধী, আমি কখনও তাহার প্রতিবাদ করিব না, কারণ এই আদর্শ প্রচারের জন্যই আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি। এই আদর্শের জন্যই জীবনধারণ করিতেছি এবং এই আদর্শের সিদ্ধিকল্পে আমি আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাই আমার জাগরণে একমাত্র ধ্যান, নিদ্রায় স্বপ্ন। যদি ইহাই অপরাধ হয়, আমার অপরাধ হইয়াছে—এই অভিযোগের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষী উপস্থাপনের আবশ্যকতা নাই। আমার শেষ নিবেদন এই যে, 'বন্দেমাতরম্' মামলার পুনরভিনয়ের প্রয়োজন কি? এই বিষয়টির উপরই মোকদ্দমার বিচার নিষ্পন্ন হউক। যদি স্বাধীনতা-প্রচারই অপরাধ হইয়া থাকে, তবে যে কোন দণ্ডের বিধান করিবেন তাহা আমি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিব। কিন্তু আজ আমাকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছে, যে সমস্ত গর্হিত কার্যের কথা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না, যাহা আমার অন্তঃপ্রকৃতির পক্ষে রীতিমত অসহ্য এবং যাহা আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, সেই সমস্ত

কার্য কেবল আমার প্রতি আরোপিত হয় নাই, পরন্তু তাহা প্রমাণের জন্য বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণসমূহ উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং যে যে প্রবন্ধ বিবেক নির্দেশের মর্মানুভূতির ফলে আমার জীবনের উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় রচিত সেইগুলিকেই আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ-স্বরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। আমি প্রাচ্য বেদান্ত বিদ্যার অমরবাণীর সহিত, প্রতীচ্য রাষ্ট্রদর্শনের সমন্বয় করিয়া তাহাই জীবনের সাধন-মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং আমি বুঝিয়াছি যে, সমস্ত জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার ভারতের নিজস্ব একটা সাধনা আছে আর আমার দেশবাসীকে এই বাণী হৃদয়ঙ্গম করানোই আমার বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি। যদি ইহাই আমার অপরাধ হয় তবে আমি শৃঙ্খলাবদ্ধই হই আর যে কোন দণ্ডভোগই হউক, আমি কখনও অপরাধ অস্বীকার করিব না। কিন্তু যাহা আমার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে সে প্রমাণ প্রমাণই নয় এবং আমি যাহা প্রচার করিয়াছি অথবা যে কথা আমি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এই প্রমাণও সম্পূর্ণ-রূপেই সেই আদর্শের সমর্থন করিতেছে।

"এখন আপনাদের সমক্ষে আমার নিবেদন এই, যে-অপরাধে এই ব্যক্তি অভিযুক্ত, মনে করিবেন না যে তিনি কেবল এই আপনাদের সম্মুখেই এই আদালতে অভিযুক্ত, মানব-ইতিহাসের সর্বোচ্চ ধর্মাধি-করণেও তাঁহার বিচারভার নির্দিষ্ট আছে। আপনাদের বিচার সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বাদবিসম্বাদ নীরব হইবার অনেক পরে, এই উদ্বেলতা ও সংক্ষুব্ধ আন্দোলন থামিবার অনেক পরে ও মহাকাল আসিয়া ইহার স্থূলদেহ ধ্বংস করিবার পরেও লোকে তাঁহাকে স্বদেশপ্রেমের কবিবর মহামানব প্রেমিক ও জাতীয়তা-উদ্বোধনের গুরুরূপে পূজা করিবে। তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তির পরে—বহু পরেও তাঁহার বাণী কেবল ভারতে নহে, সুদূর মহাসাগরের পরপারেও ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে। তাই আমি বলি কেবল এই আদালতেই তাঁহার বিচার হইতেছে না, স্বাধীনতা-ইতিহাসের উচ্চতম ধর্মাধিকরণেও একদিন

ইহার ন্যায্য বিচার করিবেই করিবে।

"এইবার আপনাদের বিচারকদের বিবেচনা করিবার ও (এসেসার-দ্বয়ের প্রতি) আপনাদের মতামত প্রদানের মুহূর্ত সমাগত। বিচারপতি, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের যে স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়টি ইংরেজ বিচারকগণের ন্যায়পরায়ণতায় অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহার দোহাই দিয়া, মহত্ত্বের শাশ্বত আদর্শের দিকে চাহিয়া ইংরাজের বিচারক সংসদ হইতে যে সমস্ত শত সহস্র পুঙ্খানুপুঙ্খ নীতিসূত্র সমুদ্ভূত হইয়াছে তাহাদের নামে, যে সমস্ত ইংরেজ বিচারক পণ্ডিতগণ অপরাধীর বিচারবিধানে ও ন্যায়ের ব্যবস্থাপনে দণ্ড নির্দেশ করিয়াই কেবল ক্ষান্ত থাকেন নাই, পরন্তু জনসাধারণের শ্রদ্ধাও অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের নামে নিবেদন করিতেছি, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক মহিমান্বিত কথা স্মরণ করাইয়া নিবেদন করিতেছি যে একথা যেন ভবিষ্যতে কেহ না বলিতে পারে যে এই বিচারের সময় একজন ইংরেজ বিচারক ন্যায়ের মর্যাদারক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। আর আপনাদের (এসেসারদ্বয়ের প্রতি) কাছেও আমার নিবেদন যে অরবিন্দ যে আদর্শ সমাজে প্রচার করি-য়াছে তাহার নামে, আমার মাতৃভূমির শিক্ষাদীক্ষা ও রীতিনীতির ধারার কথা স্মরণ করাইয়া আমি নিবেদন করিতেছি যে ভবিষ্যতে যেন এমন কোন সমালোচনায় আমাদের ইতিহাস কলঙ্কিত না হয় যে দুইজন স্বদেশবাসী ভ্রান্ত সংস্কার ও পক্ষপাতিত্বের প্রভাবে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া আপনাদের বিচারবুদ্ধির অবমাননা করিয়াছিল।"

অমৃতবাজার পত্রিকা লিখল, The defence of Babu Aurobindo Ghose by Mr. C. R. Das was a masterpiece of its kind and will no doubt find a place in History. (7th May, 1909) চিত্তরঞ্জন এই বক্তৃতা করতে গিয়ে অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন—আর সমস্ত আদালত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ছিল। জজ রায় দিলেন, অভিযুক্ত আসামী অরবিন্দ ঘোষ মুক্ত। কিন্তু বারীন আর উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম হলো—অরবিন্দ বিচলিত হয়ে

পড়লেন। তাঁর দু-নয়ন বেয়ে নামলো জলের ধারা।

সান্ত্বনা দিলেন চিত্তরঞ্জন, "আপনি ব্যাকুল হবেন না, আমি ফাঁসির হুকুম রদ করবো।"

চিত্তরঞ্জনের তখন ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার—কিন্তু আবার শুরু হলো সাধনার। হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার লরেন্স জেন্‌কিনস্ এবং বিচারপতি কর্নভার্কের আদালতে আপীল করলেন চিত্তরঞ্জন। ৪৮ দিন শুনানীর পর বারীন আর উল্লাসকরের ফাঁসির হুকুম তুলে নেওয়া হলো।

সকলকে মুক্ত করে বিজয়ীর হাসি আর জয়ীর চরম গৌরবকে বরণ করে আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন আইনজগতের সম্রাট চিত্তরঞ্জন—হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যারিস্টার C. R. Das। এ সময়কার আনন্দ-পূর্ণ স্মৃতির কথা অপর্ণা দেবী লিখেছেন তাঁর 'মানুষ চিত্তরঞ্জনে'।

"শ্রীঅরবিন্দের এবং অন্যান্য সহকর্মীদের মুক্তিলাভের পর আমাদের রসারোডের বাড়ীর আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। অরবিন্দ এবং তাঁর সহকর্মী বন্দীরা আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হলেন। বাবা তাঁদের সঙ্গে খেলেন। সেদিন রসারোডের এই দালানে বাঙালী হরিহর মূর্তি অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনকে প্রণাম জানালো।"

স্বদেশী মামলাসমূহ পরিচালনার মধ্য দিয়ে চিত্তরঞ্জনের কেবল সুতীক্ষ্ণ আইনজ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ই ফুটে ওঠেনি, এরই পথ বেয়ে আমরা পেয়েছি রাজনৈতিক জীবনের নেতা চিত্তরঞ্জনকে, দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জনকে। স্বদেশপ্রেম যে অন্তঃসলিলা ফল্গুস্রোতের মত তাঁর অন্তরের অতি গভীর স্তরে নিত্য প্রবহমান ছিল, তারই প্রমাণ এই নিঃস্বার্থভাবে মনপ্রাণ দিয়ে এই জটিল স্বদেশী মামলাসমূহ পরিচালনা করে দিয়ে গেলেন।

৪। ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলা (১৯১০ খ্রীঃ)

আলিপুর বোমার মামলার পর চিত্তরঞ্জনের পসার ছড়িয়ে পড়ল

সারা ভারতবর্ষে। মক্কেলরা মোটা টাকা নিয়ে তাঁর দুয়ারে ধরনা দিয়ে পড়ে রইল—যত টাকা লাগে লাগুক, ব্যারিস্টার দাসকে চাই-ই। এদিকে ঢাকা থেকে আহ্বান এলো, আবার স্বদেশসেবী যুবকদের মামলা গ্রহণ করবার জন্য ছুটে গেলেন তিনি ঢাকা।

ঢাকার যুবকেরা পুলিনবিহারী দাস নামক জনৈক যুবকের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন সমিতি গড়ে তোলে। যুবকদলের সংঘবদ্ধতাকেই ইংরেজ সরকার দেখতেন বিষনজরে—কারণ অপরাধী বিবেক তো, তাই বোধ হয় অমনি খচখচ করে উঠত—আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। পুলিস অনেকদিন ধরেই এই সমিতির ওপর নজর রাখল, তারপর রিপোর্ট দিল বঙ্গভঙ্গের পর এটি একটি গুপ্ত সমিতি, এর কাজ হলো অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা দেওয়া এবং ষড়যন্ত্র করা। অতএব পুলিন এবং তার সহকর্মী আশুতোষ, ললিতমোহন প্রভৃতি ৪৪ জন আসামী দায়রা-সোপর্দ হন।

চিত্তরঞ্জন এই মামলার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগলেন।

গভর্ণমেণ্ট পক্ষের ব্যারিস্টার ছিলেন মিঃ গার্থ। তিনি এই মোকাদ্দমা সম্পর্কে বললেন, "১৯০৫ সালে সরকার কর্তৃক পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীগণ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। এই অসন্তোষ অবলম্বন করিয়া কতকগুলি লোক গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ও বি. সি. মিত্র প্রভৃতির বক্তৃতা শুনিয়া পুলিন প্রভৃতি কতকগুলি লোক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি স্থাপন করিয়া দেশমধ্যে অসন্তোষ প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল।"

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই বক্তৃতার সঙ্গে জড়িয়ে ফেললে চিত্তরঞ্জনের অন্তর খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। যদিও দলগত কারণে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং সুরেন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের কঠোর সমালোচনা করেন, তবুও প্রথম জীবনে চিত্তরঞ্জন যে সুরেন্দ্রনাথের শিষ্য

ছিলেন একথাটা তিনি ভুলতে পারেন নি। তিনি বললেন—

"Why such a name which is known throughout the country, why such a name which is honoured by everybody, why the name of this man who is the idol of the people of the country be dragged into this trial of this description,"

"সমগ্র দেশবাসীর নিকট যে নাম অতি সুপরিচিত, যে নামকে প্রত্যেক দেশবাসী পরম শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করে এবং যিনি দেশ-বাসীর আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি, তেমন একটি নামকে কেন এই মামলার সঙ্গে যুক্ত করা হলো?"

তারপর এই মামলার আসামীদের পক্ষ সমর্থন করে বললেন—এই সমিতির সঙ্গে রাজদ্রোহের কোনই সম্পর্ক নাই। বঙ্কিমের অনু-শীলন-তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়াই পুলিন অনুশীলন সমিতি গঠন করিয়াছে। বঙ্কিমের যে বাণী পুস্তকে আবদ্ধ ছিল পুলিন তাহাকেই রূপদান করিয়াছে। দৈহিক শক্তি অর্জন ও বিদ্যার্জন, মস্তিষ্কচালনা, ধর্মাচরণ প্রভৃতি সর্বাঙ্গীন বৃত্তির অনুশীলনই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই সকল বৃত্তির অনুশীলনে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়—পরিণামে এইরূপ সর্বগুণযুক্ত ব্যক্তি সর্বসুখের অধিকারী হয়। পুলিন তো তাহাই করিতে চাহিয়াছিল এবং আত্মরক্ষার জন্যই এই সমিতির সৃষ্টি। ইহা যদি অপরাধ হয় তো পুলিন সেই অপরাধে অপরাধী।

জামালপুরে যখন বাসন্তীমূর্তি চূর্ণ হয় এবং কুমিল্লায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় হিন্দুর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, তখন এইরূপ সমিতি গঠনের আবশ্যকতা অপরিহার্য হইয়া উঠে। জ্ঞান বিকাশ প্রভৃতি সমিতি এই সমিতির শাখা নয় এবং গুপ্ত ষড়যন্ত্র বা ডাকাতি প্রভৃতির উদ্দেশ্য নিয়েও এই সমিতির সৃষ্টি নয়। তাছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের কতিপয় আততায়ীর অত্যাচারের ফলেই লাঠিখেলা প্রভৃতি এই সমিতিতে শেখানো হয়।

তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লোকরহস্য, কৃষ্ণচরিত্র, কমলাকান্ত প্রভৃতি

অবলম্বন করে এই সমিতির কার্যকলাপ সম্পর্কে এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করলেন যে সমস্ত আদালত বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ল।

২২শে মে থেকে ১৬ জুন একনাগাড়ে মামলা চলল এবং চিত্তরঞ্জনের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার ফলস্বরূপ ৪৪জন আসামীর মধ্যে ৮জন মুক্তিলাভ করলো এবং বাকী ৩৬জনের শাস্তি হলো। এখানেই থামলেন না চিত্তরঞ্জন—এই দণ্ডাদেশ রদ করার জন্য হাইকোর্টের বিচারপতি জাস্টিস্ হ্যারিংটন ও জাস্টিস্ মুখার্জীর এজলাসে বিচার প্রার্থনা করলেন।

চিত্তরঞ্জনের সুগভীর আইনজ্ঞান ও অদ্ভুত বিচারবিশ্লেষণ এখানেও জয়ী হলো—৪৪ জনের মধ্যে ২১ জন মুক্তিলাভ করলো, অবশিষ্টদের দণ্ডের লাঘব করা হ'লো। শুধু একজন আসামী উন্মাদগ্রস্ত হওয়ার জন্য আপীল করতে পারেনি।

কর্মজীবনে সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ আবার একটি জয়পতাকা প্রোথিত করে ফিরে এলেন তিনি ঢাকা থেকে। এখানে বলে রাখি, পরলোকগত ত্রৈলোক্য মহারাজ ছিলেন এ মামলার অন্যতম আসামী।

৫। ডুমরাওনের মামলা (১৯১০ খ্রীঃ)

ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলা থেকে ফিরে এসেই তিনি পেলেন ডুমরাওনের মামলা। এবার তাঁর জীবনে সুযোগ এলো দেওয়ানী মামলায় আপন কৃতিত্ব দেখাবার। আর এই দেওয়ানী মামলাগুলিকে কেন্দ্র করে সুবর্ণস্রোতের বন্যায় ভেসে গেল তাঁর জীবন—বিলাসিতা ও ভোগ-ঐশ্বর্যের জীবন তাঁকে আলিঙ্গন জানালো। কিন্তু আত্মহারা হলেন না তিনি, এই সুবর্ণস্রোতের ঢেউকে ছাপিয়ে ভেসে উঠল প্রাণপদ্ম! মাসিক দশ হাজার টাকা এবং মামলায় জয়লাভ করলে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হবেন, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডুমরাওনের রাজগদির উত্তরাধিকারী কেশোপ্রসাদ সিং নিযুক্ত করলেন চিত্তরঞ্জনকে। তিনি বলতেন—"দাসসাহেব, গদি

মিলনেসে আপকা লিয়ে ম্যা জান দে দুঙ্গা।” ভাবখানা এই যে, একবার গদিটি পেলে তিনি চিত্তরঞ্জনকে রাজা করে দেবেন—বাড়ী, গাড়ী, মেয়েদের বিয়ে, ছেলের শিক্ষা কোন ব্যাপারেই তাঁকে আর ভাবতে হবে না। কেশোপ্রসাদের এই কথা শুনে চিত্তরঞ্জন হাসতে হাসতে জবাব দিতেন, “যখন সত্যি মহারাজা হবে তখন তোমার এসব কথা মনে থাকবে তো?” সত্যিই মনে থাকেনি—তিনি চিত্তরঞ্জনকে মাসিক দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তির কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। তবে আপীলের সময় এবং অন্য মোকদ্দমায় চিত্তরঞ্জনকে নিযুক্ত করতেন।

(এবার মামলার বিষয়টি)—কেশোপ্রসাদ সিং ডুমরাওনের রাজ-তক্ত (রাজগড়) দাবি করে এই মামলা রুজু করেন। কেশোপ্রসাদের পক্ষে ব্যারিস্টার ছিলেন মিঃ গার্থ এবং আলি ইমাম হোসেন সাহেব।

বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও চিত্তরঞ্জনের প্রতিভা জয়যুক্ত হলো—কেশোপ্রসাদ সিং—ডুমরাওনের মহারাজা বলে স্বীকৃত হলেন। এই মামলার জন্য চিত্তরঞ্জনকে সুদীর্ঘকাল আরাতে থাকতে হয়েছিল।

৬। ডুমরাওনের মামলা ২য় দফা (১৯১১ খ্রীঃ)

এই মোকদ্দমা রুজু করেন রেওয়ার রানী (ডুমরাওনের ভূতপূর্ব মহারাজা রাধাপ্রসাদ সিং-এর ২য় কন্যা বাউজুই)। তাঁর দাবি যে রাজগড়-তক্তের প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী তিনিই। মহারানী দৈনিক ১৫০০ টাকা ফি দিয়ে চিত্তরঞ্জনকে নিযুক্ত করলেন, অপরপক্ষে ছিলেন স্যার এস, পি, সিংহ এবং বি, সি, মিত্র। পরিশেষে আপোসে মোকদ্দমাটি মিটমাট হয়ে যায়—রেওয়ার রানী বার্ষিক ৪৮০০০ হাজার টাকার সম্পত্তি লাভ করেন, রাজগড়ের তক্তের ওপর আপন শর্ত পরি-ত্যাগ করলেন।

৭। লছমীপুর মামলা (১৯১৫ খ্রীঃ)

১৯১৬ খ্রীঃ লছমীপুরের রানী কুসুমকুমারী তাঁর পক্ষ অবলম্বন করবার জন্য চিত্তরঞ্জনকে ব্যারিস্টার নিযুক্ত করেন। সুদীর্ঘদিন ধরে এই মামলা চলে, ফলে অনেকদিন তাঁকে সপরিবারে ভাগলপুরে দীপ-নারায়ণ সিংহের বাড়ীতে থাকতে হয়েছিল। এখানেও উত্তরাধিকারিণীর স্বত্ব নিয়ে জয়ী হলেন চিত্তরঞ্জনের পক্ষে কুসুমকুমারী। এই মামলার বিরোধী পক্ষে ছিলেন চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা পি, আর, দাস এবং এস, পি, সিংহ।

এই মোকদ্দমা চলাকালে একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে চিত্তরঞ্জনের কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় লাভ করা যায়। সুদীর্ঘ দেড় মাস ধরে একটানা বক্তৃতা চলে। বক্তৃতাটি শেষ হবার কথা কোন এক বুধবারে—চিত্তরঞ্জন ভাবলেন কোনরকমে বক্তৃতাটি বৃহস্পতিবার দুপুরের আগে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারলে বাদীপক্ষকে বাধ্য হয়েই বৃহস্পতিবার বারবেলায় বক্তৃতা আরম্ভ করতে হবে। কে বলতে পারে সেই অশুভক্ষণের ছোঁয়াচ পেয়ে যদি দৈব প্রতিকূল হয়ে ওঠে। মাথায় এই কৌতুকপূর্ণ যুক্তিকে কাজেও পরিণত করলেন তিনি, বক্তৃতাটি টেনে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ঠিক বারবেলার পূর্বাহ্ণে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর এই অভিসন্ধি যেন বুঝতে পার-লেন এস. পি. সিংহ। তিনি বললেন, "বৃহস্পতিবারের বারবেলায় আমি কিছুতেই বক্তৃতা আরম্ভ করবো না।" আদালতে একটা উচ্চ-হাসির রব উঠল। এস, পি সিংহ বললেন, "আমার বন্ধু যদি বৃহস্পতি-বার বারবেলায় তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেন কোন আপত্তি ছিল না; কিন্তু একেবারে বারবেলার কিনারায় এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তিনি যদি আমায় বারবেলার নিষিদ্ধ সলিলে ঠেলে ফেলতে চান তবে নিশ্চয় আপত্তি করবো!" বিচারককে বাধ্য হয়েই সেদিনের মত মামলা মুলতুবী রাখতে হলো।

গঙ্গার ধারে অতি প্রাকৃতিক মনোরম শোভায় ছিল দীপনারায়-

ণের বাড়ীটি। সারাদিন মামলার কাজকর্মে ডুবে থাকতেন, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে চলত সংগীত ও সাহিত্যচর্চার অসর। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, সূক্ষ্ম আইনজীবনের তত্ত্বের সঙ্গে জীবনের এই শিল্পের দিকটি তথা সৌন্দর্যের দিকটি তিনি ভোলেন নি, তাই আইন-জীবনের সঙ্গেই জড়িয়ে গেছেন কবি চিত্তরঞ্জন। Keats-এর কথায় —"Truth is beauty, beauty is truth" চরম সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল মানুষ চিত্তরঞ্জনের জীবনে। এখানে থাকাকালীন সাহিত্যিক আসরে উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। সাহিত্যের আসরে প্রতিদিন উপস্থিত থাকতেন উপেনবাবু, তাঁর গান শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। "ধিনৃতা ধিনা পাকা নোনা" এবং "মনের বাসনা শ্যামা" এ গান দুটি তিনি উপেনবাবুর মুখে শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন। এ সময় তিনি নিজেও কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন এবং উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী তাতে সুর সংযোজনা করেন। এই সময়কার রচিত দুটি গান নীচে দেওয়া হলো ঃ—

গান

(১)

দাও দাও প্রাণের নিধি—
প্রাণের প্রাণে বেঁধে দাও,
(আমার) সকল অঙ্গ কেঁদে মরে
চোখের কাছে এনে দাও।
(আবার) ভুলতে গেলে তোমার কথা
বুকের মাঝে বিহরে।
আমি ভাবতে নারি ভুলতে নারি
তোমার কাছে ডেকে নাও।
বুকের ধন বুকের মঝে
বুকের 'পরে বেঁধে দাও।

(২)

মিটাও না এই তিয়াসা

এই তো আমার মিষ্টি লাগে।

ওগো বিরহী! চিরবিরহী

এই তৃষা যেন নিত্য জাগে।

মিলন আমি চাই না যে হে

এই তিয়াসা যেন থাকে

চোখের জলে এত মধু

প্রাণবঁধু হে প্রাণবঁধু

মুছায়ো না চোখের বারি।

নাই বা এলে আঁখির আগে

নাই বা হোল মিলন যদি

এই বিরহ নিত্য জাগে।

[অপর্ণা দেবী সম্পাদিত 'কবিচিত্ত' থেকে]

এ দুটি সংগীত রচনা করেন চিত্তরঞ্জন এবং সুর দেন উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। এখানে থাকাকালীন এত কাজের মধ্যেও 'লতা' নামে একটি গল্প লিখতে আরম্ভ করেন তিনি। কিন্তু কাজের চাপের ফলেই হয়তো তা আর শেষ করা হয়ে ওঠেনি।

সে-বছর পুজোর ছুটিতেই সপরিবারে হিমালয়ের কোল ঘেঁসা অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী শোভিত মায়াবতীতে বেড়াতে গেলেন চিত্তরঞ্জন। প্রাকৃতিক আকর্ষণ ছাড়াও আর-একটি কারণে মায়াবতীর প্রতি চিত্তরঞ্জনের সুনিবিড় আকর্ষণ ছিল—পরাধীন জাতিকে যিনি প্রথম মানুষ হবার মহামন্ত্রে জাগিয়েছিলেন, সেই স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত এই পবিত্র তীর্থ মায়াবতী।

এই মায়াবতীর পথে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গী হয়েছিলেন উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। এই সময়কার একটি ছোট্ট ঘটনার ভেতর দিয়ে উপেনবাবু

কৌতুকপ্রিয় চিত্তরঞ্জনের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'মায়াবতীর পথে' নামক গ্রন্থে।

"ট্রেন পৌঁছিবার তখনো ৩।৪ মিনিট বাকী। দেখিলাম, আমি ছাড়া আর সকলেই সময়মতো আসিয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন। চিত্ত-রঞ্জন বাসন্তী দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "উপেনবাবুর ঘড়ি যে কয়েক মিনিট ফাস্ট চলছে, তা নিশ্চয়ই উপেনবাবুর জানা ছিল না।"

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন বলুন দেখি!'

"তিনি উত্তর দিলেন, 'তা জানা থাকলে নিশ্চয় আর কয়েক মিনিট বিলম্ব করে স্টেশনে পৌঁছতেন।'

"সমবেত কণ্ঠের উচ্চহাস্যে প্লাটফর্ম মুখরিত হইয়া উঠিল। যুক্ত-হাস্যরসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক শোনা গেল চিত্তরঞ্জনের হাসি।

"আমার ঘড়ির সহিত মিলাইয়া দেখা গেল যে, আমার ঘড়ি বরং এক আধ মিনিট স্লো চলিতেছে, কিন্তু ফাস্ট এক মুহূর্তও নহে। বিজয়-গর্বে গম্ভীর হইয়া বলিলাম, 'এবার তাহলে কি বলবেন?'

হাস্য মুখে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, 'আপনার নিশ্চয় ধারণা ছিল এক-আধ মিনিট নয়, আপনার ঘড়ি দশ-বারো মিনিট স্লো চলছে!' পুনরায় হাস্যধ্বনি উঠিল; এবার চিত্তরঞ্জন আরও জোরে হাসিতে লাগিলেন।"

মায়াবতীতে এসে কুলীদের তিনি এমন ভাবে বকসিস করতেন যে, তারা তাঁকে বলতো বঙ্গলকা রাজাবাবু।

এখানকার অদ্বৈত আশ্রমের মহারাজ স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গে প্রায়ই নানা বিষয় নিয়ে তাঁর আলাপ-আলোচনা চলতো। মাঝে মাঝে উঠে পড়তো অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কথা—তাদের স্বদেশ প্রেমের কথা স্মরণ করে চিত্তরঞ্জনের চোখের পাতা ভিজে উঠতো। বলতেন, "পথ তাদের যাই হোক কিন্তু তাদের অন্তরের একনিষ্ঠ জ্বলন্ত দেশপ্রেমকে এবং আত্মত্যাগকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি।"

হয়ত নিজের অন্তরের কোণ এক গোপন গভীর সুরের সঙ্গে এদের

এই বাঁধনহারা প্রাণের উন্মাদনার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন।

৮। মহেশপুর মামলা:—সাঁওতাল পরগণার দুমকা জেলার অন্তর্গত এই মহেশপুর স্টেট—মহেশপুরের কুমারের সঙ্গে ভাগলপুরের রাজা সূর্যনারায়ণ সিংহের সঙ্গে মর্টগেজ ও রিডেম্পসনের জন্য এই মোকদ্দমা রুজু করা হয়। চিত্তরঞ্জনকে এই মামলায় ব্যারিস্টার দেওয়া হয়—তাঁর সুতীক্ষ্ণ আইনজ্ঞান এবং অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে মোকদ্দমা মিটমাট হয়ে যায়। কিস্তিবন্দীতে টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হওয়ায় স্টেটটি রক্ষা পায়।

৯। রাজা মতিচাঁদ স্টেটের মামলা (১৯১৬):—এই মামলায় নিযুক্ত হয়ে চিত্তরঞ্জন মামলা পরিচালনার জন্য বারাণসীতে এসে কিছু-দিন ছিলেন। এই মামলার একটি স্মরণীয় ঘটনা যে, এর একপক্ষে ছিলেন চিত্তরঞ্জন আর অপরপক্ষে ছিলেন তাঁরই অন্যতম সুহৃদ মতিলাল নেহরু। মামলাটি পরে আপোষে নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

১০। ডুমরাওনের মামলা, তৃতীয় দফা (১৯১৭-১৯২০):—এই মামলা রুজু করা হয় কেশোপ্রসাদ ও রাধাপ্রসাদ সিং-এর ভূতপূর্ব দেওয়ান হরিহর প্রসাদের সঙ্গে। কেশোপ্রসাদ এই মামলায় প্রথমে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে নিযুক্ত করেন, কিন্তু পরে তিনি মাদ্রাজ চলে গেলে তিনি মাসিক ৪৫০০০ টাকা ফী দিয়ে চিত্তরঞ্জনকে নিযুক্ত করেন। দীর্ঘদিন ধরে এই মামলা চলে এবং ১৯২০ সালে চিত্তরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে আইন ব্যবসা ত্যাগ করলে শেষ পর্যন্ত এই মামলা পরিচালনা করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

১১। অমৃতবাজর পত্রিকা মামলা (১৯১৮):—১৯১৬ সালে ভবানাপুরের বাসিন্দা চন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ভূ-সম্পত্তির বিষয় নিয়ে মামলা হয়। ট্রাষ্ট চন্দ্রনাথ ঘোষের কোনও সম্পত্তি দখল করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং মির কামিং আপীল সাব্যস্ত করেন যে, কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করার অধিকার ট্রাষ্টের নেই। অপরপক্ষে জাস্টিস্ গ্রাভ্স্ রায় দেন যে, এই

ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখলের ক্ষমতা ট্রাষ্টের আছে।

১৯১৮ সালে এর প্রতিবাদ স্বরূপ অমৃতবাজার পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ লেখা হয় এবং বলা হয়, 'কোন দেশীয় জজ যার জমিজমা আছে এমন লোককেই নেওয়া উচিত ছিল।' পত্রিকার এই মন্তব্যকে আদালত অবমাননাকর মনে করেন এবং সেইজন্য অমৃতবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়।

পত্রিকার পক্ষে নিযুক্ত হন চিত্তরঞ্জন। একে একে সবাই বক্তৃতা করলেন কিন্তু বিশেষ কোন ফল হল না। পরিশেষে উঠে দাঁড়ালেন চিত্তরঞ্জন, বললেন, "আমার মতে যে দেশীয় জজের জমিজমা আছে তাহাকে এই আপীল শুনানীর জজ না করাই যুক্তিযুক্ত। এইরূপ প্রবন্ধ অসঙ্গত সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার সঙ্গে আদালতের অবমাননার প্রশ্ন জড়িত নাই।" এরপর চিত্তরঞ্জন দেওয়ানী ও ফৌজদারী দায়িত্ব সম্পর্কে বহু ইংরেজী আইন মন্থন করে বক্তৃতা করলেন। পরিশেষে সব জজেরাই চিত্তরঞ্জনের মতে মত দিলেন এবং পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টার মুক্তি লাভ করলেন। এই মামলায় চিত্তরঞ্জন যে ভাবে সব জজদের নিজের মতে এনেছিলেন, আদালতের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয় ঘটনা।

১২। ট্রাঙ্ক খুন মামলা (১৯১৯) ঃ—ট্রাঙ্কের মধ্যে মৃতদেহ নিয়ে মামলাটির সূচনা।

১৯১৬ সালের ১০ই অগাষ্ট দেবব্রত ব্রহ্মচারী নামে এক ব্যক্তিকে গোয়েন্দা সন্দেহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ গলা টিপে হত্যা করে ঃ— যতীন্দ্র হালদার, বিজয়কৃষ্ণ পাল, নন্দলাল বিশ্বাস, পঞ্চানন সরকার। হত্যাকাণ্ডের পর মৃতদেহের গলায় একখণ্ড দড়ি দিয়ে বেঁধে তারপর তা ট্রাঙ্কে পুরে আসামীগণ হাওড়া স্টেশনে এক গাড়ীর কামরায় তুলে দিয়ে পালিয়ে যায়।

ব্যাণ্ডেল স্টেশনের কাছে গন্ধের জন্য লোকে টের পায়—সেখানেই সনাক্ত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু কোন খোঁজ খবর না পাওয়ায় পুলিশ

কোন চার্জশীট পাঠায়নি।

সেই সময়ে Defence of India Act-এর ফলে আসামীগণ অন্তরীণে আবদ্ধ হয়। এই মামলার অন্যতম সাক্ষী বিজয় কৃষ্ণ পাল পালিয়ে চলে যায় মেসোপটেমিয়ায় এবং তার সেখানকার স্বীকারোক্তির ফলেই উপরোক্ত ব্যক্তিগণ এই মামলার আসামীরূপে অভিযুক্ত হন।

অপরাধীদের বাঁচাবার ভার পড়ল চিত্তরঞ্জনের ওপর। এরা গুরুতর অপরাধী সন্দেহ নেই—কিন্তু তিনি যখন এদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন, তখন তো এদের বাঁচানোই তাঁর কর্তব্য।

চিত্তরঞ্জন বললেন, "এই আসামীদের Defence of India Act অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া ১৩ নং ইলিসিয়াম রোডে চালান করা হইয়াছিল, যেখানে তাহাদের কোন আত্মীয় বা বন্ধুর মুখদর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই। তারপর কেবল প্রলোভন—স্বীকার কর। তাহারা স্বীকার করাই প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় মনে করিয়া তোতার মত সব শিখানো কথা বলিয়াছে। এখন এ প্রমাণ করিতে সাক্ষীস্বরূপ আমি আমি কাহাকে ডাকিব ?

"তাহা ছাড়া সমস্ত স্বীকারোক্তিই বিবেচনার অযোগ্য। কেন না, কোন মোকদ্দমাই প্রথম এত্তেলা না দেওয়া পর্যন্ত তদন্ত হইতে পারে না। ১৪ই সেপ্টেম্বরের স্বীকারোক্তিতে যখন দেখা গেল যে দেবব্রতের মৃত্যু হইয়াছে গলা টিপিয়া নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করার জন্য—১৫ই সেপ্টেম্বরের ডাক্তারের সার্টিফিকেটে রহিয়াছে যে তাহাকে গলায় দড়ি জড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে। ১৯শে তারিখে পুলিশ এই দুইটির সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছে যে, তাহার গলা টিপিবার পর মরিয়া গিয়াছে কিনা বলিতে পারে না, তাই পরে একটা দড়ি জড়াইয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পুলিশের কথামত বলাতেই স্বীকারোক্তির কথার সহিত আসামীর কথায় সামঞ্জস্য হয় নাই।"

তাঁর এই সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনার পর কারুর আর প্রতিবাদ করবার কিছু রইল না এবং আসামীগণ মুক্তিলাভ করলো।

১৩। কুতুবদিয়া মামলা (১৯১৯):—এ মামলাটিও স্বদেশী মামলার অন্তর্গত। এ মামলায় তো তিনি ফী গ্রহণ করেনইনি। উপরন্তু নিজের অনেক টাকা খরচ করেছিলেন। এই মামলায় তিনি চট্টগ্রাম যাবার আগে মক্কেলরা তাঁর পেছনে টাকার থলি নিয়ে ছুটল—তাদের কাতর অনুনয়, "দাশ সাহেব, আপনি যাবেন না।"

কিন্তু দাশ সাহেবের স্পষ্ট জবাব, "আপনাদের কাজ আমি না করলেও টাকা দিয়ে আপনারা অন্য ব্যারিস্টার পাবেন, কিন্তু আমি ছাড়া যে এদের কেউ নেই।"

সুতরাং সব অনুরোধ অগ্রাহ্য করে টাকার থলিকে উপেক্ষা করে তিনি এলেন চট্টগ্রাম। এর থেকেই প্রমাণ হয়, টাকা প্রচুর রোজগার করলেও অর্থের প্রতি তাঁর কোন আসক্তি ছিল না। আর তাই যদি থাকত, তবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমরা পেতাম না।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এখানকার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তারা Defence of India Act অনুসারে ধৃত হয়ে চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটকে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাবার জন্য তারা কুতুবদিয়া থেকে চলে এসেছে চট্টগ্রামে! সাক্ষ্য প্রমাণ ও আসামীদের জবান থেকে উদ্ধৃত করে চিত্তরঞ্জন আসামীদের প্রতি পুলিশ কর্মচারীদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, "আসামীদের স্বীকারোক্তি বাহির করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে। কুতুবদিয়ায় তাহারা সুপেয় জল পায় নাই, যথাসময়ে মাসিক খোরাকীর টাকা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা পুস্তকপাঠে বঞ্চিত হইয়াছে, থাকিবার স্থানের অভাব হইয়াছিল—এই সমস্ত কারণেই নিয়মিত প্রহরীর সঙ্গে চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ জানাইতে আসিয়া তাহারা কি অপরাধ করিয়াছে? তাহাদের উদ্দেশ্যও খারাপ নয় এবং তাহাদের অভিপ্রায়ও পলায়ন নয়।"

ট্রিবিউনালে চিত্তরঞ্জনের এই সমস্ত সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা সত্ত্বেও ১৭জন

আসামীদের দুই মাস করে কারাদণ্ড হয়েছিল। এতো পরিশ্রম করেও তিনি এদের শাস্তি রদ করতে পারলেন না। মনটা বেদনাতুর হয়ে উঠল।

অশ্রুসজল নয়নে আসামীদের সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন—অনেকক্ষণ মুখে কথা জোগাল না—হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে এক গোছা টাকা বের করে আসামীদের হাতে দিয়ে বললেন, "টাকাটা রাখ, মিষ্টি খেও তোমরা।"

তারপর চোখের জল মুছে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

চিত্তরঞ্জনের জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—চট্টগ্রামে থাকাকালীনই তিনি 'The Great Transformation' (বিরাট পরিবর্তন) এই বক্তৃতার দ্বারা সুরেন্দ্রনাথের কাজের প্রতিবাদ করে-ছিলেন। মডারেট দলের গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যাঁর রাজনীতি ছিল পাশ্চাত্য ঘেঁষা।

সুভাষচন্দ্র তাঁর 'ভারত-পথিকে' বলেছেন, "সুরেন্দ্রনাথ বন্দো-পাধ্যায় যে জীবনান্তে সরকারী উপাধির মুকুট পরিয়া মন্ত্রীত্বের গদীতে আসীন হইতেছেন তাহার কারণ তিনি এডমণ্ড বার্ক বর্ণিত সুবিধা-বাদের দর্শনে বিশ্বাসী।"

সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিই সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট। মডারেটদের আপোষনীতির লগ্ন বিগত—তাই বাংলার রাজনীতির গগন হতে একদা একচ্ছত্র নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যা-য়ের প্রতিভা ম্লান হয়ে গেল—অহিংস অসহযোগের একনিষ্ঠ পূজারী চিত্তরঞ্জনের অম্লান জ্যোতির কাছে। ঘুমন্ত জাতীয় জীবন নতুন করে জেগে উঠল এই একটি মানুষকে ঘিরে।

যাক্, যা বলছিলাম—আইনজীবী চিত্তরঞ্জনের যশ ও প্রতিভার রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতবর্ষে। ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশ আইনজীবী মঞ্চে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। ডাক পড়লো ভারত সরকারের

কাছ থেকে। মিউনিসন বোর্ডের মামলা করতে হবে। ফী কয়েক লক্ষ টাকা।

যুদ্ধের সময় অনেকেই সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল। তাদের অনেকেই সরকারকে টাকা ফাঁকি দেয়। এদের বিরুদ্ধে সরকার নালিশ জারী করেন। শ্রীযুক্ত শুকলাল কারনানী এবং আরও অনেক ইউরোপীয়ান এই মামলায় যুক্ত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন বললেন, তাঁর বিবেকের নির্দেশমতো কাজ পরিচালনা করবার সুবিধে পেলে তিনি একাজ গ্রহণ করবেন। মামলার কাগজপত্রও দেখাশুনা করছিলেন—কিন্তু নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করার পর এ মামলা গ্রহণ করা শেষ পর্যন্ত আর তাঁর হয়ে ওঠেনি।

মাসিক ৬০।৬৫ হাজার টাকা আয়—সম্রাটের মত ঐশ্বর্যপূর্ণ সমারোহময় জীবন—ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশের জীবনে দীপাবলী রাতের হাজার বাতির প্রতিশ্রুতি নিয়ে জ্বলে উঠেছিল—ভুলে গিয়েছিলেন আইনজীবী জীবনের সূচনা অধ্যায়ের অন্ধকার অমাবস্যা রাত্রির দুঃস্বপ্ন—কিন্তু না! জীবনের ব্রত তো সাঙ্গ হয়নি! অন্তরের নিভৃতে বসে কাঁদেন ভারতমাতা! শৃঙ্খলের যে বড় বেদনা! আর মা'কে সেই বেদনা থেকে মুক্তি দিতে না পারলে সন্তানের জীবনের সার্থকতা কোথায়?

তাই বৃহতের আহ্বানে, মানুষ চিত্তরঞ্জন ব্যক্তিগত জীবনে সুখ দুঃখ নিয়ে সরে দাঁড়ালেন—এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিলেন জীবননাট্যে দীপাবলী রাতের হাজার বাতির সমারোহ। শুধু অম্লান শিখা নিয়ে জীবনের অন্তিম প্রহর পর্যন্ত জ্বালিয়ে রাখলেন একটি প্রদীপ—যে, প্রদীপ বাইরের আলো নিয়ে জ্বলেনি—জ্বলে উঠেছিল প্রাণবহ্নির অন্তর-নিঙরানো প্রেম নিয়ে! বৈষ্ণবের শুদ্ধা ভক্তির মত এ প্রেম নিঃশেষে নিবেদন করে গেছেন দেশমাতৃকার পায়ে।

ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশের জীবনের গতিপথ প্রবাহিত হলো নতুন পথে—অজানা ভবিষ্যৎ, ঝঞ্ঝারজনীর উত্তাল সাগর ক্রন্দন—সব কিছুকে

অতিক্রম করে সাগর সংগীতের কবি চিত্তরঞ্জন সুরু করলেন তরী বাইতে। সে-সব কথা পরের অধ্যায়ে বলবো।

সাধারণতঃ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে যে, বিফলতা যাঁর জীবনকে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল, কেমন করে তিনি এমন প্রখ্যাত হয়ে উঠলেন? কি সেই সাফল্যের চাবিকাঠি? প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক।

সুভাষচন্দ্র বলেছেন, 'অধ্যবসায় এবং পরিশীলিত আচরণের দ্বারাই মানুষ জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে।'

বিফলতা ঘিরে ফেললেও, চিত্তরঞ্জনের জীবনে চলেছিল অধ্যবসায়ের দুরূহ সাধনা। দিবারাত্র বিশ্বের আইনের জ্ঞানভাণ্ডারে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েছেন পৃথিবীর সব দেশের আইন। শুধুমাত্র নজীর দেখেই তিনি বলে দিতে পারতেন বিচারের ন্যায্যতা সম্পর্কে হাকিমের কোথায় ভুল হয়েছে। এই জন্যই স্যার রাসবিহারী ঘোষ বলেছিলেন, "হাইকোর্টে আজকাল আইনজ্ঞ দুইজন ব্যবহারজীবী আছেন;—একজন চিত্তরঞ্জন, অপরজন এস্, পি, সিংহ। ইঁহারা নজীর মুখস্থ করেন না, কিন্তু আইনের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন।"

যে-কোন একটি মোকদ্দমা গ্রহণ করবার পর তার বিষয়বস্তুর মধ্যে তিনি একেবারে নিমগ্ন হয়ে যেতেন। পৃথিবীর অন্য কোন কথা চিন্তা করা তো দূরের কথা স্নান খাওয়ার কথাও তিনি ভুলে যেতেন সময় সময়। সেই বিষয়বস্তুই হয়ে উঠতো তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান এবং চিন্তা। এমনি করে জ্ঞানের সাধনা নিয়ে সাগরে ডুব দিলে মুক্তা তো মিলবেই। মামলার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করার পর এমন সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সাহায্যে সাক্ষীকে জেরা করতেন যে, বেচারা আর পালাবার পথ পেতো না।

সওয়াল করার সময় মনে হতো, প্রত্যেকটি কথায় রয়েছে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, ন্যায় ও অকাট্য যুক্তির ক্ষুরধার, জ্ঞানপূর্ণ বাক্‌বিন্যাস।

অপূর্ব কণ্ঠস্বর এবং অদ্ভুত বাগ্মিতায় বিচারকমাত্রেই মুগ্ধ হয়ে যেতেন, হয়ে যেতেন স্তম্ভিত! বাঙালী মনীষার কাছে পরাভব স্বীকার করতেন নামী ও দামী ইংরেজ বিচারকমণ্ডলী।

সুভাষচন্দ্রের কথায় এইবার বলবো তাঁর পরিশীলিত আচরণের কথা। ব্যবহার তাঁর বরাবরই খুব ভাল ছিল, সর্বোপরি ছিল একটি দরদী হৃদয় এবং কর্তব্যপরায়ণতা।

মামলা নেবার পর অনেক সময় দেখেছেন যে, সময়ের অভাব। তখন ফী-সহ মক্কেলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন মামলা। আবার গরীব দুঃখী লোকের মামলা বিনা ফী-তে করে দিয়েছেন, এমন নজীরও আছে।

এ সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না (শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেবরায়ঃ বসুমতী পত্রিকা হইতে) ঃ—

"দ্বাদশ বৎসর পূর্বে আমার কোন আত্মীয়ের মোকদ্দমায় তাঁহাকে নিযুক্ত করি—তখন তাঁহার খুব পসার। আমার নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠে এবং পারিশ্রমিক ফী দিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, 'এখন থাক্, ব্রীফ রাখিয়া যান। কল্য হাই-কোর্টে মামলা উঠিলে আমাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবেন।' ডাকিতে গিয়া দেখিলাম, আমার ব্রীফে নোট লিখিতেছেন। অন্যান্য ঘরে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে লোক ডাকাডাকি করিতেছে। তিনি কেবল সময় লইতে বলিতেছেন। তারপর এমন সুন্দরভাবে জজদের কেসটি বুঝাইয়া দিলেন যে, প্রতিপক্ষের কোন যুক্তিতর্কই তাহাতে টিঁকিল না। তিনি জয়যুক্ত হইলেন। খরচের কথা উঠিলে তিনি জজদের জানাইলেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেসটি লইয়াছিলেন। কাউন্সিলের ফী হিসাবে তিনি এক কপর্দকও লইবেন না।"

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সুগভীর আত্মমর্যাদা,—আত্মসম্মানের সামান্য ত্রুটি হলেও প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করেননি তিনি।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করে এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানবো।

চিত্তরঞ্জন তখন নতুন আইনজীবী—একটি কেস্ নিয়ে নোয়াখালিতে গেছেন। সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট কারগিল ছিলেন সে-মামলার অন্যতম সাক্ষী। আদালতের নিয়ম অনুসারে সাক্ষীকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারকের পাশের চেয়ারে বসে ছিলেন—ভদ্রতার খাতিরে চিত্তরঞ্জন আপত্তি করেননি।

জেরায় জেরায় তিনি অস্থির করে তুললেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে। ইংরেজ রক্ত হয়ে গেল গরম—তিনি চিত্তরঞ্জনকে 'বাবু' বলে সম্বোধন করলেন। আদালতে এই সম্বোধনটা অসম্মানজনক।

জ্বলে উঠলেন চিত্তরঞ্জন। সাক্ষীকে এবার তিনি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ইংরেজ এক ভারতীয় তরুণের কাছে পরাভব মানলেন।

বজ্র আর বীণার তারে বাঁধা ছিল চিত্তরঞ্জনের অমর জীবনের মহাকাব্যের ছন্দ। একই সঙ্গে দুই বিপরীত সুরের সাধনা করে গেছেন তিনি, কিন্তু কোথাও তা ছন্দ হারায়নি। 'ষোল আনা' আইনজীবী জীবনকে ভোগ করলেন, তারপর রাজনৈতিক জীবনের পথে বাধা-স্বরূপ অর্থকে আর ভোগকে জীবননাট্য থেকে বিদায় দিলেন।

শুদ্ধ তপস্বী পবিত্র অন্তর নিয়ে সুরু করলেন নবজীবনের সাধনা— চিত্তরঞ্জন হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

তৃতীয় অধ্যায়

রাজনৈতিক জীবন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবন প্রকাশ্যভাবে খুবই অল্পকালের। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে সম্পূর্ণভাবে দেশজননীর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন, কিন্তু সাঙ্গ হলো না পূজা—পূজারী বিদায় নিলেন। তাঁর সেই স্বপ্নকে, অসম্পূর্ণ কাজকে রূপদানের বাসনা নিয়ে এগিয়ে এলেন না কেউ!

গান্ধীজী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে দেশবন্ধুর পদমর্যাদা দিলেন, কিন্তু মর্যাদা বহন করার মত যোগ্যতা সত্যি যতীন্দ্রমোহনের ছিল না। তা ই দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর (১৯২৫ সালের ১৬ই জুন) সুভাষচন্দ্রের মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পূর্বের বাংলাদেশ যেন এক মরাগাঙ্গ। দল আর দলাদলির ইতিহাস।

মান্দালয় জেল থেকে দেশবন্ধুর মানসপুত্র সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেয়ে এগিয়ে এলেন গুরুর অসম্পূর্ণ কার্যকে সমাপ্ত করবার বাসনা নিয়ে। তাঁকে কেন্দ্র করে আবার বাংলাদেশ নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে জেগে উঠল। তারপর সুদীর্ঘকাল সংগ্রামের ইতিহাসকে অতিক্রম করে এলো আমাদের প্রার্থিত স্বাধীনতা—১৯৪৭ সালে ১৫ই অগাস্ট।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র, তা কি আমরা পেয়েছি? দেশ হলে দ্বিখণ্ডিত। চতুর ইংরেজ 'Divide and rule'-এর পক্ষপাতী। হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হিসাবে বাংলার বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিল তীক্ষ্ণ ছুরিকা। আমরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম—পূর্ববাংলার মানুষরা ভিটেমাটি হারিয়ে চোখের জল ফেলল।

এছাড়া তাদের আর কিই-বা করবার ছিল? কারণ, আমাদের নেতৃবৃন্দ যে ক্লান্ত!

১৯৪৭ সালে বিখ্যাত সাংবাদিক ও গ্রন্থকার লিওনার্ড মোসলে এক সাক্ষাৎকারে জহরলাল নেহরুকে জিজ্ঞসা করেছিলেন, তাঁরা কেন এ ভাবে স্বাধীনতা পেতে রাজী হলেন?

উত্তরে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন:—"The truth is that we were tired men and we were getting on in years too. Few of us can stand the prospect of going to prison again—and if we had stood out for united India as we wished, the prison obviously awaited us."

সত্যি, বারবার জেলে গেয়ে তাঁরা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন! লিওনার্ড তাঁর বইএর ভূমিকায় বলেছেন যে, কোন্ সর্তে স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে, তা নাকি ১৯৯৯ সালের আগে প্রকাশ করা যাবে না। অতএব এ ইতিহাস জানতে পারবে অনাগত ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা!

কিন্তু আমাদের দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য যে তার আগেই আমরা হারালুম দেশবন্ধুকে। নিখোঁজ হয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র! কেবল চোখের জলের সঙ্গে মনে পড়ে, এঁরা যে কেউ জীবিত থাকলেই আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা হতো অন্য রঙে অন্য তুলিতে!

১৯১৭ সালে দেশবন্ধুর প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রবেশ। এর আগে পর্যন্ত তেমন করে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হননি তিনি—যদিও রাজনীতিতে তাঁর একটা সক্রিয় পরোক্ষ ভূমিকাও রয়েছে, যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তবুও অস্বীকার করব না—একটু দেরীতেই সুরু হয়েছিল তাঁর এ জীবন এবং এজন্য প্রতিপক্ষের অনেক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। তাঁরা অনেকেই বলেছেন, দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ একটা আকস্মিক ঘটনামাত্র।

আসলে রাজনীতি চর্চা তাঁর সাধনা ছিল না।

কিন্তু তাই যদি হতো তবে ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের মধ্যেই ফুরিয়ে যেত চিত্তরঞ্জনের জীবন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অমর বাণী ভারত আত্মার প্রাণলোকে পৌঁছত না।

ব্যারিস্টারী পাশ করে সদ্য তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন যেদিন দেশে ফিরলেন, সেদিন ভারতমাতার ক্রন্দনের চেয়ে একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সুতীব্র অর্থসমস্যা তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দেউলিয়া পিতার পুত্র—সেদিন জীবনের অখণ্ড স্বপ্ন ছিল পিতাকে ঋণমুক্ত করা।

তাছাড়া সেদিনের কংগ্রেস ছিল ধনী, উকিল, ব্যারিস্টারদের মজলিশের আসরই বলা চলে। বছরের পর বছর সেখানে কতকগুলি দুর্বল প্রস্তাব গৃহীত হতো এবং তাই নিয়ে চলতো বক্তৃতাবাজী। কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান হলেও জাতীয় রূপ লাভ করেনি। মডারেটদের দুর্বল প্রতিষ্ঠানই বলা যায় সেদিনের কংগ্রেসকে। তাই সেদিনের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে একা কোন তরুণের পক্ষে নতুন কিছু করাও হয়তো সম্ভব ছিল না।

রাজনৈতিক জীবনে পরোক্ষ ভূমিকা

স্বদেশপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত ছিল তাঁর জীবনে কৈশোর থেকেই—তরুণ বয়সে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমরা দেখেছি ম্যাকলীনের অপমানের উত্তরে বক্তৃতায়।

হাইকোর্টে অন্ধকার ঘরে বসে কাটে নিঃসঙ্গ দিন—বিফল ব্যারিস্টার ব্যাকুল অন্তরে খোঁজ করেন কোথায় সাফল্যের চাবিকাঠি? এদিকে অন্তরের মধ্যে অনুভব করেন কিসের যেন নিঃশব্দ পদচারণা। রাজনৈতিক জীবন গোপনে হাতছানি দেয়। মনে পড়ে দেশজননীর কথা—বঙ্কিমচন্দ্রের মায়ের রূপ ভেসে ওঠে কল্পলোকে।

এ সময়ে বিপিনচন্দ্র পাল একটি পত্রিকা বের করতেন 'New India' নামে। পত্রিকাটি ছিল তৎকালীন যুবসমাজের বিশেষ মুখপত্র। এই পত্রিকাকে অবলম্বন করেই নতুন একটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠল, যার রথী ছিলেন চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল প্রভৃতি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বেই এই দল জন্মলাভ করে এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দলের প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। এই সময়েই চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র প্রভৃতির চেষ্টায় সুবোধ মল্লিকের ওয়েলিংটনের বাড়ীতেই প্রথম গড়ে উঠল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। সুবোধ মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করলেন এই পরিষদের জন্য। সেই সভাতেই তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করা হলো।

বিপিনচন্দ্র পাল এই সময়ে ছিলেন চিত্তরঞ্জনের অন্যতম সুহৃদ এবং তাঁর স্বদেশভক্তি চিত্তরঞ্জনের প্রাণে বিশেষ শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল।

চিত্তরঞ্জন বিপিনচন্দ্রকে বলেছিলেন, "দেশসেবায় আপনি আমার ভার গ্রহণ করুন। সংসার ধর্মচর্চায় আমি আপনার ভার গ্রহণ করলাম।"

সানন্দচিত্তে চিত্তরঞ্জন তাঁর এই প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন।

দিন গড়িয়ে চলল—এলো ১৯০৫-৬ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে আগুন জ্বলে উঠল। ১৯০৬ সালে পূজোর ছুটিতে তিনি দার্জিলিং বেড়াতে গেলেন—সেখানে রাখীবন্ধনের দিনে তিনি যে অভিভাষণটি পাঠ করেন, তার মধ্যেই বিমূর্ত হয়ে আছে আগামী দিনের দেশবন্ধুর আশা বিশ্বাসের কথা। তিনি বলেছেন :—

"আমাদের দেশে আজকাল অল্পসংখ্যক বিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই যে নূতন জীবনসত্তা যাহাকে আমাদের সংবাদপত্রসমূহ স্বদেশী আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন, ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের মুক্তির কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের দেশ-ব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশী আন্দোলনই একমাত্র

উপায় এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন বাঞ্ছনীয়। আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে বাঞ্ছনীয় তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে ইহা মূলতঃ বাঙালী জাতির আত্মনির্ভরতার পথে প্রথম পদক্ষেপ। এক কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে। জগতের ইতিহাস বারেবারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে এক জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে তুলিয়া কিছু দিতে পারে না। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে প্রকৃত মুক্তির পথ কখনও মিলিবে না।

"এতদিন আমরা ইংরাজের বাক্‌চতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধুমাত্র তাহার মুখের কথার উপর সকল আশা ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম। আমাদের জাতীয় জীবনের ঘোর অন্ধকারের দিনে ইংরেজ বণিকবেশে আগমন করিয়া দুই-এক দিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপনপূর্বক আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিল। আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাহাদের সভ্যতা ও বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিলাম। আমরা একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে ইংরাজের ইতিহাস ইংরাজেরই জাতীয় জীবনের প্রতীক, আমাদের নহে। ইংরাজের ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে আমাদের মাতার দৈন্য ঘোচে না ও ইংরাজের গৌরবে আমাদের লজ্জা কিছুতেই নিবারিত হয় না। ইহা অতি সোজা কথা—অত্যন্ত সরল সত্য, কিন্তু সমস্ত জাতীয় জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হইলে বোধহয় এমনি করিয়া সরল সত্য ও অত্যন্ত দুর্বোধ্য হইয়া উঠে।

"আজ ভগবৎ প্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণ ছায়া-রূপী এই কুহেলিকা অপসারিত হইয়া গিয়াছে। এই নব উন্মোষিত জাতীয়ত্বের প্রভাতলোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—। আজ আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে বঙ্কিমবাবুর 'কমলাকান্তের দপ্তরের' ন্যায়

শীর্ণকায় কুকুরের মত করুণনেত্রে ও প্রার্থণাপূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরাজের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরাজ তাহার পাতের মাছের কাঁটাখানি উত্তমরূপে চুষিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে কিন্তু যাহাতে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, যাহাতে জাতীয় জীবন পুষ্ট হয় এমন কিছু দিবে না। আজ বিধাতা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে আপনার চরণে ভর করিয়া আপনি না দাঁড়াইতে পারিলে কোনদিনই আমাদের মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে না। সেই জন্যই আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এই নব আন্দোলন আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়। ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরতার পথে প্রথম পদক্ষেপ।"

(১৩৩২ সালের ১৯শে আষাঢ় 'বিজলী' পত্রিকা হইতে সংক্ষেপে গৃহীত।)

এই অভিভাষণে রয়েছে আমাদের জাতীয় জীবন নতুন পথের ইঙ্গিত! এ অভিভাষণ পাঠ করলে কি মনে হয় না যে জাতীয়তার বীজ ছিল তাঁর রক্তের সঙ্গে? বিশেষ করে আজকে এই বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকেও এর প্রয়োজনীয়তা ফুরায়নি। কারণ ইংরেজের অন্ধ অনুকরণ তো আজ বাঙালীর জীবনে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে!

এর পরের পটভূমিকা সুরাট কংগ্রেস (১৯০৬ মণি বাগচীর গ্রন্থ হইতে।) বিরোধ বাধিল মডারেট দলের প্রবীণদের সঙ্গে জাতীয় দল বা চরমপন্থী দলের নেতার। চরমপন্থী দল লোকমান্য তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি করতে চাইলেন, ওদিকে মডারেট দল দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি পদ গ্রহণের জন্য লণ্ডনে টেলিগ্রাম করলেন—এই বিরোধিতার ফল হল চরমপন্থীরা বেরিয়ে এলেন কংগ্রেস থেকে এবং চিত্তরঞ্জন নেপথ্য রাজনীতি থেকে বিদায় নিলেন।

এলো সাফল্যমণ্ডিত আইনজীবী জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়—স্বদেশী মামলাসমূহ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তাঁর দেশপ্রেম মূর্ত হয়ে উঠল। বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা, অরবিন্দের মামলা, ঢাকা ষড়যন্ত্র ও

কুতুবদিয়া মামলায় তিনি সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। এ সবই মনে হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পূণ প্রস্তুতির ইঙ্গিত।

এ সমস্ত কারণ থেকেই বোঝা যায় যে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক প্রবেশ আকস্মিক নয়—এ জীবনই ছিল তাঁর ধ্যানস্বপ্নের জীবন। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতার আঘাতে শিল্পী তুলি নিয়ে বসে ভেবেছেন, আর ভেবেছেন! তারপর এলো সে-স্বপ্নের ছবি আঁকবার পরম লগ্ন। ভারতের প্রকাশ্য রাজনীতিতে মধ্যাহ্ন গগনের সূর্যের দীপ্তি নিয়ে আর্বির্ভাব ঘটল চিত্তরঞ্জনের।

প্রকাশ্য রাজনীতির জীবন :—(১৯১৭-২৫ জুন) মনে প্রশ্ন জাগে চিত্তরঞ্জন কি ভারতের রাজনৈতিক আকাশে মধ্যাহ্ন গগনের সূর্য না কালবৈশাখীর ঝড়? উদ্দাম কালবৈশাখীর ঝড়ের প্রচণ্ড উন্মত্ততা নিয়ে তিনি আমাদের জাতীয় জীবনকে অন্যায় ও অসত্য থেকে, জড়তা থেকে মুক্ত করে নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে সুভাষ চন্দ্র বলেছেন :—

"স্বামী বিবেকানন্দ মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটী মানুষ হইতে বলেন—মানুষ তৈরীর ব্যাপারে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ে তাঁহার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি সমস্ত বাংলাকে এক সঙ্গে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্নিময়ী বাণী এখনও বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইতেছে—নতুন ভারত বেরুক হাট বাজার থেকে, কল কারখানা থেকে। কার্লমার্কসের গ্রন্থ হইতে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয় নাই। ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতিতে ইহার উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ যে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন তাহা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রচনায় ও কর্মে মূর্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল।

জাতি গঠনের প্রথম ভিত্তি মানুষ তৈরী, তার পরেই সংগঠন। স্বামীজী ও অন্যান্যরা মানুষ তৈরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং দেশবন্ধু চাহিয়াছেন রাজনৈতিক সংগঠন।"

'বাংলায় একটি ব্রত আছে' প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিই সপ্রমাণ করে যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেশবন্ধুর ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাস—ভবানীপুরের হরিশপার্কে প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি চিত্তরঞ্জন। মুক্তিযুদ্ধের ঋত্বিক বাংলার অন্তরের বাণী নিয়ে প্রবেশ করলেন প্রকাশ্য রাজনৈতিক জীবনে। সে বাণী বাংলার মর্মের, বাংলার হৃদয়ের তাই এর নাম দিলেন 'বাংলার কথা।'

মুগ্ধ বিস্ময়ে বাঙালী জাতি তাকিয়ে রইল তাদের আগামী দিনের নেতার দিকে। সুরু করলেন সভাপতি অভিভাষণ :—

"আমার বাঙলাকে আশৈশব মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে সকল দৈন্য সকল অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙলার যে মূর্তি তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছে এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস মন্দিরে সেই মোহিনী মূর্তি আরও জাগ্রত ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"আমি যে আপনাকে বাঙালী বলিতে একটা অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি, বাঙালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে, বাঙ্গলাকে যে অমানুষ বলে সে আমার বাঙ্গলাকে জানে না।

"বঙ্কিম প্রথমত বাঙ্গলার মূর্তি গড়িলেন। বঙ্গ জননীকে স্মরণ করিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল। মা আমার আপন গৌরবে বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সেই রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত।

"অনেকেরই হয়ত মনে হইবে এই সভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় 'বাঙ্গলার কথার' আবশ্যকতা কি ? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা দীক্ষা ও রুচিবিরুদ্ধ।

"আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয় তাহাকে কি বাঙালী জাতির যে জীবন সেই জীবনের সব দিক দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব? এই যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হয় বাঙালীকে মানুষ করিয়া তোলা। সেইজন্য আমাদের এখন ঠিক কি অবস্থা তাহার বিচার করিতে হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে আমাদের চাষীদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে দেখিতে হইবে কেন অনেক লোক পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিয়া বাস করে—সে কি পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য না অন্য কোন কারণে? সেই সংগে ইহাও বিচার করিতে হইবে আমাদের দেশের যত চাষ-যোগ্য জমি আছে সব ভাল করিয়া চাষ করিলে আমাদের অবস্থা সচ্ছল হয় কি না। যদি না হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আলোচনা করিতে হইবে।

"কিন্তু আমরা এরূপভাবে দেশের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করি না কেন? কারণ আমাদের শিক্ষার অভিমান আসিয়া দেশের সাধারণের সহিত আমাদের প্রাণের যোগ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয়জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ কোথায়? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না আমাদের উপর দেশবাসীর সেরূপ আস্থা নাই। আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি?

"কেন আমাদের এমন হইল? কেন আমরা দেশের সহিত প্রাণের যোগ হারাইয়া ফেলিলাম? কারণ আমাদের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে আদর্শের ও ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

"আসল কথা আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি বদলাইতে হইলে ইহাকে আমাদের স্বভাবধর্ম, সভ্যতা ও সাধনার সহিত যোগ করিয়া

দিতে না পারিলে এবং এই শিক্ষাকে সাধারণের সহজপ্রাপ্য করিয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের ঘোর বিপদের কথা। এই শিক্ষার ফলে আমরা দেশের নিকট হইতে মনেপ্রাণে অনেকটা সরিয়া গিয়াছি।

"আমাদের হাবভাব আচার ব্যবহার এত বেশী ইংরেজনবীশ হইয়াছে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় আমাদের শিক্ষিত বাঙালীর বাঙলা-দেশের সহিত কোন যোগ নাই। আমরা কতকগুলি ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করিয়াছি। আমরা মানুষ হইয়া উঠি নাই, একটু চালাক হইয়াছি মাত্র।

"আমার মনে হয় আমাদের এই নব জাগরিত জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চালনা করিতে হইলে আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদের ভাষাতেই দিতে হইবে। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষায় যে সত্য সরল বাণী তাহারই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

"যাহারা বর্তমান চার কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে চার কোটি, যাহারা দেশের সারবস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটি কর্ষণ করিয়া আমাদের শস্য উৎপাদন করে, যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও বাঙ্গলার নিজের সাধনাকে ও সভ্যতাকে বজায় রাখিয়াছে—যাহারা সর্বপ্রকার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও বাঙালীর ধর্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—যাহারা বাস্তবিকই বাংলাদেশের একাধারে রক্ত-মাংস-প্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড়? এই যে কৃষক সমস্তদিন ধরিয়া বাঙলার মাঠে মাঠে আপনাদের কাজ ও আমাদের কাজ শেষ করিয়া গান গাহিতে ফিরিতেছে উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক উহারা সাক্ষাৎ নারায়ণ। ডাক, ডাক সবাইকে ডাক। প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে?

"কিন্তু দেশের কাজ করিতে হইলে প্রথমেই মনে হয় আমাদের গ্রামসমূহের অস্বাস্থ্যের কথা। পল্লীসমাজ বাঙালীর সভ্যতার সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনী-শক্তি

হারাইয়া ফেলে, তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষীদের সে সম্পর্কে শিক্ষা দান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে এবং চাষীরা যাহাতে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উপায়ে জীবন ধারণ করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষীদের দেশের মহাজনদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া কম সুদে তাহাকে আবশ্যকীয় টাকা ধার দেবার জন্য গ্রামে গ্রামে তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কার্য করিতে হইলে আমাদের একটা প্রণালী চালিত করিতে হইবে।

"জনসংখ্যা ও কার্যের সুবিধা অনুসারে কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক-একটি পল্লীসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এসব গ্রামের ১৬ বৎসরের যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই এই সমাজভুক্ত হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচজন পঞ্চায়েত নির্বাচন করিবে। ঐ পঞ্চায়েতের উপর ঐ সকল গ্রামসমূহের সকল কার্য—সকল শুভাশুভের ভার অর্পিত হইবে।

"এই পল্লীসমাজের উপরে থাকিবে জেলা-সমাজ। সেই জেলাভুক্ত সকল পল্লীসমাজের কার্য তদন্ত করিবে জেলাসমাজ।

"সকল পল্লীসমাজের শিক্ষাদীক্ষার কার্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার যে রাজধানী তাহার শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবে জেলাসমাজ। কৃষিকার্যে ও কুটিরশিল্পে যাহাতে উন্নতির প্রসার হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্যে পরিণত করিবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবে—এই ব্যাঙ্ক-এর শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজেই একটি করিয়া থাকিবে। এই জেলাসমাজ ও পল্লীসমাজের কোন কার্যেই গভর্ণমেণ্টের কোন কর্মচারী থাকিবে না।

"শুধু কৃষিকার্যে আমাদের জীবনধারণ অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু সে উপায়ে বিলাতী industrialism বা কারখানা স্থাপন নয়। কলকারখানার উপর যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আমাদের দেশের শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং প্রথমেই আমাদের বিলাস বর্জন করিতে হইবে। কারণ বিলাসের মোহ এই যে অযাচিত অবসাদ যাহা আমাদের সর্বপ্রকার অস্বাস্থ্য ও ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে শুধু ভদ্রলোকের গৃহে নয়, কৃষকের কুটিরে পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহাকে জীর্ণবস্ত্রের মত পরিহার করিতে হইবে।"

এতকাল তিনি বাইরের জগতে যা অন্বেষণ করেছেন—তাই পূর্ণতা লাভ করলো তাঁর এই অভিভাষণের মধ্য দিয়ে। বাঙ্গালার ঋক্ রচনা করলেন মাতৃপূজার আসন। কবি চিত্তরঞ্জন একদিন বলেছিলেন ঃ—

সব কর্মশেষ আজ মন একতারা
বাজিতেছে সেই সুরে অন্ধ দিশাহারা।
সেই পথ লাগি আজি মন পথবাসী
সেই পথখানি মোর গয়া গঙ্গা কাশী।

গদ্যে রচিত এই অভিভাষণটির মধ্য দিয়ে 'মালঞ্চ' ও সাগর-সংগীতের কবি খুঁজে পেলেন সেই পথ। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাঙালী জাতির জীবনে চিত্তরঞ্জন আনলেন নতুন সুর—এমন করে বাঙলার মর্মের কথা আর মর্মের ব্যথাকে অনুভব করেন নি কোন নেতা। এই অভিভাষণের মূল্য আজও ফুরিয়ে যায়নি। লর্ড রোনাল্ডসে তাঁর গ্রন্থ দি হার্ট অব আর্যাবর্ত-এ এই অভিভাষণ সম্পর্কে যেমন আলোচনা করেছেন, তা থেকেই নির্ণীত হবে এর সঠিক মূল্যায়ন। এই সময়ে রাজনৈতিক আকাশে একটি নূতন শব্দ জন্মলাভ করেছিল তার নাম Home rule— শব্দটির জন্মদাতা শ্রীমতী এ্যানি বেসান্ট। এই ইংরেজ কন্যা ভারতের সভ্যতায় মুগ্ধ হয়ে ভারতের জন্য মনপ্রাণ

সমর্পণ করেছিলেন এবং সমগ্র ভারতব্যাপী তিনি Home rule বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে বেড়াতে লাগলেন। রোষায়িত হয়ে উঠল ইংরেজ সরকার—১৯১৭ খ্রীঃ মাদ্রাজ সরকার লর্ড পেণ্টল্যাণ্ডের আদেশে শ্রীমতী বেসাণ্টকে কারারুদ্ধ করা হলো। এ সংবাদে রোষদীপ্ত ভাষায় প্রতিবাদ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন। তিনি বললেন :— "বিলাতের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন শুধু অর্থনীতির দিক দিয়া নয়, রাজনীতির দিক দিয়াও ভারতবর্ষের পুনর্গঠন একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নহে—জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা বিভিন্ন হইলেও এই স্বায়ত্তশাসন পরিচালিত রাজ্যখণ্ড-গুলি এক বিশাল প্রজাতন্ত্র সাম্রাজ্যে যুক্ত থাকিবে। এই যে প্রতিজ্ঞার কথা আর বাণী, ইহা প্রত্যেক অন্তরীণ আদেশে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তাহাদের এইরূপ আশা দেওয়া হউক আর না হউক আমি এই অন্তরীণ আদেশগুলির তীব্র প্রতিবাদ করিবই, কারণ এইরূপ প্রত্যেক আদেশ মানুষের ন্যায্য বিচারের ব্যভিচার এবং মনুষ্যত্বের উপর ভীষণ অত্যাচার।

"আমার মনে হয় ভগবান কেবল একবারই ক্রুশবিদ্ধ হন নাই, অত্যাচারী ও উৎপীড়নকারীরা বারবার মনুষ্যত্বকে এইরূপ ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছে এবং মনুষ্যত্বের উপর এরূপ প্রত্যেক অত্যাচার ভগবানের পবিত্র দেহে এক-একটি নূতন পেরেক প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্পাদকেরা ক্রমাগত বলিতেছে, তোমরা অধীর হয়ো না। অনেক সময় আছে। পৃথিবীতে ভারতবাসীদের মত সহিষ্ণু জাতি আর নাই কিন্তু ধৈর্যেরও সীমা আছে। বাস্তবিকই আমরা অধীর হইয়া পড়িতেছি। যখন আমরা দেখিতেছি আমাদের শাসক সম্প্রদায় কথায় এবং কাজে পৃথক, তখন কি আমরা বলিব না কেন এই আশার কথা বল! দেশে যখন শান্তি নাই তখন কেমন করিয়া আমরা স্থির থাকিয়া শান্তির কথা বলি।" এর পরই চিত্তরঞ্জন Home rule লীগে যোগদান করেন। এই সময় ভারত পরিদর্শনে এলেন

মণ্টেগু। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনলাভের কতখানি উপযুক্ত হয়েছে তা দেখে যাওয়া। তিনি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, কিন্তু উভয়ের মতের মিল হলো না। এই 'সময়কার কথা মণ্টেগু তাঁর Indian Diary'তে লিখেছেন :—December 7th I have talked with C. R. Das an extremist but a most sensible fellow. Demanding complete responsibility at once for local Government. Das argued this very strongly. He added :—Well, give us standing committees, a new electorate, decent legislative councils and no power for five years in your act of parliament. I would rather have this than steps that I know will not work. The half way house is not good, there is no intermediate possible between responsible Government and complete irresponsibility. He attracted me enormously. He told me of the prohibition of English histories of the way that everybody is trying to get confessions from the internees and so on." যাই হোক ১৯১৭ খ্রীঃ ২০শে আগস্ট মণ্টেগু ঘোষণা করলেন যে ভারতবাসীকে অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হবে এবং সেই অধিকার বৃদ্ধি করে ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। মণ্টেগুর এই ঘোষণায় সমগ্র ভারতব্যাপী এক উত্তেজনার সৃষ্টি হ'লো। চিত্তরঞ্জনের মত মানুষের মনের পরিচয় লাভ করেই তিনি হয়ত উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবাসীকে আর বেশীদিন দমন করে রাখা যাবে না।

১৯১৭ খ্রীঃ কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসল কলকাতায়। ভারতবর্ষের ৬টি প্রদেশ থেকে এই সভায় শ্রীমতী এ্যানি বেসান্তকে সভানেত্রীর পদে আমন্ত্রণ জানায় এবং চিত্তরঞ্জন কর্তৃক এ প্রস্তাব সমর্থিত হয় কিন্তু মডারেট দল পুনরায় বাদ সাধলেন। তাঁদের ইচ্ছে যে এই অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবেন মামুদাবাদের

রাজা—সুতরাং বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখে ভোট গ্রহণ করা হলো এবং বলাই বাহুল্য এই ভোটে মডারেট দল পরাজিত হয়ে তাঁদের সঙ্কল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং শ্রীমতী বেসান্তকে সভানেত্রীর পদে বরণ করে নেন। জয়ী হলেন জাতীয় দল, বিজয়ী হলেন চিত্তরঞ্জন। তাঁর এই জয় আগামী দিনের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিজয়ের পথকে প্রশস্ত করে দিল। শুধু চরমপন্থী ও মডারেট দলের মিলনের জন্যই এ কংগ্রেসের ইতিহাস ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি, এই কংগ্রেসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল যে কলকাতার এই কংগ্রেসের পরই কংগ্রেসের ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে নরমপন্থীদের হাত থেকে চরমপন্থীদের হাতে চলে গেল।

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলো। ব্রিটিশ সরকার অন্তরীণ আইনে গ্রেপ্তার করলেন মহম্মদ আলী ও সৌকত আলীকে। এই ঘটনার প্রতিবাদে চিত্তরঞ্জন বললেন ঃ—

'সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান যাহাতে মিলনের সুদৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ হয় মৌলানা সৌকত আলী চিরজীবন সেই কার্য সাধনে আত্মপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি আমাদের সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও সমাদরভাজন সে বিষয়ে অধিক বলাই নিষ্প্রয়োজন। শেষোক্ত নামটি শ্রাযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর, আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে জানি। আমি আপনাদিগকে নিঃসংশয়ে বলিতেছি যে তিনি এমন কোন কাজ করেন নাই, যেজন্য তাঁহাকে অন্তরীণে আবদ্ধ করা যাইতে পারে। আমি এই অন্তরীণের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। আমি বলিতেছি এই নীতি ইংরাজের অযোগ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বহুকাল হইতে সত্যধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত; এই নীতি তাহার পরিপন্থী। সাম্রাজ্যের শান্তিরক্ষা ও মঙ্গলের জন্য শীঘ্র এ নীতি পরিত্যক্ত হওয়া কর্তব্য।

'যে সময়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবাসীকে আংশিকভাবে হোমরুল

দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, যখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে সাম্রাজ্যের রক্ষাকল্পে কোন না-কোন আকারে স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী ভারতবর্ষে প্রচলিত করিতেই হইবে, যে সময়ে রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দেশমধ্যে শান্তিরক্ষার উপদেশ দিতেছেন সেই সন্ধিক্ষণে লোকমত উপেক্ষা করিয়া কর্তৃপক্ষের এইরূপ কার্য করা কি সঙ্গত হইতেছে? তোমরা তাঁহাদিগকে রাজনীতিক ব্যাপারের জন্য ভারতরক্ষা আইনের দোহাই দিয়া আবদ্ধ করিয়াছ তাহা অসঙ্গত, উহারা ভারতরক্ষা আইনের কোন ধারায় আবদ্ধ হইতে পারে না। কারণ ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক ও ভারতবর্ষের বিচারকগণ ঐ কার্যকে অবৈধ ও অনধিকারচর্চা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছন।

'তোমরা যখন বল স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইলে এ দেশের কোটি কোটি লোকের অমঙ্গল হইবে তখন আমরা বুঝি কোন্ স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া একথা তোমরা বলিতেছ। তোমাদের এ ভণ্ডামি কি আমরা বুঝিতে পারি না? আমি আজ স্পষ্টাক্ষরে একথা বলিতেছি, একথা আমার নিজের যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কোটি কোটি দেশবাসী স্বায়ত্তশাসনের আমলে না আসিবে ততক্ষণ আমি কোন হোমরুল কোন স্বায়ত্তশাসন চাহি না। যখন আমি বলি হোমরুল স্বায়ত্তশাসন তখন আমি একথা বলি না যে একটা ব্যুরোক্রেসির বদলে আর একটা ব্যুরোক্রেসির সৃষ্টি হউক। না, আমরা তাহা চাহি না। আমরা চাহি হোমরুল, স্বায়ত্তশাসন দেশের জনসাধারণের দ্বারাই তাহা পরিচালিত হইবে। দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য জনসাধারণই দেশকে শাসন করিবে ইহাই আমার মনের কথা। দরিদ্রতম প্রজা হইতে ঐশ্বর্যশালী জমিদার সকলেই তাহাতে ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করিতে পাইবে। সে শাসনকার্যে প্রত্যেকেরই কথা কহিবার অধিকার থাকিবে। ভারতের জনসাধারণ যাহা চাহে তাহার উপরেই হোমরুল প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য।" (সংক্ষেপিত)

তিনি পরিব্রাজকের ন্যায় বেরিয়ে পড়লেন পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে

তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলা। বাংলাদেশের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেল এই মানুষটির কথা শুনে—যে কথা তাঁরা আগে কখনও শোনেনি। ধীরে ধীরে তাঁরা তাঁকে বসালেন নেতার আসনে। বাংলাদেশের এই নেতৃত্বপদ চিত্তরঞ্জনকে অদূর ভবিষ্যতে দান করলো সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। এক-কথায় সে সময় তাঁকে অভিহিত করা যায় 'Uncrowned king of India'। সময় অল্প, তারই ভিতর জাতীয় জীবনে যে কালবৈশাখীর ঝড় আনলেন তিনি কোন শক্তির সাধ্য ছিল না তাকে প্রতিরোধ করবার, তাই গান্ধীজীর মত একরোখা ব্যক্তিও চিত্তরঞ্জনের কাছে বারবার পরাভব স্বীকার করেছেন—কিন্তু তাঁদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ও ভালবাসার বন্ধন অটুট ছিল, সেকথা যথাসময়ে বলবো।

এই সময় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় দেশের স্বায়ত্তশাসনলাভের বিশেষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। চিত্তরঞ্জন পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণকালে একটি অভিভাষণে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের এই কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন "দেশের স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়াই আমি সর্বদা কাজ করিয়াছি। আমার চিরজীবনের আদর্শ ঐ প্রকার। ইউরোপীয় রাজনীতির আদর্শে আমি কোনদিন কাজ করিতে যাই নাই, ইহা আমার ধর্ম। দেশকে সেবা করিলে জাতিকে সেবা করিলে মানব-সমাজের সেবা করা হয়। আর মানবসমাজের মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সমাপ্ত হয়। বাংলার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যাহা ইউরোপীয় শিক্ষার অনেক উপরে অবস্থিত। ইউরোপীয় রাজনীতি হইতে ধার-করা জিনিস লইয়া আমাদের জাতীয়তা গঠিত হইবে ইহা আমার মনের কথা নহে, সেজন্য আমি বলিতেছি সমগ্র জগৎটাকে বাংলার কিছু জানাইবার আছে কিছু দান করিবার আছে।

"এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রনিচয় ও ভারতবাসী আন্দোলনকারী ইংরেজগণ বলিতেছেন যে আমাদের উদ্দেশ্য শুধু সরকারকে গালাগালি দেওয়া, আমি তাহাদের এ অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া

প্রতিবাদ করিতেছি।

"এই সমস্ত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে যদি তাহাদের দেশ মনে করেন তবে সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য আমরা তাহাদের সহযোগিতা করিব। কিন্তু এই সমস্ত সংকীর্ণমনের বণিকবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কেবলমাত্র ব্যবসায়ের স্বার্থের খাতিরে এ দেশে থাকিয়া নিজেদের ধনবৃদ্ধি করেন তাহা হইলে তাহাদের নিজেদের ভারতবাসী বলিবার কোন অধিকার নাই।

"এ দেশের গভর্নমেণ্ট স্পষ্টভাবে তাহার নীতির কথা এ দেশের লোককে জানাইয়া দিয়াছেন। যদি তাহাতে এ দেশবাসী চরমপন্থী ইংরেজগণ বাধা দিতে আসেন তখনই তাহাদের মুখের উপর বলিয়া দিতে হইবে ভারতবর্ষ তাহাদের দেশ নহে। ভারতবর্ষ আমাদের পিতৃভূমি, আমাদের পিতৃপিতামহগণ সহস্র বৎসর ধরিয়া এ দেশে বাস করিয়া গিয়াছেন। এখনও আমরা বাস করিতেছি। এদেশের ধূলিকণা আমাদের কাছে সমান পবিত্র। কে তোমরা?"

১৯১৭ খ্রীঃ ডিসেম্বরে কলকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন —বক্তা চিত্তরঞ্জন—দাবি একই—আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করলেন নিম্নলিখিত বক্তৃতায় :—

"ভারত গভর্নমেণ্টকে সীমা ও কার্যপদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। অন্যান্য বিষয় নির্দিষ্ট প্রদেশের স্থানীয় গভর্নমেণ্ট দ্বারা নির্ধারিত হইবে—ভারত গভর্নমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে স্ব-স্ব অধিকারের একটা সীমা থাকিবে।

কোন নির্দিষ্ট প্রদেশের মন্ত্রণাবিভাগ জনসাধারণের দ্বারাই গঠিত হইবে, সেই প্রদেশের শাসনবিভাগকে মন্ত্রণাবিভাগের অধীন রাখিতে হইবে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এমন একটা সময় আসিয়াছে এ সময় আর উপেক্ষা করিলে চলিবে না। প্রভুত্ব প্রয়াসী

রাজকর্মচারীদের হাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে এখন ব্রিটিশ পার্লা-মেণ্টকে সে ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। এদেশে রাজকর্মচারীদের প্রভুত্বের ও প্রাধান্যের চরম লীলা হইয়া গিয়াছে। দেড়শত বৎসরের কুশাসনে আমরা অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি। আর একদিনও বিলম্বের প্রয়োজন নাই। যত শীঘ্র আমাদের ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা করা চাই।

সকল বিষয়ে আমরা দায়িত্বপূর্ণ শাসনক্ষমতা চাই। এদেশের মঙ্গলের জন্য যাহা প্রয়োজন আমি সেইভাবেই আমাদের নিয়ম-প্রণালী পরিবর্তনে প্রয়াসী। ইহাই আমার কাম্য, তাহাই আমি চাহিতেছি। ইহা আমাদিগকে পাইতেই হইবে।

আমরা এখন হইতে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিতে থাকি যে যতক্ষণ জনসাধারণের হস্তে দেশের শাসনভার ন্যস্ত না হইতেছে ততক্ষণ আমরা কোনমতেই নিরস্ত হইব না— ; সন্তুষ্ট থাকিব না।

প্রত্যেক জাতিরই তাহার জন্মগত অধিকার অনুসারে বাঁচিতে হইবে, বড় হইতে হইবে, উন্নত হইতে হইবে। আমরা সেই অধি-কারের দাবি করিতেছি। আমরা মহানিদ্রায় মগ্ন ছিলাম, এখন ভগবানের আশীর্বাদে সে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে—তাই আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার দাবি করিতেছি।"

কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনের এই অভিভাষণের মধ্য দিয়ে চিত্তরঞ্জন জাতীয় জীবনে আনলেন নতুন সুর। কংগ্রেস এবার তার বিলাসিতার আসন ছেড়ে দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামী প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল; এবং এর জন্য চিত্তরঞ্জনের অবদানের কথা, নিশ্চয় দেশ ও জাতি ভুলে যাবে না। সূচনা ঘটল তাঁর কর্মবহুল রাজনৈতিক জীবনের (১৯১৭ খ্রীঃ) তবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক জীবনই তো নয়, এর পাশে ছিল রাজসমারোহের কর্মজীবন—কর্মবীর চিত্তরঞ্জন দুই তরী বেয়ে চলেছেন সমানভাবে। এই সময়কার কথা অপর্ণা দেবী তাঁর 'মানুষ চিত্তরঞ্জনে' লিখেছেন :—"আইনজীবী হয়ে তিনি ট্রাঙ্ক মামলায়

ব্যস্ত; আবার সমাভোবে কংগ্রেসের কাজে শৈথিল্য দেখিনি কোনদিন। তাছাড়া—পারিবারিক পরিবেষ্টনে আমাদের সঙ্গে গান, গল্প হাসি-কৌতুক কিছুরই অভাব হতো না।"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য চিত্তরঞ্জনের ছিল সুগভীর সাহিত্য-প্রীতি এবং তিনি ছিলেন সাহিত্যসেবক। এই সময়ে তাঁর বাড়ীতে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সাহিত্যের আসর বসত। রবীন্দ্রনাথ ও অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবিদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠত সে সাহিত্য-বাসর। আসর ভাঙলে চলত খাওয়াদাওয়া। তারপর নিজের গাড়ী করে সবাইকে বাড়ী পৌঁছে দিতেন তিনি। এর থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি যে বলেছেন 'জীবনকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া চলে না, তাঁর এই উক্তির বিমূর্ত বাণীরূপ ছিল তাঁর নিজের জীবন।

১৯১৮ খ্রীঃ—এই খৃষ্টাব্দের অন্যতম ঘটনা রৌলট বিল ও 'Defence of India Act'-এর প্রতিবাদস্বরূপ সমগ্র দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন ও উত্তেজনার সৃষ্টি। কারণ এই Defence of India Act-এ ছিল বিনাবিচারে গ্রেফতার ও বন্দী করবার ধারা। অতএব এই সময় মডারেটগণও নির্বিচারে এই আন্দোলনে যোগদান করলেন। এই Defence of India Act-এর বিরুদ্ধে চিত্তরঞ্জন তাঁর মতবাদ প্রকাশ করলেন নিম্নলিখিত ভাষণে:—

ভারত রক্ষা আইন—১৯১৮ খৃ: ৫ই মার্চ টাউন হলের বিরাট সভায় এই আইন সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন এই ভাষণটি দেন:—

এই অবৈধ ও যথেচ্ছাচারমূলক আইনের বিরুদ্ধে আমার মতামত প্রকাশের অবকাশ প্রদানের জন্য আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি। এই আইনটি যে অত্যন্ত অন্যায়-মূলক তাহা আপনাদের বুঝাইবার জন্য আমি কোন যুক্তিমানের অবতারণা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি না।

আমাদের প্রস্তাবটিতে ৫টি ধারা আছে:—

(১) ভারতরক্ষা আইনের সুখের জন্য প্রযুক্ত নহে, উহা দেশের

আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং উহা পরিত্যক্ত হউক।

(২) ১৯১৮ খ্রীঃ বেঙ্গল রেগুলেসন নং ৩ পরিত্যক্ত হউক।

(৩) অন্তরীণে আবদ্ধ যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকার প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন তাহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে অভিযুক্ত করুন।

(৪) যাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই তাহাদিগকে এখনই মুক্তি প্রদান করুন।

(৫) দমননীতিসংক্রান্ত যদি কোন প্রকার আইন প্রণয়ন করিবার কল্পনা থাকে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। আমি ৩য় ধারাটি সম্পর্কে আলোচনা করিব।

অন্তরীণে আবদ্ধ এই সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন প্রমাণ আছে, নয়ত কিছুই নাই। যদি কোন প্রমাণ না থাকে তাহা হইলে তো কথাই নাই। যদি প্রমাণ থাকে তবে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইতেছে না কেন? ইহাতে শুধু লোকের মনে এই সন্দেহই প্রবল হইতেছে যে, যাহারা অন্তরীণে আবদ্ধ, তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণাভাব বলিয়াই সরকার তাহাদিগকে আদালতে অভিযুক্ত করিতেছে না। যদি পর্যাপ্ত প্রমাণই থকে তবে আবার বলি কেন তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য আদালতে বিচারার্থে উপস্থিত করা হইতেছে না? প্রমাণ সত্ত্বেও মানুষকে সরকার গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে রাখিতেছেন—অথচ বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিতেছেন না, এ ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেলে সেটা অত্যন্ত আশঙ্কার কথা হইবে। আমি সোজা কথা ভালবাসি। বর্তমান আইনটি সঙ্গত কি অসঙ্গত? যদি ইহা অসঙ্গত হয় তবে তাহাকে কোন ক্রমেই আইনের কেতাবে স্থান দান করা কর্তব্য নহে। সভাপতি শ্রী চক্রবর্তী মহাশয় এই আইনটিকে—'আইনবর্জিত বিধান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিধানশূন্য আইন কাহাকে বলে; যে আইনের দ্বারা সমাজের স্থায়িত্বরক্ষার উদ্দেশ্য

সার্থক হয় না তাহাকেই বিধানশূন্য আইন বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। যাহা ন্যায়সঙ্গত যথার্থ ইহা তাহার বিরোধী। ন্যায়বিচারকে এই আইন মানিয়া চলে না, কাজেই ইহা বিধানকেও অস্বীকার করে। এই আইন মানুষের জন্মগত অধিকারকে ধ্বংস করিতেছে বলিয়া আমরা ইহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মানুষকে গ্রেপ্তার করিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখা হইবে অথচ দেশের প্রচলিত বিধানানুসারে তাহার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে আদালতে তাহাও বলা হইবে না, প্রমাণ প্রয়োগ করা হইবে না, ইহা মানবের জন্মগত স্বাভাবিক অধিকারের পরিপন্থী। কাজেই ইহা বিধানশূন্য শৃঙ্খলা-বিরহিত "উদ্দাম আইন"।

এই বিধানের দ্বারা কোন কোন রাজকর্মচারীকে (সামরিক বা অসামরিক) এরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে যে তাঁহারা যদি মনে করেন যে কোন ব্যক্তির কার্য সন্দেহজনক—তবে সেব্যক্তিকে তাহাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না বা তাঁহাদের নির্ধারিত এলাকার মধ্যে সে ব্যক্তিকে বাস করিতে আদেশ দিতে পারেন কিংবা সে ব্যক্তিকে এমনভাবে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে সে ভবিষ্যতে অমুক কার্য করিবে না। দেখুন কি চমৎকার অস্পষ্ট ভাব ও ভাষা। অবশ্য একথা-গুলির মধ্যে এমন কিছু নাই যাহা দোষমুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। এই আইনের বলে যুবকদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে লইয়া যাওয়া হইবে, নির্জন কারাকক্ষে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাহারা রক্ষিত হইবে।

যুদ্ধের সময় যদি কোন বিধান প্রবর্তিত হয় তাহার উদ্দেশ্য লোকে বুঝিতে পারে, গৃহদ্বারে যখন শত্রু আসিয়া উপস্থিত হয় তখন যদি কোন কঠোর বিধান প্রবর্তিত হয় তাহার উদ্দেশ্য লোকে বুঝিতে পারে। কিন্তু গৃহকোণ হইতে যুবকগণকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া এবং কোন্ অপরাধে তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহা প্রকাশ না করা কি ন্যায়সঙ্গত? বিশেষতঃ বিচারশালায় তাহাদিগকে অভিযুক্ত না

করা কি আরও গুরুতর অন্যায় নহে? এই আইন যে অত্যন্ত অত্যাচারমূলক এবং অবশ্য পরিহর্তব্য এখনও কি তৎসম্পর্কে যুক্তিতর্কের অবকাশ আছে? সমাজরক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন। কিন্তু তাহা এই আইন নহে। এই বিধানের ন্যায় অন্যায় ও অত্যাচারমূলক আইন আর আছে কি?

এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করা আমাদের প্রধান কর্তব্য। এই আইন প্রবর্তনে যে উদ্দেশ্যের আরোপ করা হইতেছে তাহা যথার্থ নহে। প্রকৃত উদ্দেশ্য কি: উহারা বলিতেছে "দেশমধ্যে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে। আমি উত্তরে বলিব আচ্ছা স্বীকার করিয়া লইলাম, বাংলাদেশে যে বিপ্লববাদী একটি দল আছে তাহা আমি সত্য বলিয়া মানি। এই উপায়েই কি বিপ্লববাদী দলকে পিষিয়া ফেলিতে পারিবে? কোনও দেশের বিপ্লব কি এই প্রকার নীতি-বিগর্হিত আইনের দ্বারা লুপ্ত হইয়াছে? আমি এই দলের বহু ব্যক্তির মোকদ্দমায় তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছি সুতরাং তাহাদের মানসিক অবস্থা ও মনোবৃত্তির দার্শনিকতা সম্বন্ধে আমার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে। এই বিপ্লববাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্খা।

আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ দেখিতেছে পৃথিবীর সকল জাতিই স্বাধীন। অন্যজাতির অবস্থার সহিত আপনাদের অবস্থার তুলনা করিয়া তাহারা পরস্পর বলাবলি করিয়া থাকে, "আমরা এমন অবস্থায় কেন থাকিব? আমরাও স্বাধীনতা চাই।"

আজ তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দান কর, দেখিবে দেশে আর বিপ্লববাদ নাই।" জনসাধারণকে বল "যাহা চাহিতেছ তাহা দিলাম।" আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি ইহা বলিবার পর দেশ হইতে বিপ্লববাদী দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এ কথা আমি কতবার বলিয়াছি। কিন্তু আমাদের কথা কেহ কানে তুলেন নাই। তাহার পরিবর্তে আমরা শুনিয়াছি উহার প্রতিষেধক ভারতরক্ষা আইন। আমাদিগকে তাঁহারা বলিয়াছেন যে রাজনীতিক অপরাধ এই আইন

প্রবর্তনের পর হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু আমি বলিতেছি তাহা সত্য নহে।

আমরা সমস্বরে মিলিত কণ্ঠে এই আইন রদ করিবার জন্য যদি দাবি করিতে থাকি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ আইন থাকিবে না, উঠিয়া যাইবেই। (সংক্ষেপিত)

এরপর কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের জন্য তিনি বোম্বাইতে গেলেন। ১৯১৮ খ্রীঃ ১৯শে অগাস্ট বোম্বাইতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন হাসান ইমাম। চিত্তরঞ্জন বললেন, "আমি বলি না দেশে বিপ্লববাদী দল নেই। কিন্তু কঠোর অত্যাচার দ্বারা তাদের দমন করা যাবে না।"

কলকাতা, দিল্লী, নাগপুর, মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ সর্বত্র চলল এই বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-সভা। সবাই উত্তেজিত, বিক্ষুব্ধ! এ কি অন্যায়? ব্রিটিশ সরকারের স্বৈরাচারের তো একটা সীমা থাকা দরকার। সত্যি কথা বলতে কি ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী-বিদ্রোহের পর কোন একটা বিষয়কে নিয়ে এ ধরনের আলোড়ন ও উত্তেজনা ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। এই বছরই কংগ্রেসের ২য় অধিবেশন বসল দিল্লীতে। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন বলেন:—"The greatest opponent of self government is not the British Parliament but Indian Civil Service. Introduction of self government in this country is the death of Bureaucracy. Can any responsible expect that the Bureaucracy will quietly put an end to itself? I therefore ask you to insist that a time limit should be put in the statute." (স্বায়ত্তশাসন ভিন্ন স্বৈরাচার সরকার ধ্বংস সম্ভব নয় এবং এর জন্য একটা সময় দরকার)।

১৯১৯ খৃঃ

রাজনৈতিক নেতাদের পরম বিরোধিতা সত্ত্বেও আপন সঙ্কল্পে অটল রইলেন ব্রিটিশ সরকার এবং ১৯১৯ খ্রীঃ ১৮ই মার্চ রৌলট বিল আইনে পরিণত হলো। তবে জনগণকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এই বিলের পরমায়ু হ'ল মাত্র তিনবছর। এত আবেদন-নিবেদন সব বাতিল হলো। মানুষ কি গরু ভেড়া যে ইচ্ছেমত বিনা কৈফিয়তে জেলখানারূপ খোঁয়াড়ে পুরলেই হলো? এই নিষ্ঠুর বিলের তীব্র প্রতিবাদ করলেন গান্ধীজী। তিনি এই বিলের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন সত্যাগ্রহ। ১৯১৯ খ্রীঃ ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহের দিন বলে ধার্য করা হলো। গান্ধীজী সেদিন সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে উপবাস ও প্রার্থনা করবার জন্য জাতিকে আবেদন জানান। তিনি বলেন: "সত্যাগ্রহ আত্মতুষ্টিমূলক আন্দোলন। অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া দুঃখ বরণ করিয়া ইহার প্রতিকার করা কর্তব্য। সত্যাগ্রহী সমাজের মঙ্গলহেতু বিধিনিষেধ পালন করিবেন কিন্তু যদি এমন হয় যে কোন আইনের নিষেধ মান্য করিলে আত্মসম্মান নষ্ট হয় মাত্র, তখন তিনি ঐ আইন ভঙ্গ করিয়া তজ্জনিত দণ্ড বিনা বাক্যব্যয়ে ও ধীরভাবে ভোগ করিবেন।" মনে পড়ে চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠে আমরা ঠিক একই সুর ধ্বনিত হতে শুনেছি বন্দেমাতরম ও আলীপুরের বোমার মামলায়।

গান্ধীজীর এই বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে চিত্তরঞ্জন নিজেকে সত্যাগ্রহীরূপে ঘোষণা করলেন। ৬ই এপ্রিল কলকাতার গড়ের মাঠে এক বিরাট জনসভায় তিনি বলেন:—

"আজ মহাত্মা গান্ধীর দিন। আজ বাঙালীর হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিবার দিন। আনন্দের দিনে আমরা আত্মহারা হইয়া যাই কিন্তু দুঃখের দিনে আপনাকে দেখিতে পাই ও ভগবানের বাণী শুনিতে পাই। আজি জাতির বিপদের দিনে এই জাতির যে আত্মা তাহাকেই অনুসন্ধান করিব। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' কিন্তু এই বল কিসের বল? পাশব বলে আত্মাকে পাইবে না। এই বল প্রেমের

বল। ইহাই মহাত্মা গান্ধীর বাণী। আর ইহাই সমস্ত ভারতের বাণী। এই বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সকল স্বার্থপরতাকে, সকল হিংসা ঘৃণা ও বিদ্বেষকে বিসর্জন দিতে হইবে। আমরা রৌলট আইনের বিরুদ্ধে কেন আন্দোলন করি? আমরা বুঝিতে পারিয়াছি রৌলট আইন চলিলে আমাদের এই নবজাগ্রত জাতিটাকে তাহার নিজের পথ ধরিয়া গড়িয়া তুলিতে বাধাপ্রাপ্ত হইব। সেই বাধা অতিক্রম করিতে হইলে সকল হিংসা দ্বেষ বর্জন করিয়া দেশ-প্রেমকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তাই মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন "শত্রুকে ঘৃণা, হিংসা করিবে না, কারণ প্রেমের জয় অনিবার্য।"

ইহা প্রেমের আন্দোলন, ধর্মের আন্দোলন, জীবনের স্পন্দন। এই আন্দোলনকে সফল করিবার একমাত্র উপায় আত্মনিবেদন—সকল শাস্তি, সকল আপদবিপদকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণের অনুরাগে আত্মনিবেদন।" (এই সভাতেই চিত্তরঞ্জন নিজেকে সত্যাগ্রহী বলে ঘোষণা করলেন।)

এই অভিভাষণের ভেতর দিয়ে গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। সত্যাগ্রহের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি বলতেন, জীবনে যেটা সত্য বলে বুঝব সেই আদর্শ রাখতে জীবনই হলো সত্যাগ্রহ। তিনি প্রকৃতই এই আন্দোলনের জন্য মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন এমন কি জেলে যেতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন। তাঁকে সহায়তা করবার জন্য পেছনে এসে দাঁড়াল সারা বাংলাদেশ। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীঃ মে মাসে ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে তিনি তাঁর সেই অটুট সঙ্কল্পের কাছে পরাভব স্বীকার করলেন। তিনি Conference-এ সত্যাগ্রহ প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বললেন, "ভেবে দেখলাম Resolution করে কিছু হবে না। একটা কিছু কাজ করতে হবে। সত্যাগ্রহ accept কর।" কিন্তু তাঁকে সমর্থন করলেন একমাত্র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। বিপিনচন্দ্র পাল এবং ফজলুল হক বিরোধিতা করলেন। ভোট নিলে দেখা

গেল যে তিনি পরাজিত হয়েছেন। জীবনে প্রথম পরাজয়। মন ভেঙে গেল। কলকাতায় ফেরবার পথে সারা গাড়ীতে তিনি কারুর সঙ্গে একটি কথাও বললেন না, কলকাতা ফিরে এসে খাওয়াদাওয়াও প্রায় ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এই পরাজয়ের চেয়ে আরও যন্ত্রণার ঘটনা ঘটে গেছে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে—১৯১৯ খৃঃ ২৩শে এপ্রিল। ব্রিটিশ সরকারের নারকীয় লীলার রঙ্গমঞ্চ জালিয়ানওয়ালাবাগ—যে অত্যাচারের কাহিনী পাঠ করলেও ঘৃণায় শিহরিত হতে হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা ঃ—বৈশাখী পূর্ণিমায় আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেক যাত্রী আসে অমৃতসরে। দেবতার মন্দিরে পূজো দিয়ে ফিরে যায় তারা। পুলিশের মাইনে করা হংসরাজ নামে একজন চর (দুঃখের এবং লজ্জার বিষয় তিনি ভারতীয়) প্রচার করলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন সভাসমিতি নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সে কথা প্রচার করে বাগের ভিতরে কোন নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়নি—সুতরাং সরল ও ভক্ত যাত্রীর দল জমায়েত হল বাগের ভিতরে। সভা আরম্ভ হবার পূর্বে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল বিমান। জনসাধারণ ভীত সন্ত্রস্ত ও আশঙ্কিত হয়ে উঠল। সভায় যেসব পুলিশের লোক ছিল তারা চুপচাপ চলে গেল বাগের বাইরে—বাগের প্রবেশপথে মোতায়েন রইল দেড়শো পুলিশ সৈন্য। হংসরাজ একটা রুমাল উড়িয়ে ইঙ্গিত করলেন; শুরু হলো গুলীবর্ষণ ডাইনে, বাঁয়ে ওপরে নীচে সমানভাবে গুলী চালিয়ে চলল—বাগের একটিমাত্র প্রবেশপথ এবং চতুর্দিক উঁচু পাঁচিল ঘেরা, জনতা পালাবার পথ পেল না। পাঁচিল টপকে পালাতে চাইল অনেকে কিন্তু তার পূর্বেই গুলীবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মৃতদেহের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো বাগ! মধ্যরাত্রে প্রদীপ হাতে এলেন এক নারী—নাম তার রতনবাঈ, এসেছেন স্বামীর সন্ধানে! অনেক খুঁজে পেলেন স্বামীর মৃতদেহ—স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। সতীনারীর বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস ভারতের রাজনৈতিক

আকাশে আনলো কালবৈশাখীর রুদ্র তাণ্ডব।

এদিকে পাঞ্জাবের সঙ্গে সারা ভারতবর্ষের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলো—পাঞ্জাবে গমনাগমন নিষিদ্ধ করা হলো। যে দুই-একজন লোক সেই নারকীয়লীলা থেকে কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এসেছিলেন তাঁরাও ঘটনার সঠিক বিবরণ দিতে পারলেন না। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়ে উঠলেন আমাদের নেতৃবৃন্দ। বাংলার চিত্তরঞ্জন গর্জন করে উঠলেন, "ব্রিটিশ সরকার ক্রমশই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের এ অত্যাচার সহ্য করা যায় না।" এই নিষ্ঠুর সংবাদে বিচলিত হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৯ খৃঃ ৩০শে মে তিনি ভাইস্‌রয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে এক পত্র লিখে জানালেন যে মহামান্য সম্রাটের দেওয়া 'নাইট' উপাধি থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোক। রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবে আনন্দিত হলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলার মান রেখেছেন। বিচলিত হয়ে পড়লেন গান্ধীজী। কিন্তু পাঞ্জাবের অধিবাসীবৃন্দ এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্য গান্ধীজীকেই দায়ী করলেন। তাঁরা বললেন "এই নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া সত্যাগ্রহের ফল।" ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সম্মিলনীর থেকে ফিরেই দেশবন্ধু রওয়ানা হয়ে গেলেন অমৃতসরে। তার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করেছিলেন এবং প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল তাঁর। রাজার হালে থাকতেন তিনি। এ সময়েই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। এই মানুষটির জ্ঞান বুদ্ধি ও হৃদয়ের প্রসারতা গান্ধীজীর অন্তর পূর্ণ করে। গান্ধীজী বলেছেন, "আইনের মারপ্যাঁচ বুঝতে, সাক্ষীকে জেরা করে নাজেহাল করতে এবং সামরিক আইনসম্মত শাসন প্রণালীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।" প্রথমেই চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীকে বললেন, "যদি কোথাও আপনার সঙ্গে আমা মত না মেলে যেখানে যা বলবার আছে তা আমি বলবো, তবে এটা স্থির জানবেন বিচারে যা সিদ্ধান্ত হবে তা আমি মাথা পেতে নেবো।" তাঁর একথা শুনে যোগ্য সহযোগী লাভের

আনন্দে গান্ধীজীর হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তাই তাঁর মৃত্যুর পর গান্ধীজী লিখেছেন, "একথা লিখতে গর্বে আজ আমার হৃদয় ভরে উঠছে যে আমার সহযোগীর মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশের চেয়ে বেশী প্রাণ খুলে কেউ আমাকে মেনে নিতে পারেনি।"

অবশ্য প্রশ্ন জাগে মনে যে ভালবাসার যোগ্য মর্যাদা কি তিনি রেখেছিলেন? তা যদি রাখতেন তবে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আদর্শকে, স্বপ্নকে রূপদানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে আসতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি, ফলে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরই বাংলাদেশ আবার নেতৃত্ব হারালো। বহুদিন বাদে সে শূন্য আসন পূর্ণ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এলেন গুরুর উপযুক্ত শিষ্য সুভাষচন্দ্র, কিন্তু তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর বিরোধিতার ইতিহাস, বিশেষ করে ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঘটনা, কারুরই অজানা নয়। যার ফলে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে গঠন করলেন ফরওয়ার্ড ব্লক।

যাক যে কথা বলছিলাম। পাঞ্জাবের এই অমানুষিক নৃশংস ঘটনার তদন্তের জন্য দেশবাসী সরকারের নিকট একটি রয়েল কমিশন প্রার্থনা করেন। কিন্তু সে আবেদন মঞ্জুর করলেন না ব্রিটিশ সরকার। হাণ্টার সাহেবকে সভাপতি-পদে নির্বাচিত করে তাঁরা একটি কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটিতে প্রথম চিত্তরঞ্জন মতিলাল, নেহরু প্রভৃতি আইনজীবীগণ সাক্ষীদের জেরা করবেন স্থির হলো, কিন্তু পরে সে সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়া হলো। সুতরাং রাজনৈতিক গগনের ত্রয়ী চিত্তরঞ্জন, গান্ধীজী এবং মতিলাল নেহরু এই হাণ্টার কমিশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। All India Congress Committee এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করলেন। কমিটিতে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, আব্বাস তায়েবজী এবং জয়াকর। এই কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল হাণ্টার কমিশনের মূল সাক্ষ্যগুলি সম্পর্কে বিচার করে ও নূতন প্রমাণ গ্রহণ করে এ বিষয়ে সঠিক তথ্যের অনু-

সন্ধান করা।

চিত্তরঞ্জন এ সময়ে অমৃতসর পরিদর্শনের ভার নিলেন এবং তাঁর অন্যতম সহযোগী হন মতিলালপুত্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতে অন্যতম জননায়ক জহরলাল নেহরু। এ সময়কার কথা জহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :—"তাঁহার সহিত একত্রে এবং তাঁহার অধীনে কার্য করার সুযোগ আমার জীবনে এই প্রথম আসিল। মূল্যবান অভিজ্ঞতালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও বর্ধিত হইল। আমরা তথাকথিত বাগটি বহুবার পরিদর্শন করিয়াছি এবং ইহার প্রত্যেক অংশ তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি।"

যে ইংল্যাণ্ড নারীজাতির সম্মান দেখানোর জন্য মৌখিক শিষ্টাচারে অবনত হয়ে পড়ে—তাদের নারীজাতির প্রতি বীভৎস এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে রচনা করলো এক কলঙ্কপূর্ণ অধ্যায়। কমিটির রিপোর্ট লওয়ার সময় অসহায় নারীদের মুখে সেই নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনে চোখের জল রোধ করতে পারলেন না মানবদরদী চিত্তরঞ্জন। অপর দিকে এই পৈশাচিক ঘটনার বিবরণ শুনে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর ওষ্ঠাধর। এমন নিষ্ঠুরও মানুষ হতে পারে? মৃতদেহে স্তূপাকার হয়ে উঠেছিল সেই বাগটা এবং এই ঘটনা ঘটবার ছয়মাস পরেও সেই মরণযজ্ঞশালা থেকে মুছে যায়নি রক্তের দাগ। হিন্দু মুসলমানের রক্তে রাঙা সেই পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে যে শপথ সেদিন চিত্তরঞ্জন অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন—সুদীর্ঘকাল বাদে তাঁর সেই শপথের স্বপ্ন রূপ লাভ করলো তাঁরই যোগ্যশিষ্য সুভাষচন্দ্রের জীবন ও বাণীতে।

১৯২০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কাশীতে এন্‌কোয়ারী কমিটির রিপোর্ট স্বাক্ষর করা হলো। স্বাক্ষর করলেন চিত্তরঞ্জন, গান্ধীজী এবং আব্বাস তায়েবজী। মতিলাল নেহরু All India Congress-এর সভাপতি-রূপে স্বাক্ষরপত্রটি নিয়েছিলেন।

তাঁদের দাবি ছিল :—লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের পদত্যাগ ও ডায়ার

প্রভৃতির পুনরাহ্বান ও বিচার, রৌলট আইন প্রত্যাহার ও সামরিক আইনে প্রদত্ত জরিমানার ফেরৎ প্রদান।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত সরকার কর্তৃক এই দাবিগুলি বাতিল হলো এবং অত্যাচারীদিগকে দণ্ডবিধান না করে উপরন্তু তাদের পুরস্কার দেওয়া হলো—আর তাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য গঠিত হলো তহবিল। এডওয়ার্ড টমসন বলেছেন যে জেনারেল ডায়ার মনে ভেবেছিলেন যে বাগ থেকে লোক বের হবার অন্য রাস্তা আছে। অতএব গুলী চালানোটা তার এমন কি অপরাধ, যেন এই ধরণের মনোভাব আর কি! এই ডায়ারের কথা জহরলাল তাঁর আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন, "আমি অমৃতসর হইতে রাত্রির ট্রেনে দিল্লী আসিতেছিলাম। কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উপরের একখানি বার্থ ব্যতীত আর সবগুলিই নিদ্রিত যাত্রীরা দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি উপরের খালি বার্থ দখল করিলাম। প্রভাতে দেখিলাম আমার সহযাত্রী সকলেই সামরিক কর্মচারী—তাঁহাদের মধ্যে একজন বড় গলায় অহঙ্কারের স্বরে কথা বলিতেছেন। আমার চিনিতে বিলম্ব হইল না যে ইনিই ডায়ার—জালিয়াওয়ালাবাগের বীর। তিনি অমৃতসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন। কেমন করিয়া সমস্ত শহর তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল, বিদ্রোহী নগরীকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিবার কি উৎসাহ তিনি অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কেবল করুণা-বশতঃই তাহা করেন নাই। তাঁহার নির্মম হাবভাব ও কথাবলার ভংগীতে আমি মর্মাহত হইলাম।"

এমনি করে এক ইংরেজ রাজপুরুষের নিষ্ঠুরতা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এক যুগ এগিয়ে দিল।

১৯১৯ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল অমৃতসরে। এই অধিবেশনে গান্ধীজীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বিরোধ বাধল—পাঞ্জাবের এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতা চিত্তরঞ্জনের অন্তর স্পর্শ করেছিল খুবই গভীরভাবে—সুতরাং অমৃতসর

অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন আনলেন সম্পূর্ণ অসহযোগিতার প্রস্তাব। অপর পক্ষে গান্ধীজী আনলেন সহযোগিতার প্রস্তাব—সুতরাং এই দুই নেতার অভিমতকে তো আনতে হবে একমতে—এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করলেন লোকমান্য তিলক। এই বলে আপোষ হলো যে সরকারের যে সব ব্যবস্থাকে আমরা স্বরাজ লাভের উপায় বলে ভাববো তার সংগে সহযোগিতা করবো—তার যে উপায় সমূহকে স্বরাজ লাভের পথে বাধাস্বরূপ বলে মনে করবো অসহযোগিতা। দু-পক্ষই এ-রায় মেনে নিলেন। সভায় বক্তা চিত্তরঞ্জন উঠে দাঁড়ালেন—তিনি বললেন ঃ—

"The view with which I have compromised is this that co-operation when necessary to achieve our cause but obstruction when that is necessary for that advancement of our cause. The words are simply these, that we work the reform so far, as it may be possible, for the early advancement of full responsible Government. We are not opposed to co-operation, if co-operation helps us to attain that we are not opposed to obstruction, plain down right obstruction, when that helps to attain our political goal."

বঙ্গানুবাদ ঃ—এই মতের সংগেই আমি আপোষ করবো যখন সহযোগিতা আমাদের উন্নতির উপায় স্বরূপ বলে মনে করবো তখন তা অবশ্যই করবো। আমাদের এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতি দ্রুত দায়িত্বশীল সরকার সংগঠন। যদি আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হয় তবে অসহযোগিতার পথে আমরা কখনই বাধা দেবো না।

এই সময়ে অমৃতসরে থাকাকালীন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে তিনি রাখিয়া নামক স্থানে পল্লী সংগঠনে যুক্ত হ'ন পরে সময় না থাকায় পুত্র চিররঞ্জনকে এই কাজে নিয়োগ করেন। এই

পল্লী উন্নয়নের স্বপ্ন ছিল তাঁর মনের গভীরে—যার প্রকাশ আমরা দেখেছি তাঁর ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর বক্তৃতায়।

রাজনৈতিক আকাশে আবার ঝড় আনলো মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলন। মিত্রশক্তিরা তুর্কীকে যে সন্ধির সর্ত দান করলো তাতে লুব্ধ হয়ে উঠল মুসলমান সম্প্রদায়—এরই ফলস্বরূপ সুরু হলো খিলাফৎ আন্দোলন। গান্ধীজী মুসলমান মৌলবীদের বললেন যে তাঁরা যদি অহিংসা ভাবে কাজ করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন তাহলে তিনি তাদের সহিত যোগ দেবেন। কিন্তু অহিংসা সম্বন্ধে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ বা আপোষের ভাব থাকতে পারবে না।

মৌলবীদের পক্ষে এই নীতি বুঝতে পারা খুব সহজ ছিল না তবুও তাঁরা গান্ধীজীর মত মেনে নিলেন।

অবশ্য তাঁরা একথা বললেন যে মূলনীতি রূপে নয় কৌশল রূপেই তাঁরা এই নীতি পালন করবেন—কেননা মহৎ উদ্দেশ্য পালনের জন্য বলপ্রয়োগ মুসলমান ধর্মে নিষিদ্ধ নয়।

এরপর এই আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশে জায়গা করে নিল—এ আন্দোলনের পক্ষে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন চিত্তরঞ্জন। তার কারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর চিরদিনই ছিল আন্তরিক সু-গভীর প্রীতি।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর Special Congress-এর অধিবেশন বসল কলকাতায়—এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। আবার সহযোগিতা ও অসহযোগিতার প্রস্তাব নিয়ে মতান্তর বাধল চিত্তরঞ্জন ও গান্ধীজীর মধ্যে।

গান্ধীজী বললেন, এই সময়! আর একটু দেরী করা চলবে না এখনই ব্রিটিশ সরকারের সংগে অসহযোগ করতে হবে। আর তা পালনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি নির্দেশ করতে বললেন :—

(১) জাতীয় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা

(২) সালিশী আদালতের প্রতিষ্ঠা

(৩) সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং সহযোগিতা বর্জন নীতি সম্পর্কে নির্বাচনকারীগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা।

(৪) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী পরিত্যাগ

(৫) সরকারী লেভি ও দরবার প্রভৃতির সহিত সংস্রব না রাখা।

(৬) শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া।

(৭) ক্রমশঃ ইউরোপায় Bank ও ব্যবসা হইতে ভারতীয় মূলধন ও শ্রমজীবী সরাইয়া লওয়া।

(৮) ভারতবর্ষের বাহিরে সৈনিক, কেরানী ও শ্রমজীবী হিসাবে কেহ সরকারী কর্ম গ্রহণ না করে সে বিষয়ে ভারতীয়দের নিষেধ করা।

(৯) স্বদেশী ব্রত অবলম্বন করা।

(১০) আন্দোলন সফল করিবার জন্য তিলকস্বরাজ ভাণ্ডার নামক একটি ধন ভাণ্ডার গঠন করিবার জন্য বিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা।

এই সময়েরর একটি শোকাবহ ঘটনা যে এই এর পূর্বে লোকমান্য তিলকের মৃত্যু ঘটেছে—সুতরাং সভায় প্রথমেই তাঁর জন্য শোক প্রস্তাব গৃহীত হলো।

যাহোক—মহাত্মা গান্ধীর এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না চিত্তরঞ্জন। তিনি বললেন, সব কিছুর জন্যই মনের প্রস্তুতি দরকার—দেশকে তথা দেশবাসীকে প্রস্তুত হবার জন্য পাঁচ বৎসর সময় দেওয়া হোক, তারপর শুধু অসহযোগিতাই নয়, ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে আইন অমান্য করা যাবে। কিন্তু তা এখনই নয়। তাঁর এই কথায় বিরুদ্ধবাদীরা মন্তব্য করলেন, উনি এখনই প্র্যাকটিস্ ছাড়তে রাজী নন।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তাঁর সম্বন্ধে অবিচল—তিনি বলেন যে Congress যদি অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন না করেন। তবে তিনি কংগ্রেস থেকে বাইরে গিয়ে অসহযোগ আন্দোলন করবেন। তিনি বললেন "Had India sword today she would have drawn it."

দুই নেতার মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা হলো—কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাত্মার প্রস্তাবই গৃহীত হলো। যদিও সভাপতি লাজপৎ রায় পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনকে সমর্থন করলেন কিন্তু সেদিন ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে গান্ধীজীর অপ্রতিহত প্রাধান্য ও ক্ষমতা —লোকে বিনা বিচারে গান্ধীজীর অনুসরণ করে সুতরাং চিত্তরঞ্জন পরাজিত হলেন। কিন্তু স্বমত পরিবর্তনে তিনি এখনই রাজী হলেন না—এমন কি মতিলাল নেহরু পর্যন্ত গান্ধীজীর ভাবশিষ্য হয়ে পড়লেন কিন্তু তিনি আপন মত ও নিষ্ঠায় অবিচল হিমালয় পর্বতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেন। পেশাদারী রাজনীতি চিত্তরঞ্জন কোনদিনই ছিলেন না। আপন হৃদয়ের স্বপ্ন ও সত্যকে রূপদানই ছিল তার জীবনের অন্যতম ব্রত।

১৯২০ নাগপুর কংগ্রেস।

এলো স্মরণীয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ—চিত্তরঞ্জনের জীবনে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণের জীবন। দু-বছর পূর্বের ঘটনা জনৈক সন্ন্যাসী তাঁর হাত দেখে বলেছিলেন, "তুমি ঐশ্বর্য ভোগ বৎসরাধিকালের মধ্যেই পরিত্যাগ করবে।" সত্য হলো সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎবাণী—! 'সাগর সংগীতে' কবি গেয়েছিলেন :—

"যে দিন ডাকিলে তুমি গভীর গর্জনে
অনন্ত রাগিনী ভরা ধ্বনিতে তোমার
হৃদয় মন্থন ভরা বিপুল তর্জনে
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার।"

সেই আহ্বানের বাণী তিনি শুনেছিলেন নাগপুর কংগ্রেসে, তাই দেশমাতৃকার আহ্বানে তাঁর চরণে দেহমন প্রাণ ঐশ্বর্য সর্বস্ব দিলেন—স্বপ্ন শুধু অগণিত মানুষের মুক্তি। বিজয় রাঘবচারিয়ার নেতৃত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল নাগপুরে। বিজয় রাঘবচারিয়া গান্ধীজীর এই অসহযোগ নীতিকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারলেন না। কারণ তাঁর মনে এর দ্বারা জালিয়ানওয়ালাবাগ বা খিলাফৎ হত্যা-

কাণ্ডের কোন প্রতিকার হবে না, কিন্তু ছাত্ররা বিদ্যালয় বর্জন করলে এবং উকিলরা আদালত পরিত্যাগ করলে দেশ ক্রমশঃ বর্বরতার পথে এসে দাঁড়াবে। কিন্তু সভাপতির এই আপত্তি টিঁকল না কারণ এবার স্বয়ং চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীকে সমর্থন জানালেন। তিনি বললেন, 'স্বরাজ লাভই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, খিলাফৎ ও পাঞ্জাব গৌণ উদ্দেশ্য। গান্ধীজী যদি আমার একথা মেনে নেন, তবে আমি তাঁর সংগে একমত হব।' গান্ধীজী চিত্তরঞ্জনের এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে মেনে নেন এবং খসড়াটি মুসাবিদার ভার চিত্তরঞ্জনের ওপর দেন।

এই নাগপুরের প্রস্তাবের কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। অনেকে নাগপুরের এই প্রস্তাবকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু এই বিশেষত্বসমূহ নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে প্রস্তাবটি কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবের চেয়ে কোন অংশেই দুর্বল নয়।

এই নাগপুর কংগ্রেস প্রস্তাবের কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল এই ঃ—

(১) স্বরাজলাভ সম্পর্কে কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবে স্পষ্ট কোন কথা ছিল না। পাঞ্জাব ও খিলাফৎ সমস্যাই বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নাগপুর কংগ্রেসে স্পষ্ট করেই বলা হলো, বর্তমান সরকার আমাদের বিশ্বাস হারিয়েছে এবং সেইজন্য আমরা স্বরাজলাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি।

(২) কলকাতার প্রস্তাবে অসহযোগের কোন স্পষ্ট রূপ ছিল না, কোন বিশেষ ত্যাগের কথা ছিল না—যেন কংগ্রেস অনুশাসন করছে যে উকিলরা ও ছাত্ররা আদালত ও স্কুল ছেড়ে দেয়।

আর নাগপুরের প্রস্তাবে স্পষ্টই একথার উল্লেখ ছিল effective steps should be taken—এই বয়কট সাফল্যের জন্য প্রবল উদ্যম করতে হবে।

(৩) কলকাতায় ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করে বয়কট করতে হবে এইরূপ কথা ছিল ও তা কার্যে পরিণত হয়নি। নাগপুরে প্র্যাকটিস সাসপেণ্ড করে—উকিল ব্যারিস্টাররা যাতে আত্মনিয়োগ করে, এই

প্রস্তাব অধিকতর কার্যকরী হয়েছে।

(৪) কলকাতার প্রস্তাবে যৎসামান্য ত্যাগ বা ক্ষতির উল্লেখ ছিল আর নাগপুরের প্রস্তাবে Civil disobedience-এর কথা ছিল। অসহযোগ আরম্ভ করে রাজস্ব প্রদানে অসম্মতি পর্যন্ত সমস্ত প্রস্তাবই দেশবাসীর পক্ষে গ্রাহ্যনীয় তবে কখন কোনটি অবলম্বন করতে হবে তা Congress-এর অনুমতি সাপেক্ষ।

ইহার বলেই সভাপতি ও স্বেচ্ছাসেবক সম্বন্ধে আইনের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে বাঙলা দেশ থেকে ১৬০০০ হাজার সত্যাগ্রহী জেলে গিয়েছিল।

(৫) কলকাতার প্রস্তাবে ছাত্রদের ধীরে ধীরে বিদ্যালয় ত্যাগের কথা ছিল। কিন্তু নাগপুরের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল—১৬ বছর থেকে আরম্ভ করে ছাত্রগণ স্কুল ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করুক কিংবা স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করুক। গান্ধীজী ও চিত্তরঞ্জন উভয়েই অসহযোগের প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে তাঁদের এই যুক্ত প্রস্তাব গৃহীত হলো। অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করলেন চিত্তরঞ্জন।

এখানে একটা কথা না বলে পারছি না, রাজনৈতিক জগতে অসহযোগ মন্ত্রের জন্মদাতা গান্ধীজী, একথা রাজনীতিবিদ্‌রা চিরকাল বলে এসেছেন। কিন্তু এখানে একটু লক্ষ্য করলেই কি আমরা দেখতে পাই না, যে রাজনৈতিক দিগন্তে প্রথম অসহযোগ মন্ত্র আনলেন চিত্তরঞ্জন।

১৯১৯ সালে ডিসেম্বরে অমৃতসরে কংগ্রেসে প্রথম অসহযোগ মন্ত্র উচ্চারণ করলেন চিত্তরঞ্জন। অতএব নাগপুরের কংগ্রেসে গান্ধীজীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে মনপ্রাণ সমর্পণ করে গান্ধী ভক্ত শিষ্য হয়ে গেলেন চিত্তরঞ্জন, একথা কি মেনে নেওয়া যায়? দেশের পরিস্থিতি বুঝেই তিনি তাঁর মত রূপান্তর এবং পরিবর্তন করেছিলেন মাত্র। তাছাড়া দু-নৌকোয় পা দিয়ে তাঁর মনও

তৃপ্ত ছিল না, তাই আইন ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করেননি। এ সম্পর্কে তিনি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, "লোকে ভাবে আমি ব্যাক্তিবিশেষের প্রভাবে পড়ে ঝোঁকের মাথায় প্র্যাকটিস্ ছেড়েছি। তাঁরা জানেন না যে এ আমার বহুদিনের বাসনা।"

গান্ধীজী কলকাতার এক ছাত্রসভায় বক্তৃতাকালে বলেছিলেন, 'আমি জানতাম তোমরা চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বের জন্য বসিয়া ছিলে।' সহযোগী হিসেবে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ছিল ঠিকই, তবে কাউকে অনুসরণ বা অনুকরণ করাকে চিত্তরঞ্জন জীবনের কোন ক্ষেত্রেই বরদাস্ত করতেন না। আপন অন্তরে সুনিবিড় দেশপ্রেমের গভীর বাণী পৌঁছেছিল বলেই জীবনের সব সম্পদ ও ঐশ্বর্য থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনলেন। কারণ নিজের মনের মুক্তি না ঘটলে কি একটা জাতিকে মুক্ত করা যায়?

এবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এই অধিবেশনের ইতিহাস অবিস্মরণীয় হয়ে রইলো দুই মহামানবের মহামিলনে।

কলকাতা ফিরে এলেন চিত্তরঞ্জন—মনে স্থির সঙ্কল্প, আইন ব্যবসায় ত্যাগ করবেন। এ দিকে সরকারের পক্ষ থেকে মিউনিসন বোর্ডের মামলার জন্য আট লক্ষ টাকা নিয়ে সাধাসাধি করলেন—তিনি হেসে বললেন, 'সরকারের পক্ষে আট লক্ষ টাকা দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখতে পারলে ভালই হয়—কিন্তু আর নয়।' দশ লক্ষ টাকার প্রস্তাব নিয়েও এলো মক্কেল কিন্তু তাঁদেরও তিনি সবিনয়ে ফিরিয়ে দিলেন। দু-নৌকায় পা দিয়ে আর তিনি চলবেন না। এবার পুরোপুরি দেশের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেবেন। বাঙলা মায়ের মুক্তিকামী সন্তান নিলেন নেতার আসন—অবশ্য তিনি নিজেকে নেতা বলে কোনদিনই ভাবতেন না তাঁর বুদ্ধি, শক্তি, সাহস, নিষ্ঠা ও প্রেমই তাঁকে এ আসনে বসিয়েছিল।

আইন ব্যবসা ত্যাগ করবার সংগে সংগে দূরে সরিয়ে দিলেন

অভ্যস্ত ভোগবিলাসের জীবন। কারণ আইন ব্যবসা ত্যাগের সংগে সংগে বন্ধ হয়ে গেল মাসে ৫০।৬০ হাজার টাকা আয়। তিনি বাসন্তী দেবীকে বললেন, "জানি তোমাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে কিন্তু কি করবো? আমি যে আর এর মধ্যে থাকতে পারছি না।" বাসন্তী দেবী যোগ্য সহধর্মিণী, উত্তর দিলেন, "অর্থকে পৃথিবীর বড় সম্পদ বলে মনে করি না তা তো তুমি জানো। তোমার এই সঙ্কল্পে আমিও তোমার পাশেই রয়েছি। দৈহিক আরাম যদি তুমি ছেড়ে দিতে পার তবে আমি তোমার স্ত্রী হয়ে কি তা পারবো না?" একমাত্র পুত্র ভোম্বলকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানালে সে হাসিমুখে বললো, "বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাজ কর, আমাদের জন্য ভেবো না।"

এমন স্ত্রী ও পুত্র পেয়েছিলেন বলেই চিত্তরঞ্জন হয়েছিলেন 'দেশবন্ধু'—কিন্তু এঁদের ত্যাগের কথা নিয়ে ইতিহাস লেখা হবে না—তার কারণ চিত্তরঞ্জনের জীবনের সংগে একাত্ম হয়ে মিলে গেছেন তাঁরা —চিত্তরঞ্জনের বহু বিচিত্র জীবনে মঙ্গলপ্রদীপ হ'য়ে জ্বলেছেন বাসন্তী দেবী—জীবনের নানাস্তরের মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতায় ভরা জীবন!

চিত্তরঞ্জনের জীবনের রঙ্গমঞ্চে এবার পটপরিবর্তনের পালা—এতদিন জীবন ছিল সুখ, ঐশ্বর্য ও বিলাসিতায় রামধনুর সপ্তরঙে রাঙা জীবন। এবার তা রূপান্তরিত হলো ত্যাগের গৈরিক বর্ণে।

বাড়ী থেকে সমস্ত বিলাসিতা অন্তর্হিত হলো—উঠে গেল সমস্ত বাবুয়ানা, বেয়ারা, বাবুর্চি। ছেড়ে দিলেন সব নেশার জিনিস। অন্য কিছুর জন্য তাঁর কষ্ট হয়নি, শুধু কষ্ট হয়েছিল বড় তামাকটা ছাড়তে। তাই যে লোকটি তামাক সাজতো, ওকে টাকা পয়সা দিয়ে সর্বাগ্রে বিদায় করে দিলেন, পাছে তাকে দেখলে তামাক খাবার ইচ্ছে হয়। সাজপোষাকেও ছিল তার বিলাসিতা—যদিও সাহেবী পোষাক তিনি আদালত ছাড়া ব্যবহার করতেন না, কিন্তু দেশী পোষাক হ'লেও তা হতো সর্বোৎকৃষ্ট—এবার তার স্থান নিল সাধারণ খদ্দরের খাটো

ধুতি—সংগে সংগে বাসন্তী দেবীও তাঁর মিহি জমির কাপড় ত্যাগ করে পরিধান করলেন খদ্দর। আইন পুস্তকের লাইব্রেরীটি পাঠিয়ে দিলেন জামাই-এর বাড়ী।

প্রচলিত অভ্যাসকে ছাড়ার জন্য শরীর খুব ভেঙে পড়ল। ডাক্তাররা বললেন, একটু দুধ খেতে—কিন্তু তা তিনি কেমন করে খাবেন? তিনি যে ভুলতে পারছেন না সেইসব দরিদ্র অসহায় মানুষদের কথা যারা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। আইনব্যবসা ত্যাগ করে নিজের জন্য বা নিজের পরিবারের জন্য ভাবনা হলো না, কিন্তু ভাবনায় পড়লেন এইসব অসহায় মানুষদের নিয়ে—যারা তাঁর সাহায্যে প্রতিপালিত হতো। পরে এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিলেন, 'আমি না থাকলে যিনি ওদের দেখতেন, তিনিই ওদের দেখবেন।'

অসহযোগ মন্ত্র নিলেন চিত্তরঞ্জন—তাঁর এই বিরাট ত্যাগ দর্শনে সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার সংগে তিনি গ্রহণ করলেন নেতার আসন। যদিও নেতা তিনি কোনদিন হতে চাননি এবং নেতা বলতে যে মনোভাব গান্ধীজীর সাধ্য ছিল, তা চিত্তরঞ্জনের মধ্যে কোনদিন আদৌ ছিল না। নেতা বলতে ডিপ্লোম্যাট বা autocrat-এর মনোভঙ্গী তাঁর কোনদিন ছিল না। জীবনে কোনদিন তিনি তা করেননি। নিজের মতকে সকলের মত বলে চালাবার বা নিজের মতবাদকে সহযোগীদের জোর করে মেনে নিতে বলার মত মনোবৃত্তিও তাঁর ছিল না কোনদিন। প্রত্যেকটি কাজ তিনি সকলের মতামত নিয়ে করেছেন—এ ব্যাপারে তাঁর কাছে ছোট বড় ছিল না।

এবার পুরোপুরি সুরু হলো রাজনৈতিক জীবন। সফল হলো তিলকের ভবিষ্যৎবাণী। তিনি বলেছিলেন, "আমার আশা হয় এমন একদিন আসবে যেদিন দেশগৌরব চিত্তরঞ্জন তাঁর সমস্ত শক্তি স্বদেশ সেবায় নিয়োজিত করবেন এবং তাঁর স্বদেশপ্রীতি উজ্জ্বল প্রদীপের মত ভারতবাসীকে পথ দেখিয়ে দেবে।"

তাঁর এই অভূতপূর্ব ত্যাগ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কমিশনের সভাপতি স্যার মাইকেল স্যাডলার লিখেছিলেন, "চিত্তরঞ্জনের অদ্ভুত ত্যাগ জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। কোন দেশে কোন সময়ে কেহ এত উপার্জন করিয়া দেশের কাজে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে নাই, ভারতবাসী তাঁহার অনুকরণ করিতে পারিলে ধন্য হইবে।"

একদিন আইনজীবী হিসেবে পড়ে ছিলেন পথপ্রান্তে—লক্ষ্মী ও সরস্বতী যেদিন হাত ধরাধরি করে তাঁর জীবন নাট্যে এসে দাঁড়ালেন—তুলে দিলেন আইনজীবী জীবনের হিমালয় শিখরে। কিন্তু ভারতমাতা জগৎ-জননী দুর্গার রূপ নিয়ে এসে দাঁড়ালেন এই মহামানবের জীবনে, চোখে তাঁর জল, বুকে তাঁর শৃঙ্খলবেদনা, যেন বললেন, 'আমার মুক্তির চেয়েও বড় হলো তোর যশ, সম্মান, অর্থ?' ফেলে দিলেন রাজৈশ্বর্য, জীবনের সব ভোগসুখ। ঐশ্বর্যপূর্ণ শিবের দারিদ্র্য নিয়ে জনতার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন—বাঙলাদেশের মানুষ তৃপ্ত হয়ে ভাবলো, এতদিনে আমরা নেতা পেয়েছি—এঁর যে অন্তরভরা প্রেম, মহাপ্রভুর মত যিনি আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করতে পারেন তিনিই তো সর্বোত্তম মানুষ—তাই তাঁর পূজায় মানুষ দিল তাঁদের ভালবাসার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—জীবন। আর তাঁদের ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁকে ভূষিত করলো 'দেশবন্ধু' উপাধিতে।

কোন এক ছাত্রসভায় ছাত্রগণ চিত্তরঞ্জনকে 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করলেন। তিনি এর উত্তরে বললেন, 'এই মিথ্যা সম্মানে যদি আমার মস্তক ভারাক্রান্ত হয়, তবে এই ভার তো শির বহন করিতে পারিবে না। একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে।'

এরপর ১৮ই জানুয়ারী ১৯২০ সালে ওরিয়েন্ট্যাল জীবন বীমা কোম্পানীর সেক্রেটারী বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। দেশবন্ধু কথার অর্থ চণ্ডাল—তিনি বললেন, 'পরাধীন জাতি তো চণ্ডালেরও অধিক।' তাছাড়া সমাজের এই স্তরের লোকের তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল। ছিল এদের মধ্যে গিয়ে থাকবার এবং

এদের মঙ্গল করবার আন্তরিক ইচ্ছা, অতএব এই উপাধিতে তিনি খুসীই হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বললেন, শৃঙ্খল-নিপীড়িত জাতি তো চণ্ডালেরও অধিক।

স্বপ্ন, সঙ্কল্প ও বাসনায় ভরা এক জীবন তাঁকে দিয়েছিলেন ভাগ্য-বিধাতা। কিন্তু সেই জীবন প্রদীপে ইন্ধন দিয়েছিলেন বড় কম—তাই দমকা হাওয়ায় অতি অকালে এবং জাতীয় জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনের দিনে তা নিভে গেল অতি অকস্মাৎ। তাই অনেক স্বপ্নই তাঁর সফল হয়নি—রাজনৈতিক প্রতিকূলতার সংগ্রামেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে জীবন।

অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করার পরই তাঁর মনে হলো কর্মীর প্রয়োজন। তিনি আহ্বান করলেন দেশের ছাত্র সমাজকে। কলকাতার রিপন স্কোয়ারে ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্রদের নিয়ে তিনি সভা করলেন। বললেন;—বাঙলার তরুণগণ, তোমরাই তো দেশের একমাত্র আশা, তবে এখনও নিশ্চেষ্ট কেন? তোমরা যদি বাস্তবিক মানুষ হও, যদি মনুষ্যের আত্মা তোমাদের হৃদয়ে থাকে, যদি মানুষের রক্ত তোমাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয় তবে স্বরাজ সংগ্রামে কেন তোমরা পরাঙ্মুখ? জানিও, স্বরাজলাভের ব্রতে যদি তোমরা প্রতিবন্ধক হও, যদি তোমাদের ঔদাসীন্যে আমরা স্বরাজ লাভে বঞ্চিত হই, তোমাদের এই কাপুরুষতার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিবে। আর তর্ক করিও না, মুক্তি চাও তো আর যুক্তি চাহিও না—ছাড়িয়া এসো গোলামখানা, মুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হও। কাজের তো অভাব নাই, কাজীরই অভাব। শীঘ্র এসো, মনে রেখো, তোমরা সকলেই সরকারী চাকুরী পাইবে না।

তাঁর এই আহ্বানে ১৯২১ সালের ১৪ই জানুয়ারী ছাত্রগণ স্কুল, কলেজ পরিত্যাগ করে দলে দলে দেশবন্ধুর স্বরাজ পতাকাতলে এসে সমবেত হলো। কলকাতার সব কলেজের ছাত্ররা বিনা দ্বিধায় কলেজ পরিত্যাগ করলো। ছাত্রদের এই উদ্দীপনায় দেশবন্ধুর অন্তর

আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, একদিন গান্ধীজীও তাদের ঐ আহ্বান জানিয়েছিলেন কিন্তু তখন তারা নীরব ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় মির্জাপুর পার্কে ছাত্রদের নিয়ে চলত তাঁর আলাপ আলোচনা। এরপর ২৭শে জানুয়ারী ছাত্রদের একটি সমবেত সভায় নিম্নলিখিত ভাষণ দান করেন। তিনি বললেন :—

"জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাইবে প্রচুর স্বার্থত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন জাতিই জয়লাভ করে নাই। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই দৃষ্ট হয় সশস্ত্র যুদ্ধের সহায়তায় কোন রাজশক্তিকেই খর্ব করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু আত্মা তো স্বাধীন, সে তো কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিতে পারে না। তাহাকে বাঁধে, সাধ্য কার? ইউরোপের সভ্যতার দিকে তাকাইও না, ঘরের দিকে তাকাও। দেখিবে কী রত্ন এখানে নিহিত আছে। যে-শিক্ষায় তোমাদের দাসত্ব-বন্ধন আরও দৃঢ় করে, আমি চাই, সে-কুশিক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দাও। ওঠ, জাগ, আর মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিও না। পরাধীনতার দুর্দশা একবার ভাবিয়া দেখো, আর স্বাধীনতার পথ সুগম করিয়া দৃঢ়ভাবে তাহা সুরক্ষিত কর।"

এর পরই ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ঠা তারিখে ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন ও জাতীয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন সুভাষচন্দ্র। এর উদ্বোধন করেন মহাত্মা গান্ধী। কালিঘাটেও আর-একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

এইভাবে চিত্তরঞ্জন 'দেশবন্ধু' হয়ে স্বরাজ সংগ্রামের প্রথম স্তরে অতি সাফল্যের সঙ্গেই জয়লাভ করেন। এখানে আর একটি কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না—এই যে সঙ্ঘবদ্ধতার ক্ষমতা, যা আমাদের দেশে কেবল দল আর দলাদলির সৃষ্টি করেছে, সেই সঙ্ঘবদ্ধতাকে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রথম আনলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। United we stand কথাটিকে তিনি সার্থক রূপদান করে গেছেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনে। কিন্তু আধুনিক যুগে এই United-এর ফলই হয়েছে

divided—এক দল থেকে বহু দলের সৃষ্টি। অতএব আমাদের পতন যে অনিবার্য, সে কথা আর বুঝিয়ে বলার দরকার কি? এরপর এপ্রিল মাসে বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। দেশ-বন্ধু এলেন বরিশালে। এখন তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই ঘুমন্ত নগরীর মনে স্বাধীনতার সোনার কাঠি স্পর্শ করে দেওয়া—তার জন্য হোক না কেন বন্ধু বিরোধ, সবাই তাঁকে ছেড়ে যাক্, তবুও 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' সঙ্কল্প নিয়ে অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তিনি। অবশ্য একলা তাঁকে চলতে হয়নি, জীবনে চলার পথে পেয়েছেন অসংখ্য সহকর্মী, সহযোগী ও বন্ধু—কারণ প্রেমের বলে হৃদয় জয় করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল অসাধারণ। আর এই ১৯২১ খ্রীঃ জুলাই মাসেই তিনি পেলেন ছাত্র-প্রতিম সহযোগী সুভাষচন্দ্রকে।

সুভাষচন্দ্র তখন বিলেতে—দেশের খবরাখবর দাদা শরৎচন্দ্র বসুর চিঠিতে পান—তাছাড়া নাগপুর সংগ্রামের ঢেউ সেই সাগর পাড়ে গিয়েও পৌঁচেছে—হৃদয় তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠল। I. C. S পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন এবং কেমব্রিজ থেকে মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ সহ B. A. পাশ করেন। কিন্তু বিদেশীর গোলামী করতে তাঁর অন্তর সায় দিল না। তিনি দাদাকে লিখে জানালেন, দেশে ফিরে এসে তিনি দেশবন্ধুর সংগে স্বদেশ সেবার ব্রত গ্রহণ করতে চান—১৯২১ খ্রীঃ ১৬ই জুলাই ভারতের মাটিতে ফিরে এলেন তিনি। ভারতমাতা অলক্ষ্যে তাঁর এই সুযোগ্য সন্তানটিকে আশীর্বাদ জানালেন।

ফিরে এসে গেলেন গান্ধীজীর সংগে দেখা করতে কিন্তু গান্ধীজী তাঁর প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারলেন না।

এসময়কার কথা নেতাজী তাঁর "Indian Struggle"-এ লিখেছেন :—"Depressed and disappointed as I was, what was I to do? The Mahatma advised me to

report myself to Deshbondhu C.R. Das on reaching Calcutta."

কলকাতা পৌঁছে তিনি দেশবন্ধুর সংগে সাক্ষাৎ করলেন। অবশ্য ছাত্র জীবনে যখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তখন একদিন নিরুপায় হয়ে রাত্রিবেলা ছুটে এসেছিলেন দেশবন্ধুর কাছে—এই ছেলেটির চেহারা ও সাহস দেখে দেশবন্ধু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন—আর সুভাষচন্দ্র দেখেছিলেন ব্যারিস্টার C.R. Das-কে যিনি রাজার হালে থাকেন, রাজার মত সাজ-পোষাকে বিলাসী। কিন্তু আজ খদ্দরের মোটা কাপড়, আর চটিজুতা পায়ে, ত্যাগের এক জলন্ত মূর্তি দেখে তরুণ সুভাষ শ্রদ্ধায় অবনমিত হলেন—তাঁর মনের সব সংশয় সন্দেহ দ্বিধা দূর হয়ে গেল। তিনি এ সম্পর্কে তাঁর "Indian Struggle"-এ লিখেছেন :—"During the course of our conversation I began to feel that here was a man, who formed what he was about—who ould give all that he had and who could demand from others all they could give—a man to whom youthfulness was not a shortcoming but a virtue. By the time our conversation came to an end, my mind was made up. I felt that I have found a leader."

এমনি করে সংশয়াকুল বিক্ষুব্ধ-তরঙ্গ সুভাষ ক্ষান্ত হলেন মহাসাগরের তীরে এসে। সুভাষচন্দ্র হলেন তাঁর অন্যতম শিষ্য, যাঁকে বোধ হয় তিনি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন বললেও কম বলা হয়। তাঁদের এ সম্পর্ক কেবল কর্মের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রইল না—পারিবারিক ক্ষেত্রেও অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করলো।

তাই মনে হয় দেশবন্ধু আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসের পাতায় যে কেবল দান, ত্যাগ, দেশভক্তি ও সাহসের এক উজ্জ্বল

দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন, তাই নয়; আমাদের জাতীয় জীবনে তিনি দিয়ে গেছেন যোগ্য সহকর্মী সুভাষচন্দ্রকে। দেশবন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত না হলে সুভাষচন্দ্রের জীবনের কোন্ পথে চালিত হতো জানি না, তবে এটুকু নিশ্চয় করে বলতে পারি—সুভাষচন্দ্র নেতাজী হতেন না। দেশমাতৃকার মুক্তির স্বপ্নে তিনি সুভাষচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়ে গেছেন বলেই —বাঙালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের ত্যাগ ও বীরত্বের ইতিহাস—জ্বলন্ত দেশপ্রেমের এক শাশ্বত অধ্যায়। দেশবন্ধুরও সুভাষকে নিয়ে গর্বের শেষ ছিল না। বলতেন, 'আর কিছু না পারি দেশের কাজে তো সুভাষকে দিয়েছি, সে তোমাদের সব দেবে।' সত্য হয়েছিল গুরুর এই বাণী।

এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বরিশাল সম্মেলনের কথা ঃ—অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন। সভাপতি—অশ্বিনী কুমার দত্ত।

মতবিরোধ বাধল আজন্ম সহযোগী বিপিনচন্দ্র পালের সংগে। বিপিনবাবুর মতে সহযোগিতা ভিন্ন আর আমাদের উপায় নাই। তিনি বলেন, "আপনারা চাহিতেছেন ম্যাজিক, আমি দিয়াছি লজিক। আপনারা মন্ত্র চাহিতেছেন, কিন্তু আমি তো ঋষি নই। ধর্ম সম্পর্কে যেসব কোন গুরুর আদেশ আমি কখনও গ্রাহ্য করি নাই তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রেও আমি সেই প্রভুত্ব গ্রাহ্য করিব না।"

এরপর উঠে দাঁড়ালেন বক্তা দেশবন্ধু। তিনি বললেন :— "স্বরাজের কোন বিশিষ্ট নাম নাই। স্বরাজের কোন রূপ কল্পনাও সম্ভব নয়। স্বরাজ গণতন্ত্র বা প্রভুতন্ত্র শাসনের সগোত্র নহে। স্বরাজ স্বরাজই; উহা স্বতন্ত্র। যখন স্বরাজ লাভ হইবে, তখন উহার নাম দিব। নাম দিলেই স্বরাজের আদর্শ কল্পনার শেষ হইয়া যায়। আমি ইহার কোন ধারা বা প্রকৃত নামরূপাদি নির্ণয় করিতে চাহি না। হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃগণ লইয়া এক নূতন জাতি গঠিত হইতেছে এবং তাহা একটি

সমুন্নত জাতিতে পরিণতি লাভ করিবে। কেবল সেই সময়েই স্বরাজের মর্মার্থ নির্দেশ সম্ভব। স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার—এই অধিকারকে সম্পূর্ণ অধিগত করিতে হইলে তপঃ সাধনা চাই।

"অসহযোগ আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক মন্ত্র, ইহার সহিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কোন সংস্রব নাই। ইহাতে আত্মসত্তা অনুভব করিতে পারিব—ইহাতে মোহজাল ছিন্ন হইবে। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। আমরা নিজেকে চিনিতে পারিব। সরকারী স্কুলই বল, আদালতই বল আর বিলাতী বস্ত্রই বল—সব অলীক মোহরূপে আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তাই শাসন সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বস্তু হইতেই আমাদের সহযোগিতা ছিন্ন করিব। এ দেশের কেহই যদি এ শাসন-যন্ত্র চালনায় সাহায্য না করে, তবেই আমরা আত্মনির্ভরতা শিখিব, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব।

"অহিংসা আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় পথ। বিদ্বেষ সৃষ্টি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইংরাজের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাই না। কোন জাতিই যেন অপর জাতির ন্যায্য অধিকারে বাধাপ্রদান না করে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। ইংরাজের সংগে আমাদের কি বিবাদ? কিন্তু তাহারা আমাদের জাতীয় সমুন্নতি ও স্বাধিকার লাভে বাধা প্রদান করিবে তাহা তো কখনো হইতে দিব না। স্বরাজ অর্থে স্বার্থ বিসর্জন, আত্মোৎসর্গ। আমি কি এই মহাজাতির প্রতিষ্ঠাকল্পে আমাদের নিকট হইতে এই ত্যাগধর্ম প্রত্যাশা করিতে পারি না? এই যে ছাত্রগণের ক্ষতি ক্ষতি বলিয়া অনেকে চীৎকার করিতেছে। গত যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারে তো কেহ কোন আপত্তি করে নাই। আজও সেই সংগ্রামে কেন সেই আপত্তি তর্ক বা প্রতিবাদ শুনিতে পাই? এই যুদ্ধ ন্যায়-যুদ্ধ। আমাদের খাঁটি জীবন-যুদ্ধ। যদি ইহাতে পরাজয় স্বীকার করি বা অগ্রসর না হই তবে এ জাতির আর পুনরভ্যুদয় নাই। আর এই যুদ্ধেই অহিংসাই একমাত্র অমোঘ অস্ত্র।

"অনেকে আপত্তি করিয়া বলেন, 'এরূপ অস্ত্রে কোন দেশে স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই।' কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি কোন্‌কালে বহু বৎসর যাবৎ ত্রিশ কোটি নরনারী মুষ্টিমেয় বিদেশীর পদানত থাকিয়াছে? নিশ্চয়ই এই মন্ত্রে আপনারা অভীষ্ট ফললাভ করিবেন। যদি সমর্থ হন অনন্তকাল পর্যন্ত এই গৌরবময় ভারতের যশঃ অক্ষুন্ন থাকিবে। একি দারুণ লজ্জার কথা নয় যে ম্যাঞ্চেষ্টার আপনার মাতা, ভগ্নী ও স্ত্রীর বস্ত্র সরবরাহ করে? আপনার অতীত ঐশ্বর্য লাভ করিবার এই কি প্রকৃষ্ট সময় নয়? কি, পারিবেন না আপনারা? যদি না পারেন আপনার সাথীদের নিকটে আপনার উর্ধতন ও অধস্তন পুরুষের কাছে আপনার দেশের নিকট আপনি যে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন। কংগ্রেস তো আপনাদের কাছে বিশেষ কিছু চাহে নাই। আপনাদের কৃষিকাজ আপনারা করিবেন, সূতা কাটিয়া আপনাদের বস্ত্র নিজেই বয়ন করিবেন। স্বাবলম্বী হইয়া স্ত্রী পুত্রের লজ্জা আপনি নিবারণ করিবেন, সন্তানগণের শিক্ষার ভার আপনারাই লইবেন। বাদ-বিসম্বাদ নিজেরাই নিষ্পত্তি করিবেন। এ আর বেশী কি? নিশ্চয় পারিবেন। কাজ করুন, শ্রমের মূল্য দিয়ে স্বরাজ লাভ করুন। অগ্রসর হউন, নারায়ণ আপনাদের সাফল্য প্রদান করিবেন।"

বিপিনচন্দ্র তাঁর এ মত মেনে নিতে পারলেন না সুতরাং সুদীর্ঘ বিশবছরের সহযোগীর সংগে ঘটে গেল চিরবিচ্ছেদ। কিন্তু তার চেয়েও স্মরণীয় তাঁর এই অপূর্ব সুন্দর অভিভাষণ যার প্রতিটি ছত্রে আছে দেশভক্তির সু-গভীর উন্মাদনা। দেশের লোক এক মুহূর্ত দ্বিধা না কাজ দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই অসহযোগ আন্দোলনে। উকিলরা ছেড়ে এলেন আদালত।

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীর পূর্বে তিনি পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে স্বরাজ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এই সময় পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে খদ্দর সমিতি, জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হল। সফল হল চিত্তরঞ্জনের অসহযোগ ব্রতের দ্বিতীয় পূর্ব—চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে পূর্ববঙ্গবাসী এক

মুহূর্ত দ্বিধা না করে দেশমাতৃকার পূজার ব্রত গ্রহণ করল। স্বদেশী আন্দোলনে পূর্ববঙ্গ চিরকালই অগ্রণী। অশ্বিনীকুমার, আনন্দমোহন, অম্বিকাচরণ, যতীন্দ্রমোহন এদের দান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে । অবশ্য চিত্তরঞ্জন নিজেও পূর্ববঙ্গবাসী। আজ আবার এক পূর্ববঙ্গবাসী সন্তানের স্পর্শে নিদ্রাতুর মানুষ জেগে উঠল পাষাণারূপে অহল্যার মত—এর পূর্বে একজন মানুষকে কেন্দ্র করে এমন স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণের ঢেউ আর ওঠেনি বাংলাদেশে। পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করে এবং বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীতে আপন মতবাদ তথা স্বরাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ফিরে এলেন কলকাতায়।

এবার ঠিক করলেন উত্তরবঙ্গে যাবেন—বগুড়া, পাবনা, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জায়গায় চারণ গেয়ে বেড়াবেন তাঁর গান—যে গানের মধ্যে আছে জাতীয় জীবনের নব জাগরণের বীজমন্ত্র। কিন্তু যাওয়া তাঁর হলো না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এক তারবার্তায় জানালেন চাঁদপুরের কুলী ধর্মঘটের কথা। চা-শ্রমিকদের উপর তাদের সাহেবরা নির্মম অত্যাচার করে এবং তারই প্রতিবাদস্বরূপ এই কুলী ধর্মঘট। চিত্তরঞ্জন এই তারবার্তা পেয়ে ছুটে গেলেন চাঁদপুর। কিন্তু জাহাজী শ্রমিকরা চা-শ্রমিকদের সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ধর্মঘট করায় ঝড়ের মুখে বিপদকে সংগী করে ক্ষুদ্র একটি জেলে ডিঙ্গী নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন—সংগে ছিলেন স্ত্রী বাসন্তী দেবী, সুপ্রভা দেবী (পরে চিত্রাভিনেত্রী) ও সত্যেন মিত্র। সেদিন এদের দুজনের সহায়তাই তাদের প্রাণ বেঁচে ছিল।

তিনি এই কুলীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শণ করলেন—এবং বললেন, যেমন করে হোক আমি তোমাদের খরচ চালাবো, তোমরা চালিয়ে যাও ধর্মঘট। শুধু তাই নয়, এদের এই ধর্মঘটকে তিনি সাধারণ শ্রমিক ধর্মঘট হিসেবে দেখলেন না। তিনি বললেন—

"With all the emphasis I can command I must say that these strikes are not labour strikes. They

are not political, they are national. They have sprung from the same spirit with which the battle of swaraj was being fought all over the country and is a part of the general non-co-operation movement."

(ভাবানুবাদ) এই ধর্মঘট কেবল সাধারণ শ্রমিক ধর্মঘট নয়, এদের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি স্বাধীনতার স্পৃহা এবং অসহযোগ।

তিনি এই ধর্মঘটীদের সাহায্যের জন্য তিলক স্বরাজ ভাণ্ডার থেকে দশলক্ষ টাকা দিলেন। এই নিয়ে পরে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসেই স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্য দশ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছিলেন। এর জন্য তাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ৮ই জুলাই মহাত্মা গান্ধী এই মর্মে ঘোষণা করলেন যে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদেশী জিনিষ বর্জন করতে হবে—কলকাতার পার্কে পার্কে সুরু হলো বস্ত্র যজ্ঞ—এই সময় একটি সভায় তিনি বক্তৃতা দান করছিলেন—বিদেশী বস্ত্র বর্জন সম্পর্কে।

চিত্তরঞ্জন দেখলেন একটি ছোট ছেলে, চোখে তার জল। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে তোমার ?

ছেলেটি বলল, আমার যে এই একটাই মাত্র কোট—এটা দিলে মা আমাকে ভীষণ বকবে।

চিত্তরঞ্জন সাশ্রুপূর্ণনেত্রে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাঁর বাড়ীতেও সমস্ত বিলিতী বস্ত্র একত্রিত করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন সুভাষচন্দ্র।

এদিকে নভেম্বরে যুবরাজ Prince of Wales-এর ভারত আগমনকে উপলক্ষ্য করে কংগ্রেসের মধ্যে একটা বিরূপ উত্তেজনাপূর্ণ মনোভাব দেখা দিল। এই উপলক্ষ্যে ২৪ অগাস্ট এক জনসভায় দেশবন্ধু বলেন :

"ভারতবর্ষের একমাত্র লোক-প্রতিনিধি সভা All India Con-

gress Committee এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি। এই সমিতির আদেশানুসারে আমরা যুবরাজের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান পরিবর্জন করিতে বাধ্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই আমাদের। আমাদের অভিযোগ যে শাসন প্রণালী আমাদের নিষ্পেষিত করে সেই ব্যুরোক্রেসী বা অমাত্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আমাদের শত্রু সেই ব্যুরোক্রেসী আমাদের জাতীয় জীবন নষ্ট করিতেছে, এই ব্যুরোক্রেসী আমাদের মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। ইহারই বিরুদ্ধে আমরা অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি এবং এই ব্যুরোক্রেসীর অতিথিরূপেই তার আহ্বানেই তাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আজ যুবরাজ পদার্পণ করিবেন। সম্রাটই হউন বা তাঁর যোগ্য পুত্রই হউন, যুবরাজই হউন, যিনি এই ব্যুরোক্রেসীর শক্তিবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এখানে আসিবেন, আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে পারি না। কংগ্রেসের আদেশ আমরা মানিব, তাহাতে আমাদের যত ক্ষতিই স্বীকার করিতে হউক। কেহ কেহ বলেন, যুবরাজ আমাদের অতিথিরূপে আসিতেছেন, অভ্যাগতদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন আমাদের ধর্মানুমোদিত। বটেই তো! কে আহ্বান করিতেছে যুবরাজকে? আমরা, না আমাদের শত্রু ব্যুরোক্রেসী? যদি আজ আমাদের স্পষ্ট ও সত্য কথা বলিবার অধিকার থাকিত, বলিতাম, 'আমরা দুঃখদৈন্য জর্জরিত মৃত্যুমুখে পতিত লাঞ্ছিত জাতি। এখন আপনি আমাদের শত্রুপক্ষ হইতে আসিবেন না।'

"রাজার প্রতি রাজসিংহাসনের প্রতি রাজবংশধরদের প্রতি আমাদের ভক্তি খুব আছে। কিন্তু যে শাসনদণ্ড আমাদের জীবনী শক্তি নষ্ট করিতেছে আমাদিগকে হৃতসর্বস্ব করিতেছে আমরা সত্যই বলিতেছি তৎপ্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। অনেকে বলেন অর্থ তো আমাদেরই। কিন্তু কোথায় আছে আমাদের সে অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা? আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী, দাস দাসেরও অধম, ঘৃণিত লাঞ্ছিত ও হেয় জাতি। পারি না আমরা যুবরাজের অভ্যথনার

কোন অংশেই যোগদান করিতে।”

১৭ই নভেম্বর Prince of Wales পদার্পণ করলেন বোম্বাই বন্দরে। ৩।৪ দিন ধরে বোম্বাইতে গণ্ডগোল চলল। অনেক লোক হতাহত হলো। যুবরাজের ভারতবর্ষে পদার্পণের দিন কলকাতা মহানগরীতেও হরতাল প্রতিপালিত হলো। তৎকালে এরূপ সাফল্য-মণ্ডিত হরতাল খুব কম দেখা গেছে। সমস্ত রাস্তাঘাট নিস্তব্ধ, একটি জনপ্রাণী নেই, দোকানপাট সমস্ত বন্ধ। রাস্তায় গাড়ীঘোড়ার গমনাগমনও বন্ধ। কেবল যে সব যাত্রীরা হাওড়া ষ্টেশন থেকে আসছেন, সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মীরা On National Service লেখা গাড়ীতে করে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছিলেন। অপূর্ব সাফল্যপূর্ণ এই বয়কটের পেছনে ছিল ভলান্টিয়ার শ্রেণীর অবদান। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে দেশবন্ধু পেলেন পাঁচ হাজার ভলান্টিয়ার কিন্তু তাঁর এই কর্মের জন্য যে আরও কর্মী প্রয়োজন! এই সময় দেশবন্ধু নিজেকে প্রথম ভলান্টিয়াররূপে ঘোষণা করলেন। আবার তিনি তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন দেশের যুবক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। ডালহৌসী স্কোয়ারে সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর এক সভায় তিনি বললেন :—

I am growing old and infirm. The battle has just commenced. They have not taken me yet, but I feel the handcuffs on my wrist and the weight of iron chains on my body. It is the agony of bondage. The whole of India is a vast prison. What matters if I taken or left! One thing is certain. The work of the Congress must be carried on whether I am dead or alive. Only five hundred in this great city and the work of the Congress to be stopped. I ask again, have the students of Calcutta no answer to give?

ভাবানুবাদ :—হায়! আজ আমি বৃদ্ধ, ক্রমে জীর্ণ ও অশক্ত

হইয়া পড়িতেছি কিন্তু তথাপি কেন আমাকে জেলে লইতেছে না? আমি যে বন্ধন শৃঙ্খলের গুরুভার বহন করিতে পারিতেছি না। আমি যে দাসত্বের যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিতেছি। সমগ্র ভারতবর্ষই এখন আমার নিকট বিশাল কারাগার বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ, কেন তোমরা নিষ্ক্রিয়?

দেশবন্ধুর এই আহ্বানে ছাত্র সমাজের মধ্যে সাড়া জাগালো সে কথা বলাই বাহুল্য। Prince of Wales-এর ভারত আগমন উপলক্ষ্যে বয়কট প্রস্তাব সাফল্য লাভ করায় ইংরেজেদ মুখপত্র 'Statesman' এবং 'Englishman' পত্রিকা লিখলো:—"কলকাতায় কংগ্রেস ভলান্টিয়ার-রাজ চলছে—এবং এই মুহূর্তে তাদের সঙ্ঘকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা সরকারের কর্তব্য।" সরকার এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই পুরনো Criminal Law Amendment Act অনুসারে শুরু হলো ধরপাকড়। ভলান্টিয়ার সংস্থাকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হলো।

তিনমাসের জন্য সভাসমিতি নিষিদ্ধ করে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এক ইস্তাহার দিলেন। এই আইনের 'পরে প্রথম ধৃত হলেন লালা লাজপৎ রায়। প্রতিবাদ করে উঠলেন দেশবন্ধু। বললেন:—The pillar of the Congress Lajpath Ray has been arrested and I like the direct attack. সুতরাং দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি সরকারের এই দমননীতিকে ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে এই কাজে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন অক্লান্ত সেবক ও কর্মী সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯২০ খ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর দেশবন্ধু দেশবাসীর নিকট My message to the countrymen শীর্ষক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করেন:—"ব্যুরোক্রেসী এবার অসহযোগ আন্দোলন ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। আমি জানিতাম সর্বাগ্রে ইহারাই আইনের বিধান ভঙ্গ করিবে। পূর্ব হইতেই ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া

আমাদিগকে ন্যায়সঙ্গত অনেক কার্যে ইহারা বাধাপ্রদান করিয়াছে। এখন আবার আমাদের সাফল্যে অসহিষ্ণু হইয়া ইহারা বিস্মৃতির গর্ভে অব্যবহৃত আইন অস্ত্রের উদ্ধার সাধন করিয়া আমাদের উপর প্রয়োগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। আমি আপনাদিগকে সাহস দিতেছি এই সংকট সময়ে আপনারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন না। ধৈর্যের সহিত আপনারা সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিবেন। হিংসানীতির কখনও আশ্রয় লইবেন না। কংগ্রেসের নির্দিষ্ট কার্য করিবেন, কখনও বিতৃষ্ণ হইবেন না। মনে রাখিবেন স্বরাজ লাভই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহারা কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনী আখ্যা দিয়া প্রকারান্তরে কংগ্রেসের কার্যে বাধা প্রদান করিতেছে। আজ হইতে সমস্ত নরনারী যেন ভলান্টিয়ার হইয়া এই অসঙ্গত আইন অমান্য করিতে সঙ্কুচিত না হন। আজ হইতে আমি নিজে ভলান্টিয়ার শ্রেণীভুক্ত হইলাম। আমি আশা করি বাংলাদেশে অচিরেই লক্ষাধিক ভলান্টিয়ার কাজ করিতে ছুটিয়া আসিবে। আমাদের লক্ষ্য পবিত্র, কার্যপ্রণালী বিধিসঙ্গত এবং অপ্রমত্ত। আপনারা মনে রাখিবেন যে দেশমাতৃকার কার্যে আত্মনিয়োগ করাই ভগবানের অভিপ্রেত কার্য। পার্থিব কোন ক্ষমতাই আমাদের এই ভাগবত ব্রতে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না ও পারিবে না।"

এরপর দল বেঁধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বের হলো খদ্দর বিক্রী করতে—এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধানের ভার ছিল সুভাষচন্দ্রের ওপর। এই সময় সহকর্মীরা সব খেতেন দেশবন্ধুর বাড়ীতে। দেশবন্ধুর রস-বোধ যে কত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল তার একটা ঘটনার কথা অপর্ণা দেবী লিখেছেন তাঁর "মানুষ চিত্তরঞ্জন" গ্রন্থে:—"খেতে বসে তিনি ঠাকুরকে বল্লেন, 'ঠাকুর, আর দুদিন বাদেই তো জেলের কাঁকর মেশানো ভাত খেতে হবে। তুমি এখন থেকেই সেটা আরম্ভ করে দাও—তাহলে আমাদের অভ্যেস হয়ে যাবে।' সুভাষচন্দ্র কিন্তু বাবার একথা সমর্থন করলেন না, মাকে বল্লেন, 'যে দুঃখ পরে পেতেই

হবে—আগে থেকে তা স্বেচ্ছায় ভোগ করি কেন।' পিতৃদেব তখন বললেন, 'জোর দিয়ে যখন ঘানি টানতেই হবে—তখন আগে থেকেই শরীরটাকে কষ্টসহিষ্ণু করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ'।"

যাক—যে কথা বলছিলাম—চিত্তরঞ্জনের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন ভলানটিয়ার হয়ে খদ্দর বেচতে যাবার জন্য জিদ ধরলেন—সবাই অনেক বোঝালেন তাঁকে তবু নিরস্ত করা গেল না। আর যাবে নাই বা কি করে? চিত্তরঞ্জনেরই তো পুত্র তিনি। এই সংবাদে দেশবন্ধুর চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'আজ আমার জীবন সার্থক। যাহা কিছু প্রিয় যাহা কিছু প্রিয়তম যাহা আনন্দদায়ক সবই আমি আমার স্বদেশ সেবার ব্রতে উৎসর্গ করিতে পারিব।' পিতার ব্রত উদযাপনের সহায় হলেন পুত্র—হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে চিররঞ্জনকে গ্রেপ্তার করা হলো—এ খবরে চিত্তরঞ্জন কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না—কারণ এ ঘটনা তো জানা কথাই ছিল—তাঁর কেবল চিন্তা এই ব্রত উদযাপন করতে আরও সৈনিকের প্রয়োজন কিন্তু কোথায় তারা?

৭ই ডিসেম্বর বাসন্তী দেবী ও চিত্তরঞ্জনের ভগিনী সুনীতি দেবী, ঊর্মিলা দেবী খদ্দর বিক্রী করতে বের হলেন। পুরুষের পাশে এই সংগ্রামকে সার্থক করতে এগিয়ে এলেন নারী—আর চিত্তরঞ্জন সত্যিই জীবনের সবচেয়ে প্রিয় হতে প্রিয়তর মানুষদের উৎসর্গ করলেন দেশ-মাতৃকার সেবায়।

তাঁরা দুজন বড়বাজারে দাঁড়িয়ে খদ্দর বিক্রী করছিলেন। জনৈক পুলিশ কর্মচারী এসে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা এখানে কি করছো?'

বাসন্তী দেবী নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, 'আমরা খদ্দর বিক্রী করছি আর ২৪শে ডিসেম্বর কলকাতায় হরতাল ঘোষণা করছি।'

পুলিশ কর্মচারী :—আপনি কি থানায় যেতে প্রস্তুত আছেন?

এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে তাঁরা দুজন নীরবে পুলিশ কর্মচারী-টির অনুসরণ করলেন। ৭ই ডিসেম্বর রাত্রিবেলা তাঁদের জামিনে মুক্ত

করে আনলেন বাসন্তী দেবীর জনৈক আত্মীয়। পরদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো—'Discharged with warning'.

এতে অপমানিত হলেন দেশবন্ধু। ক্ষুব্ধ হলেন দেশবাসী। কী নারীজাতির এই অপমান! দলে দলে লোক এসে ভলান্টিয়ার শ্রেণী ভুক্ত হলো।

দেশবন্ধু বললেন, ঠিক আছে আবার তোমরা যাও। অনেকেই বোঝালেন, অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক এবং আজ'এঁদের না যাওয়াই ভাল। কিন্তু তাঁরাও সঙ্কল্পে অটল।

সুতরাং ৮ই ডিসেম্বর আবার খদ্দর নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু সেদিন তাঁরা গ্রেপ্তার হননি। এদিদে ভলান্টিয়ারগণ দলে দলে জেলে যেতে লাগলো এবং অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, বাধ্য হয়েই কর্তৃপক্ষকে কলেজসমূহ বন্ধ করে দিতে হলো।

দেশের এই সঙ্কটজনক অবস্থা। একমাত্র পুত্র জেলে, আর দেশবন্ধু বসে আছেন জনৈক পুলিশ কর্মচারীর আগমনের অপেক্ষায়। দেশের যা অবস্থা, তাতে তো সরকার কোন নেতাকেই রেহাই দেবেন না। সুতরাং অসহযোগ আন্দোলনের কি হবে, এই চিন্তা তাঁর মন জুড়ে। এই সময় লর্ড রোনাল্ডে দেশবন্ধুকে আমন্ত্রণ করে বোঝালেন যে, আপনারা এই সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করুন। দেশবন্ধু বললেন, 'আমি তা পারি না এবং এরা ধর্মযুদ্ধে নিযুক্ত, আমি কি করে এদের বাধা দিই? আমি যদি আপনাকে নিষেধ করি, আপনি কি গির্জায় যাওয়া বন্ধ করবেন?'

লর্ড রোনাল্ডে—না, তা নয়। তবে কি ভলান্টিয়ার বাহিনী চালাবেন? তবে তো আমাকেও শান্তিরক্ষা করতে হবে।

চিত্তরঞ্জন—কি আর করবো? আমি বৃদ্ধ কিন্তু এই ধর্মযুদ্ধে যদি আমার দেহপাতও হয়, তথাপি আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে এই বে-আইনী বিধানের বিরুদ্ধে—আমার সম্বল তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতার অস্ত্র—অহিংস যুদ্ধে কখনও বিরত হবো না।

এরপর এলো ১০ই ডিসেম্বর।

দুজন পুলিশ কমিশনার এলেন দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে। দেশবন্ধু বললেন, "I am C. R. Das. Are you for arresting me?"

পুলিশ কমিশনার—Yes.

দেশবন্ধু—I am ready but where is the warrant?

পুলিশ কমিশনার—ওয়ারেন্ট লাল বাজারে ফেলে এসেছি। But you are arrested under the Amendment Act.

দেশবন্ধু—Oh! The same state Act under which my boys are arrested. Very good—I am ready.

গায়ে চাদরখানি জড়িয়ে নীচে নেমে এলেন তিনি, আর যাবার পূর্বে জাতির উদ্দেশ্যে রেখে গেলেন তাঁর বাণী :—Men and women in India, this is my last message to you. Victory is in sight if you are prepared to win it by suffering.

বঙ্গানুবাদ :—"ভারতের নরনারী, এই আমার শেষ বাণী। যদি দুঃখ, ক্লেশ, নির্যাতনে স্বরাজ লাভ করিতে চান, তবে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।"

পুলিশের গাড়ীতে এসে বসলেন তিনি। পুরনারীগণ হুলুধ্বনি দিয়ে, শঙ্খ বাজিয়ে মহান্ বীরের এই নবযাত্রাপথকে অভিনন্দন জানালো।

দেশবন্ধুর সংগে ধৃত হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, প্রমুখ আরও অনেক নেতা। আর এ-পথের সহযাত্রী হলেন ১৬০০০ বাংলা দেশবাসী। কারাগারে স্থানাভাবের জন্য সরকার খিদিরপুর ডকে একটি অস্থায়ী কারাগার করেন। সারা ভারত থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ৩০ হাজার জনকে। সুতরাং জেলে এদের স্থান সঙ্কুলান করাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

জেলে এসে দেশবন্ধু প্রশ্ন করলেন, "এবার আমি Warrant খানা দেখতে পারি কি ?"

পুলিশ অফিসার কীড্ উত্তর দিলেন, "আপনাকে তো Warrant -এ ধরা হয় হয়নি। ফৌজদারীর ৫৪ ধারা অনুসারে সন্দেহে ধরা হয়েছে।"

দেশবন্ধু—ও তাই দেখছি! আমি practice ছাড়ার পর আইনের কি অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে ?

কীড্—কেন ?

দেশবন্ধু—৫৪ ধারা তো Cognizable case-এ প্রযোজ্য—ভলাণ্টিয়ার আইনের জন্ম নয় তো।

পুলিশ অফিসারটি এবার কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে প্রস্থান করলেন।

এলেন জেলার। প্রশ্ন করলেন, "How do you like to be classed, Mr. Das ?"

Das—I can't follow you.

Jailor—Do you like to be classed as a European class prisoner ?

Das—No, thanks—as an Indian, pure and simple.

সুতরাং সাধারণ কয়েদীদের মত থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হলো তাঁর। সাধারণ কয়েদীদের মত ছোট্ট একটি কুঠরী। এপ্রিল মাসের গরম—সহ্য করা অসম্ভব। কান পেতে শোনেন, বাইরে হাওয়ার শব্দ!

খাওয়া তো তেমনি—সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই শরীর একদম ভেঙে পড়লো—প্রতিদিন নিয়মিত জ্বর আসতে আরম্ভ করলো।

জেলের কর্তৃপক্ষ এবার অনুমতি দিলেন বাড়ী থেকে খাবার আনবার। কিন্তু সবাইয়ের খাবার না আনলে একা তিনি তা খাবেনই

বা কেমন করে? সুতরাং বাড়ীর লোককে বাধ্য হয়ে সব সহকর্মীদের খাবার নিয়ে আসতে হতো।

কেটে গেল দুমাস—৬ই ফেব্রুয়ারী ব্যাঙ্কশাল কোর্টে দেশবন্ধুর বিচার সভা বসলো। আদালতে তিল ধারণের স্থান ছিল না—জনমানসের নেতার বিচার—যিনি একদা সুনিপুণ বিচারের দক্ষতায় কত বন্দীকে মুক্তিদান করেছেন, যিনি একদা ভারতের আইন জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন—আজ বৃটিশ সরকারের স্বৈরাচারী আইন তাঁকেই করে তুলল বিচারপ্রার্থী!

নিস্তব্ধ কক্ষ—অপেক্ষমান ব্যাকুল জনতা। প্রশান্ত বদনে দেশবন্ধু এসে দাঁড়ালেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সুইনহো জিজ্ঞাসা করলেন, "Do you wish to say anything, Mr. Das?"

Mr. Das—No, thanks.

এরপর হাকিম কাগজে কি লিখে তা ইণ্টারপ্রেটারকে দিলেন—সেই বিরাট জনতার নিস্তব্ধতা ভেদ করে হাকিম উচ্চারণ করলেন, "আপনার বিনাশ্রমে ছয় মাস কারাদণ্ড!"

ব্যাকুল জনতা ফিরে গেল—চোখে তাদের জল! দেশবন্ধু ফিরে গেলেন নিজের সেলে।

এই সময় তিনি বেশীর ভাগটাই পড়াশুনায় কাটাতেন। তিনি শিষ্য সুভাষচন্দ্রের নিকট দর্শন অধ্যয়ন করতেন। ভারতের জাতীয়তা সম্পর্কে একখানি পুস্তক এবং একখানি বৈষ্ণব কাব্য ও বাংলা অভিধান লেখবার উদ্যোগ করেছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে তা শেষ করে যেতে পারেননি। তবে সারাক্ষণ যে গম্ভীর মুখে পড়াশুনাতেই নিমগ্ন থাকতেন, তা নয়; সহকর্মীদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা, গল্প, রসিকতা সবই চলতো সমানভাবে।

একদিন সুভাষচন্দ্রকে বললেন, "ভাবছি, জেল থেকে বেরিয়েই সুভাষের একটা বিয়ে দিতে হবে।"

সুভাষচন্দ্র লজ্জিত হয়ে বললেন, "আমার অপরাধ?"

দেশবন্ধু উত্তর দিলেন, "লাখখানেক টাকা পাওয়া যাবে, এই আর আর কি! আমার স্বরাজ ভাণ্ডারের জন্যে অর্থের তো বড় দরকার।"

সংগে সংগে উত্তর দিলেন কিরণশঙ্কর, "যাক্, সুভাষের তবু একটা বাজার দর আছে। আমরা একেবারেই অচল পয়সা!"

এবার হাসির রোল উঠল।

সুভাষচন্দ্রকে আসলে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন এবং সুভাষচন্দ্রও এত শ্রদ্ধা জীবনে কাউকে করেননি। কারাগারে দেশবন্ধু অসুস্থ হলে তিনি একাগ্রমনে তাঁর সেবা করেছিলেন। দেশবন্ধু ঠাট্টা করে বলতেন, "সুভাষ খুব ভাল নার্স।"

পরস্পারের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও স্নেহই বাঙলার এই দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল।

জেলে থাকাকালীন সাধারণ কয়েদীদের জন্য তিনি খুব কষ্ট অনুভব করতেন। এমনি একটি সাধারণ কয়েদী, দাগী চোর, নাম তার মথুর—দেশবন্ধুর সেবায় ঢেলে দিল মনপ্রাণ। সে তার অতীত পাপজীবনের গল্প শোনাতো তাঁকে। তিনি ভাবলেন, এর জীবনের পরিবর্তন সম্ভব, যদি একে সৎপথে চালনা করা যায়। মথুরও প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল তাঁকে, সুতরাং জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে সে তাঁরই সেবায় নিযুক্ত হয়। সবাই এ ব্যাপারে অনেক ওজর-আপত্তি করেছিল, কিন্তু কারও কথাই শোনেননি তিনি। পরে তাঁর বাড়ী থেকে এক বাক্স রূপার বাসনের সংগে সংগে মথুরও হলো নিরুদ্দেশ।

সবাই বললেন, "আগেই তোমায় বারণ করেছিলাম।"

তিনি তাঁদের বোঝালেন, "ও-ই যে নিয়েছে, তার তো কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।"

একটি সাধারণ কয়েদী প্রতিদিন ফুল নিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করতো। এর জন্যই তাঁকে অন্য জায়গায় বদলী করা হলো। এই কয়েদীদের জন্যে পরে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

বৈশাখ মাসে মুসলমানদের রমজানের রোজা পড়ল। তিনি সুপারকে জানালেন, ওদের সম্পর্কে সুবন্দোবস্ত করে দিতে। ঈদের দিন তাঁরই চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানরা একসঙ্গে খেতে বসলো। এই দৃশ্যে দেশবন্ধুর অন্তর আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠল

সহকর্মীদের আত্মীয়-স্বজনরা এলে গেটের সামনে এসে সাধারণ কয়েদীদের মত চীৎকার করে কথা বলতে হতো। এই নিয়ে তাঁরা দেশবন্ধুকে অভিযোগ জানালেন। দেশবন্ধু ওদের অসুবিধের কথা বুঝলেন, সুতরাং নিজের বাড়ীর লোককেও আসতে বারণ করে দিলেন।

এমনি করে চিরকালের সহানুভূতিশীল অন্তর তিনি মেলে ধরে-ছিলেন এই রূঢ় কারাপ্রাচীরের অন্তরালেও। তাই চোখে পড়ত, জেলের দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে মানুষ প্রণাম করে যাচ্ছে, তাদের হৃদয়ের অধিদেবতা দেশবন্ধুকে! এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁর দু'চোখ ভরে উঠত জলে!

সকলের সঙ্গে মিলে মিশে ভুলে যেতে চান লৌহ কারাপ্রাচীরের যন্ত্রণাময় দিনগুলি। কিন্তু দেশের নানা সমস্যা তাঁকে করে তোলে চিন্তিত ও ব্যাকুল।

এই সময়ে কয়েকজন নেতা ঠিক করলেন, গান্ধীজীর সংগে বড়লাট লর্ড রেডিং-এর এক সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে এই ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তি করতে হবে। কারণ, দেশের নেতৃস্থানীয় সব ব্যক্তিরাই কারাগারে, সুতরাং অসহযোগ আন্দোলন অচল হবার অবস্থা।

কিন্তু গান্ধীজী বললেন যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দিলে তিনি কোন মীমাংসার মধ্যে যাবেন না। এ দিকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শান্তির দূতরূপে কারাগারে এসে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি জানালেন যে, যুবরাজের আগমন উপলক্ষ্যে এই হরতাল যদি বন্ধ রাখেন, তবে অন্যায় ভাবে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের মুক্তি দেবেন, বৃটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। শুধু তাই নয়, দমন-

নীতিমূলক সমস্ত আইন তুলে নেবেন এবং এই নিয়ে সরকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন।

জেলে সভা বসল—চিত্তরঞ্জন ও মৌলানা আজাদ একটি খসড়া তৈরী করে সেটা তার মারফৎ গান্ধীজীর কাছে পাঠান। তাতে নিম্নলিখিত সর্ত ছিল :—

আমরা নিম্নলিখিত সর্তে হরতাল বন্ধ করতে বলি :—

(১) কংগ্রেস কর্তৃক উত্থাপিত সকল বিষয়ের জন্য সরকার শীঘ্রই সভা আহ্বান করবেন।

(২) সরকার সম্প্রতি প্রকাশিত সকল ইস্তাহার ও আদেশ প্রত্যাহার করবেন।

(৩) নূতন আইনে যাদের বন্দী করা হয়েছে, তাদের বিনা সর্তে মুক্তি দিতে হবে।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এ সর্তে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, Conference-এ কাদের আমন্ত্রণ করা হবে, তা যদি স্থির হয় এবং করাচীর ফতোয়া বন্দীগণকে মুক্তিদান করা হয়, তাহলে না হয় হরতাল বন্ধ করা যেতে পারে।

এই সময় দেশবন্ধুর কাজ চালাচ্ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তিনি গান্ধীজীকে উত্তরে জানালেন, বাঙলাদেশের মতে সভায় আলোচনা করার সুবিধা গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিসংগত।

এর উত্তর গন্ধীজী সহজে দিলেন না কিংবা ইচ্ছে করেই নীরব রইলেন। অনেক দেরীতে তিনি যখন তাঁর মতামত জানিয়ে পাঠালেন, তখন ইংরাজরা আর আপোষে মিটমাটে রাজী হলো না। Prince of Wales তখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে গেছেন—কলকাতার হরতাল সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, কিন্তু আমরা জাতীয় জীবনে একটি সুবর্ণ সুযোগ হারিয়ে ফেললাম।

গান্ধীজীর এই ভুলের জন্য ব্যথিত ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন

দেশবন্ধু। তিনি বললেন, 'জীবনের এই সুবর্ণ সুযোগ আমরা হারালাম।' ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস গান্ধীজীকে একনায়কত্ব দিয়েছিল, আর তার সুযোগ তিনি জীবনভর গ্রহণ করেছেন। নিজের মতকেই দলের মত বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমের ইতিহাস যেমন ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, তেমনি একটু স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তাঁর ভুলত্রুটিরও শেষ নেই—আর তারই ফল আমাদের এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ।

এই সময় গান্ধীজী আর-একটি মারাত্মক ভুল করলেন। তা হচ্ছে, চৌরীচোরা ঘটনার ফলে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া।

সত্যাগ্রহীদের একটা মিছিল যাচ্ছিল চৌরীচৌরা গাঁয়ের পথ ধরে —পথ রোধ করে দাঁড়াল পুলিশ বাহিনী। এ পথ দিয়ে মিছিল যেতে দেওয়া হবে না, এটা বে-আইনী। বিরোধ বাধল জনতার সঙ্গে পুলিশের। উত্তেজিত জনতা থানায় আগুন ধরিয়ে দিল এবং ৬/৭ জন পুলিশের লোককে পুড়িয়ে মারল। এই ঘটনা বিচলিত করল গন্ধীজীকে। তিনি বারদৌলীতে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, সব আন্দালন প্রত্যাহার করা হোক। তাঁর মতে, অহিংস অসহযোগ নীতিতে ভারতবাসী এখনও পুরোপুরি বিশ্বাসী হতে পারেনি।

এ-ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন দেশবন্ধু। তিনি বললেন, "বাংলাদেশ কতদূর এগিয়ে যাচ্ছিল। এই বারদৌলী সিদ্ধান্তের ফলে বাঙলার কর্মস্পৃহাকে একেবারে নিস্তেজ করে দেওয়া হলো। এই সমস্ত কাজ করতে হলে একেবারে যে চৌরীচৌরা হবে না, তা কেউ আশা করে না। বিশেষতঃ বাঙলায় তো অশান্তিমূলক কোন ঘটনাই ঘটে নাই।"

জেলে এই সময়কার দেশবন্ধুর মানসিক অবস্থা সুভাষচন্দ্র অতি সুন্দররূপে তুলে ধরেছেন তাঁর Indian Struggle (Pages 73-74) গ্রন্থে: "I was with Deshabandhu at the time and I could see he was beside himself with anger and

sorrow at the way of Mahatma Gandhi was repeatedly bungling."

এ সম্পর্কে লালা লাজপৎ রায় ৭০খানি চিঠি লিখলেন গান্ধীজীকে। বিরাট এই ভারতবর্ষে কে কোথায় কবে অহিংস থাকতে পারেনি বলে আন্দোলন পিছিয়ে দিতে হবে?

বারেবারে গান্ধীজীর এই ধরনের ভুলের জন্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস আরও অনেক বছর পিছিয়ে গেছে কিনা কে বলতে পারে?

এ দিকে, বহুদিন উৎকণ্ঠার পর আন্দোলনের একটা স্তিমিত ভাব দেখে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। এর কয়েক সপ্তাহ পরেই গান্ধীজী বন্দী হয়ে সুদীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বসে দেশবন্ধু দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নেতারা সব কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, আন্দোলনের অভাবে সর্বত্র একটা নিস্তেজ ও ঝিমিয়ে-পড়া ভাব। দেশবন্ধু ভাবেন, কি উপায়ে দেশকে জাগানো যায়, দেশের জনসাধারণের মনে ফিরিয়ে আনা যায় হারানো বিশ্বাস। অথচ সুদীর্ঘ সময়ও হাতে নেই যে, অনন্ত সময়ের হাতে দেশকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন। কারণ, দেশে স্বরাজের ভিত্তি তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে, তারই জন্য এই জীবনপণ সংগ্রাম। কি করবেন তিনি?

গান্ধীজীর মত একজন নেতা আপন অসহযোগ নীতির ওপর আস্থা রাখতে পারলেন না, সুতরাং জনসাধারণ যে বিশ্বাস হারাবে, এ আর বেশী কথা কি!

পল্লীগ্রামের লোকেরা খদ্দরের জামাকাপড় পরা লোক দেখলেই প্রশ্ন করতো, "কি গো কর্তা, আমাগো স্বরাজ কতদূর?"

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চিন্তা করে তিনি স্থির করলেন

যে, দেশের লোককে নতুন কিছু দিতে হবে, যাতে এই ঝিমিয়ে-পড়া জাতি আবার নতুন শক্তিতে জেগে ওঠে। অনেক চিন্তার পর তাই তিনি স্থির করলেন, আমাদের এই অহিংস অসহযোগ নীতিকে নিয়ে যেতে হবে কাউন্সিলের ভিতরে। বাইরে থেকে একে বর্জন না করে ভেতর থেকে একে আঘাত করতে হবে।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে জন্ম নিল কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব। আর কারাপ্রাচীরের বাইরে দেশের অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং বিঠলভাই প্যাটেলকে নিয়ে Civil Disobedience সমিতি নামে একটি সংস্থা গঠিত হলো। স্থির হলো, প্রয়োজন হলে এই সমিতি কংগ্রেসের নূতন কর্মপন্থার নির্দেশ করতে পারবেন। তবে পূর্বের মত প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া তাঁরা জাগাতে পারেননি নিশ্চয়।

দেশবন্ধু যখন জেলে, সেই সময় ১৯২১ সালে ২৪শে ডিসেম্বর আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে। তিনি তখন জেলে, তাই শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু দেশবন্ধুর অভিভাষণ-পত্রটি পাঠ করেন।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে দেশবন্ধুর অভিভাষণ (১৯২১)

"আজ আমরা এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি, সকলেরই অন্তরকে জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে—ভারতের বর্তমান স্বরাজ সংগ্রামে আমাদের করণীয় কি? হ্যাঁ, এই সংগ্রামে আমিও একজন সৈনিক বলিয়াই আপনাদের সমবেত আহ্বানে আমি সাড়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। সরকারের চরম রুদ্রতা যে-শহরের বুকের উপর ভীষণভাবে বর্ষিত হইয়াছে, আমি সেই শহরের একজন বাসিন্দা। অনিচ্ছায়ও বৃটেনের রাজকুমারকে সাদরে অভিনন্দিত

করিতে হইবে, এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষেই আজ উহার রাজনৈতিক জীবন নিষ্পেষিত।

"যাক্, এখন আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে অবহিত হইতে হইবে যে, আমরা কি চাই, আর কোন্‌দিকে আমরা যাইতেছি, আমাদের লক্ষ্য কি? আপনারা নিশ্চয়ই বিদেশীর কবলমুক্ত স্বাধীনতাই চান। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ কি? অবাধ স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়। যদি আমাদের জাতীয় স্ফুরণ ও পুষ্টি অবাধে চলিতে পারে এবং তা যদি জনগণ স্বেচ্ছায় মানিয়া লন, তবে অবাধ স্বাধীনতা না হইলেও তাহাতে দোষ নাই।

"ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ও আয়ারল্যাণ্ড এবং ভারতের অবস্থা এক। তাহারা সকলেই বিদেশগত সংস্কৃতির আক্রমণ ও বিজয় হইতে নিজেদের বাঁচাইতে চায়, জাতির শিক্ষার জন্য তাহাদের সমান আগ্রহ। আর তৃতীয়তঃ, সকলেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের জাতীয় পরিণতি লাভ করিতে চায় এবং সেইজন্য সাধনা করিতেও তাহারা তৎপর, আর সাধনা বা আত্মনিয়ন্ত্রণে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র হইতে বাধা না পাইয়া যাহাতে সাধনা করিতে পারে তজ্জন্য তাহারা একান্ত উন্মুখ।

"আমরা স্বাধীনতা চাই আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য। পাশ্চাত্য যেন এবিষয়ে আমাদিগকে কোনরূপ বাধা না দেয়। কিন্তু এখানে আমি কবিকণ্ঠের বাধা পাইতেছি। ভারত-কবি রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত, আমরা এই অতিথির আগমন কেন প্রত্যাখ্যান করিব? আমরা কি জানি না যে, প্রাচ্য ও প্রতীচী উভয় স্থানের সংস্কৃতি সংযোগে জগতের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী!'

"আমি স্বীকার করি, ভারতের জাতীয়তাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে অন্য সমস্ত জাতির সান্নিধ্য হইতে নিজেকে বিমুখ রাখা উচিত নয়। কিন্তু দুইটি কথা ভাবিতে হইবে :—

(১) আমাদের আগে অতিথিকে অভ্যর্থনা করিবার মত নিজের বাড়ী হউক।

(২) পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করিবার পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতির নিজের সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া দরকার।

"আমরা বাস্তবিক পাশ্চাত্যের কোন সার জিনিষ গ্রহণ করিতে পারি নাই, কেবল দাসসুলভ অনুকরণপ্রিয়তাই অর্জন করিয়াছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টি ভারতকে একেবারে গ্রাস করিয়াফেলিয়াছে। কিন্তু ভারতকে উহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে।

"মডারেট বন্ধুগণ বলেন, সাম্রাজ্যে ভিতরে থাকিয়াই আমাদের অদৃষ্ট গড়ি না। আমার উত্তর, সাম্রাজ্যের মধ্যেই থাকি আর বাহিরেই থাকি, ব্রিটিশ জাতির বাধা বা সাহায্য না লইয়া ভারতকে নিজের অদৃষ্ট নিজেই গড়িতে হইবে। গ্রামে যান, কত সুস্থ সবল লোক দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দেখিবেন, পরাধীনতার শৃঙ্খলে তাহারা নিষ্পেষিত। প্রতি বৎসর কত টাকা উড়িয়া যাইতেছে, আমরা নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছি এবং ক্রীতদাসের মনোভাবসম্পন্ন ব্যভিচার অনাচার সবই আমাদের দোষ হইয়া পড়িয়াছে। এ সবই বিদূরিত হইতে পারে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণে।

"কিন্তু কিরূপে আমরা তাহা পারিব? যুদ্ধ বিগ্রহ? অসম্ভব। আর যদিই-বা তাহা সম্ভব হইত, নীতির দিক হইতে আমি তাহার বিরোধী। সুতরাং সহযোগিতা বা অসহযোগ, দুইটির একটিকে লইতেই হইবে।

"এই যে নূতন সংস্কার আইন প্রবর্তিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বলিতে আসিয়া দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, জাতীয়তার উদ্ভবের সময় যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ সাহায্য করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী। উক্ত আইনে আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন আভাস নাই। কোনও রূপ দায়িত্বমূলক শাসনের নামগন্ধ নাই, আর আইন পরিষদের অর্থের উপর কোন কর্তৃত্ব বা হাতই নাই। প্রস্তাবনায়

সবই অস্পষ্ট তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কার্য নির্ধারণ করিতে হইবে। আমরা কতটা যোগ্য তাহার উপরে সব নির্ভর করিবে অর্থাৎ আমরা বরাবর তাহাদের হাতের পুতুল হইয়া থাকিব। আমরা প্রকাশ করিতে চাই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের আছে। তবে ইহাতে যদি কোন বাধা পাই, তবে তাহাকে অতিক্রম করিতে হইবে।

"ইংলণ্ডের সঙ্গে আমি সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত যদি সে আমার জন্মগত অধিকার স্বীকার করে—আমি সামান্য সামান্য বিষয়ে আপোষ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার নিজস্ব অধিকার সম্বন্ধে আমি কোনরূপ আপোষ করিতে পারিব না।

"ইংরেজ প্রথম হইতেই আমাদের পৃথক করিতে দৃঢ় মনোরথ। লক্ষ্য করুন, People নয়, ভারতীয় জাতগুলি অর্থাৎ ভারত এক ও অখণ্ড নয়—এইরূপ উক্তি আত্মসম্মান-বিরোধী এবং ইহার তীব্র প্রতিবাদ করি।

"দ্বিতীয়তঃ, Declared Policy—স্বীকৃত নীতি—কি স্বীকৃত নীতি? দায়িত্বপূর্ণ শাসনে যে আমাদের পূর্ণ অধিকার আছে, তাহা স্বীকার করা? তা কিছুই নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জাতিসঙ্ঘে স্বাধীন এবং সমভাবাপন্ন অংশীদারের স্বীকার? তাও নয়। সব কথাই যেন কেমন গোলমেলে। স্বাধীন এবং সমভাবাপন্ন অংশীদার হইবার জন্য আমরা কোনরূপে বাধ্য করিতে পারিব, এরূপ কিছুই আছে? আমার বক্তব্য ভারতবাসীর মঙ্গল এবং অগ্রগতির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সে-দায়িত্ব সম্পাদনা করিতে আমরা নিজেরাই পারিব। আমি স্বীকার করি না যে কোন বিদেশী শাসন যন্ত্র অধীনস্থ কোনজাতি গণ-সঙ্ঘের দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে পারে। আর পার্লামেণ্টে আমাদের সময় নির্ধারণ এবং ব্যবস্থা করিবে এরূপ কথা মানিতে আমি একেবারিই প্রস্তুত নই। ইহার অর্থ যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চিরস্থায়ী হইবে।

"তাই, অসহযোগই একমাত্র পন্থা। এই অসহযোগ পন্থার গভীর অর্থ উপলব্ধি হইলে দেশের জন্য কোন ত্যাগই ত্যাগ বলিয়া মনে হইবে না।

তাই, কোনরূপ আপোষ বা সহযোগিতা করিতে আমি প্রস্তুত নই।

"সত্যই কি সংস্কার আইন আমাদিগকে কোনরূপ দায়িত্বসম্পন্ন ক্ষমতা দিয়াছে? তবে অর্থ সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা নাই কেন? মডারেটরা বলেন যে, বাঙলা সরকারের সাতজন সভ্যই ভারতবাসী। ইহার কোন অর্থ নাই। তাঁহারা ভারতবাসী হইতে পারেন কিন্তু রিজার্ভড্ বিষয়গুলি সাধারণতঃ গভর্ণর লইয়া থাকেন। অতএব ক্ষমতাবিহীন বিভাগ লইয়া সহযোগিতা কিরূপে সম্ভব?

"উক্ত সাতজন সভ্যের কেবল ট্যাক্স ধার্য করা, ঋণ গ্রহন করা অথবা খরচের বরাদ্দ করা ছাড়া একটিও পরামর্শ করিবার অবকাশ নাই। আর reserved বিষয়ে তো মন্ত্রীদের বাক্যস্ফুট করার ক্ষমতা নাই। গভর্নমেন্টের সহিত আমাদের যে সংগ্রাম, তাহাতে তাহারা বাক্‌শক্তিহীন দর্শক মাত্র।

"মন্ত্রীদের ক্ষমতাই বা কি? প্রথমতঃ, তাঁহারা দুইটি বিষয় পাইয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহা নির্বাহ করিবার প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁহারা পাইতেছেন না। ধরুন, চিকিৎসা বিভাগ—ইহার উন্নতি করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি যদি কোন পরিকল্পনা বা স্কীম দেন, তাহা কার্যে পরিণত হইবার অর্থ নাই। বিভাগের পদস্থ কর্মচারীর মত ছাড়াও কিছু হইবে না। কোন্ বিষয়ে কত খরচ হইবে, সে বিষয়েও মন্ত্রীদের কোন মত গ্রহণ করাই প্রয়োজনীয় বোধ হয় না। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখুন, সহযোগিতায় কোন ফল পাইবার কি আশা করা যায়?"

[হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, "ভারতের জাতীয় কংগ্রেস," পৃঃ ৮১-৮৮]

এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বলেন, "অপূর্ব সংযমের সঙ্গে এই অভিভাষণ লেখা হয়েছে। দেশবন্ধু যে অহিংসা ও প্রেমের কত বড় উপাসক, তা বোঝা যায় এবং লজ্জার ও ঘৃণার কথা, সরকার এমন মানুষকেও কারাদণ্ড দিয়েছেন।"

এই সঙ্গে দেশবন্ধু সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী দেশবাসীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ

হতে বলে এক অভিভাষণ পাঠান।

এই অভিভাষণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, জাতীয়তাবোধের উপলব্ধি ছিল তাঁর হৃদয় মন জুড়ে।

রুদ্ধ কারাপ্রাচীরের দুঃসহ দিনগুলো কেটে যায়—মনে শুধু একমাত্র স্বপ্ন Council entry—সহকর্মীদের সঙ্গে এ নিয়ে বাঁধে তর্ক। কিন্তু অনেক ভেবে তিনি দেখেছেন, এছাড়া সরকারের কাজে প্রত্যক্ষভাবে বাধা দেবার আর পথ নেই। তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করেন, এই সঙ্কল্প দ্বারা জাতিকে আবার নতুন উদ্যমে জাগিয়ে তুলতে পারবেন। সুতরাং সহকর্মীদের বিরুদ্ধ মত পরাস্ত হতে বাধ্য হলো। কারণ স্বপ্ন আজ তাঁর মনে মহীরুহের রূপলাভ করেছে। কিন্তু অনেকে ভাবলেন, দেশবন্ধু বুঝি এই প্রস্তাবের দ্বারা সরকারের সংগে হাত মেলাতে চাইছেন, কিংবা কারাগারের ভয়ে সরকারের সংগে সহযোগিতা করতে চাইছেন।

দেশবন্ধু কারাবাসকালে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। দেশবন্ধুর সুযোগ্য সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সভায় কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব তিনিই প্রথম উত্থাপন করলেন। তিনি বলেন, "কাউন্সিলে প্রবেশ করে আমরা অসহযোগিতা করবো, যে পর্যন্ত না আমরা কিছু অধিকার লাভে সমর্থ হই, সে পর্যন্ত আমরা কাউন্সিলের প্রত্যেক কাজে বাধা দিব।"

তাঁর একথায় চতুর্দিক থেকে প্রতিবাদ উঠলো। সকলে বললো, দেশবন্ধুর সহধর্মিনী স্বামীর শেখানো বুলি বলছেন। এ অসম্ভব! দেশের পত্রপত্রিকাসমূহ এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করতে লাগলো।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বসে সব কানে গেল দেশবন্ধু—বিরাট এক সংঘর্ষের জন্য মনে প্রাণে তৈরী হতে লাগলেন। অবশ্য শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে।

অসুস্থ শরীর, তবু জেলের সুপার এলে প্রতিদিন উঠে দাঁড়ান। সহকর্মীরা প্রশ্ন করেন, 'আপনি রোজ উঠে দাঁড়ান কেন?'

তিনি উত্তর দেন, 'ভুলে যেও না, আমরা কয়েদী।' ফুরিয়ে এলো কয়েদী জীবনের কারাপ্রাচীরের দুঃসহ দিনগুলি। এবার ঘরে ফেরার পালা। ১৯২২ সালের ৯ই অগস্ট মুক্তিলাভ করলেন তিনি।

দেশবন্ধুর আন্তরিক ও সহযোগিতাপূর্ণ মধুর ব্যবহারে তাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ করায় সহকর্মীদের চোখে দেখা দিল জল। কিন্তু মুখে হাসি —তাঁদের কর্মের দেবতা আবার 'নতুন স্বপ্ন' নিয়ে জাগিয়ে তুলবেন দেশকে জাতিকে। এই হারানোর বেদনার চেয়ে এই পাওয়াটা তো তাদের জীবনে অনেক বড়!

একজন মানুষকে ঘিরে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই অভূতপূর্ব আলোড়ন এবং পরিবর্তন, তা এক দেশবন্ধু ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোন নেতা পারেননি। কেবল দুঃখ হয়, তিনি যদি দীর্ঘজীবন লাভ করতেন, তাহলে আমাদের জাতীয় জীবনে কেবলমাত্র স্বরাজই এনে দিতেন, তা নয়—আনতেন আমূল পরিবর্তন। এমনি করে গ্রামবাসীরা অন্ধ মোহের বশে শহরে ছুটে এসে কেবল শহরের লোকসংখ্যা বাড়াতো না। আর, আমাদের ঐতিহ্যময় গ্রামগুলিও এমনি নিস্তেজ শীতের শীর্ণা নদীর মত কোনরকম ভাবে টিঁকে থাকতো না।—

গ্রামের কৃষি, কুটিরশিল্প, পল্লীশ্রী আজ সব হতমান হতে বসেছে শহরের উগ্র বিলাসিতার স্পর্শের প্রভাবে। গ্রামের গ্রাম্য সরলতা আজ তাই হারিয়ে গেছে। মনে পড়ে, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর 'পালামৌ' প্রবন্ধে বলেছিলেন, 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। চাষা যখন চাষ করে, তখন হাতে যদি একটা ট্রানজিস্টার থাকে, তবে চাষার কথার মধ্যে যে সরলতাটুকু লুকিয়ে আছে, তা হারিয়ে যায়। কিন্তু আজ পল্লীগ্রামে তার এই রূপটিই দেখতে পাওয়া যাবে।

যাক্, যা বলছিলাম—জেল থেকে বাড়ী এলেন তিনি, একমুখ দাড়ি—মেয়েরা বললেন, 'বাবা, আগে দাড়ি কাটো।' শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে। যে-দেশবন্ধু জেলে গিয়েছিলেন, আর যিনি

ফিরে এলেন, শরীরের দিক থেকে তাঁরা দুজন যেন আলাদা মানুষ। রোজই বিকেলের দিকে জ্বর আসতো অল্প অল্প—শরীরে রক্ত ছিল খুব কম। কিন্তু মনের জোর তিনি হারাননি একটুও—সামনে এখনও কর্মদায়িত্ব বিরাট।

তিনি হাকিম আজমল খাঁ কর্তৃক গঠিত Civil disobedience-এর সভ্যদের আহ্বান করে দেশের পরিস্থিতি বিষয়ে এবং Council প্রবেশ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করলেন।

এদিকে দেশের লোক তাঁদের অন্তরের দেবতা দেশবন্ধুকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বিভিন্ন সভা-সমিতির আয়োজন করলেন। কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে কেউই চোখের জল রোধ করতে পারলেন না।

মির্জাপুর পার্কে অভিনন্দন পত্র পাঠ করলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সেটি এইরকম ঃ—

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু দাশ মহাশয়

শ্রীকরকমলেষু

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন! হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তিপথযাত্রী যত নরনারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া স-গৌরবে, সবিনয়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মা আমাদের আজ অবমানিতা, শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ, হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশ্যে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার

কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্যবিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ দান বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্বলোকচক্ষুর সাক্ষাতে দেশে স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে কথা তুমি বারবার বলিয়াছ, স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' এই তো তোমার ব্যথা, এই তো তোমার দান।

ছলনা তুমি জানো না, মিথ্যা তুমি বল না—নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না। তাই বাংলা যখন তোমাকে 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় কোথাও দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত দেশ তাইতো আজ তোমার করতলে। তাইতো তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদেরও।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। ঐ ঐশ্বর্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানব জাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল।

হে চিত্তরঞ্জন! তুমি আমাদের ভাই, আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয়—অনেকদিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্বের বড় গর্ব—বাঙালী তুমি—তাইতো সমস্ত বাঙলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছি। আর আনিয়াছি বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্বাদ! তুমি চিরজীবী হও! তুমি জয়যুক্ত হও!—তোমার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীগণ। (সংক্ষেপিত)

এছাড়া দেশের ছাত্রসমিতি একটি আলাদা সভা করে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল। (সুভাষচন্দ্রের পত্র দ্রষ্টব্য)

জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন, "প্রতি কার্যেই সত্য একমাত্র পথ এবং রাজনীতিও সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।"

শরীর খুব খারাপ, তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন, কিন্তু দেশের অবস্থাও ততোধিক খারাপ। এর মধ্যে ঠিক হলো তাঁর ছোট কন্যা কল্যাণীর বিয়ে। ১৭ই অগাস্ট উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সংগে ছোট মেয়ের বিয়ে দিলেন। আর এই ভাস্করানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গুরু ও বিরোধী সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধায়ের দৌহিত্র। হিন্দুমতেই বিয়ে দিলেন তিনি —তাঁর বড় মেয়ে অপর্ণার বিয়ের মত সমারোহ এই বিয়েতে হয়নি। আর হবেই-বা কি করে? অপর্ণার যখন বিয়ে হলো, তখন তিনি হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী গগনের ভাস্কর—আর আজ অসহযোগ আন্দোলনের দরিদ্র সন্ন্যাসী।

বিয়ে মিটে গেল—অগাস্ট মাসেই তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন দার্জিলিং-এর পথে। তাঁর সহপাঠী ও অন্যতম সুহৃদ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত যিনি তাঁর লণ্ডন-যাত্রার সংগী ছিলেন, তিনি তখন দার্জিলিং-এ দুই বন্ধুতে মিলে নানা আলাপ-আলোচনা চলতো—তার মধ্যে দেশের কথাই বেশি। দুটি বিষয় এই সময় চিত্তরঞ্জনের হৃদয়কে ব্যাকুল করেছিল, তার প্রথমটি হচ্ছে কাউন্সিলে প্রবেশ এবং দ্বিতীয়টি হলো, পল্লীসংগঠনের কাজ।

তিনি বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বলতেন, "গভর্ণমেণ্ট যদি আমাদের সম্পূর্ণ এবং অখণ্ড ক্ষমতা দান করেন, তবেই আমি সন্তুষ্ট।"

তিন সপ্তাহ রইলেন দার্জিলিং-এ, কিন্তু শরীরের কোন উন্নতিই হলো না। ফিরে এলেন কলকাতায়। ১৭ই সেপ্টেম্বর স্ত্রী, জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং জামাতাসহ যাত্রা করলেন কাশ্মীরের পথে। দেশবন্ধুর উপস্থিতির খবর পেয়ে প্রতিটি স্টেশনেই জনতা তাঁদের অভূতপূর্ব অভিনন্দন জানালো।

এই সময় দেশবন্ধুর শরীর খুবই খারাপ। প্রায় রোজই জ্বর আসতো। এই অবস্থায় তাঁরা বারমূলায় এসে পৌছে ডাকবাংলোয় বিশ্রাম করতে লাগলেন।

এসে উপস্থিত হলেন কাশ্মীর রাজ্যের পুলিশ সুপার। বললেন, 'মহারাজার আদেশ, আপনি কোন রাজনৈতিক কার্যে লিপ্ত হবেন না—এইরূপ প্রতিশ্রুতিপত্র দিলে আপনি মহারাজার প্রাসাদে অবস্থান করতে পাবেন। তা না করলে আপনাকে কাশ্মীর রাজ্যে অবস্থান করতে দেওয়া হবে না।'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি স্বাস্থ্যের জন্য এখানে এসেছি। কোন রাজনৈতিক কারণে নয়। তথাপি আমি কোন লিখিত প্রতিশ্রুতি পত্র দেব না।'

সহযাত্রীদের বললেন, 'চলো, আর এখানে নয়। কিছুতেই Understanding দেব না।' তাঁরা পথ বেয়ে আবার মারী পৌঁছলেন—মারীর বন্ধুর পার্বত্য পথের প্রবল ঝাঁকুনিতে এলো প্রচণ্ড জ্বর। সেই সময় এলেন এক সাধু। তিনি দেশবন্ধুকে একটি মাদুলী দিয়ে বললেন, 'এটি গ্রহণ কর, তোমার শরীর ভাল হবে।' সত্যি ঘটলও তাই, আস্তে আস্তে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল এবং তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন।

কিন্তু এতো কাছে এসেও কাশ্মীর যাওয়া তাঁর ভাগ্যে আর ঘটল না। কাশ্মীরের মহারাজের এই শঙ্কিত অবস্থা দেখে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের জনমানসে দেশবন্ধু কি অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাই তাঁর উপস্থিতি মাত্রই মহারাজা শঙ্কিত হয়ে ভেবেছিলেন, না জানি কি বিপ্লব আনবেন তিনি জনমানসে!

কিন্তু দেশের লোক রাজনৈতিক নেতাকে কেবলমাত্র নেতা হিসাবেই দেখে—তাঁরও যে একটা জীবন আছে এবং স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে, একথাটাই তারা ভেবে দেখে না। তারা ভাবে, রাজনৈতিক নেতার জীবনে প্রতি পদক্ষেপেই জড়িয়ে আছে রাজনীতি!

যাইহোক, মারীর নয়নমুগ্ধকর পার্বত্যশোভা অবলোকন করে

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কবিমন। পর্বতমালার দিকে নিবিষ্টচিত্তে তাকিয়ে থাকতেন তিনি। বলতেন, "This appears to be the best hill station in India."

এই সময়ে নানা প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা চলতো। রামকৃষ্ণ-সারদার কথা বলতে ভালবাসতেন তিনি। স্বদেশের কাজের কথা উঠলে বলতেন, "There must be a determination to do or to die. Everyone ought to give his utmost to the cause we hold dear."

আর এই বিষয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই সামর্থ্য অনুযায়ী আনুকূল্য আবশ্যক। দেশবন্ধু মারী অবস্থান কলেই সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের রিপোর্টে Council প্রবেশ প্রস্তাব সমর্থিত হয় এবং তা নিয়ে চার-দিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। সুতরাং আর বেশিদিন থাকা চলল না। লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, আগ্রা, কানপুর, দেরাডুন প্রভৃতি স্থান ঘুরে তাঁরা এসে পৌঁছলেন মধ্যপ্রদেশের বুলডানা কনফারেন্সে। উপরোক্ত সব জায়গাতেই তিনি Council প্রবেশ সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের কর্তব্য দেশকে জানানো কি রকমের সরকার আমরা চাই। ব্যুরোক্রেসী এই Reformed council-এর মুখোস প'রে আছে। এই মুখোস ছিঁড়ে ফেলাই আমাদের কর্তব্য মনে করি। আমি বুর্জোয়াদের জন্য স্বরাজ চাই না। সংখ্যায় তারা কজন? আমি অগণন জনসংঘের জন্য স্বরাজ চাই। তারাই স্বরাজ অর্জন করবে।'

এই ভ্রমণকালে সব জায়গাতেই ২।১ দিন করে থাকতেন তিনি। তাঁদের গাড়ী কেটে রাখা হতো এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের স্বেচ্ছা-সেবকরা সেবাযত্ন করতেন। এর মধ্যে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কমিটির কাউন্সিল প্রবেশের রিপোর্ট বেরিয়ে গেছে এবং তা নিয়ে চতুর্দিকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে—এই সময়ে তিনি এসে পৌঁছলেন অমরা-

বতী। ছোট মেয়ে কল্যাণীর বাড়ীতে ২।৪ দিন থেকে রওয়ানা দিলেন কলকাতার পথে। ছোট্ট সিদ্ধার্থ দাদুর সংগে প্রায় সব সময়েই থাকতো আর দেখতো—দাদুর ভাগ্যে জোটে রাশীকৃত মালা—কেমন করে জানি না, সেই ছোট্ট শিশুটির ধারণা হয়েছিল দাদুর এই মালাগুলির প্রকৃত অধিকারী সে। সব সময়েই বলতো, 'দাদু, মালা দাও।'

বিশেষ করে মজার ঘটনা ঘটেছিল অমরাবতীতে সভায় বক্তৃতা দেবার পর। বক্তৃতা শেষ করে বসতে যাবেন তিনি, শিশু সিদ্ধার্থ 'আমার মালা' বলে দাদুর গলা থেকেই মালা টেনে নিয়ে পরতে চাইলো! শিশুর এই কাণ্ড দেখে তো সভার সব লোক হেসেই অস্থির! দাদু স্নেহভরে কাছে টেনে নিলেন নাতিকে। পরে বাড়ী এসে মেয়েকে বললেন, "তোর ছেলে বক্তা না হয়ে যায় না।" দাদুর কথাটা মিথ্যে হয়নি। সিদ্ধার্থ রায় আজ শুধু নামী ব্যারিস্টারই নন, কংগ্রেসের একজন অন্যতম নেতাও বটে!

১০ই নভেম্বর দেশবন্ধু সপরিবারে ফিরলেন কলকাতায়। ফিরে এসেই তিনি গয়া কংগ্রেসের অভিভাষণ লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এদিকে চারিদিকে তাঁর কাউন্সিল প্রবেশের মতবাদ নিয়ে সুরু হয়েছে তীব্র উত্তেজনা আর তারই ফলস্বরূপ দেশবন্ধুকে অপরিসীম নিন্দা, গ্লানি ও অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। যে-দেশের লোক ভালবাসার অর্ঘ্যস্বরূপ তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেছিল, সেই দেশের লোকই তাঁকে আখ্যাত করলো 'দেশশত্রু' রূপে। শুধু কি তাই! পামর, পাষণ্ড আরও নানাবিধ নিষ্ঠুর বিশেষণে বিভূষিত করলো—একজন Real Patriot-এর ভাগ্যে এই নির্যাতন জুটেই থাকে। মনে পড়ে Robert Browning-এর Patriot বলছেন :—

"Thus I entered and
Thus I go."

এই প্রবেশ আর প্রস্থান, এ দুয়ের মধ্যে কতই-না তফাৎ! দেশবন্ধুর অবস্থাও হলো তাই—যে রসা রোডের বাড়ী একসময় সহকর্মী-

দের কলরব আর রাজনৈতিক আলোচনায় থাকত মুখরিত, তা হয়ে গেল নীরব নির্জন! সংবাদপত্র সবই বিরুদ্ধবাদী। এদিকে হাতে নেই একটি পয়সা—তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের অর্থ সব শেষ! কংগ্রেসের বাড়ী ভাড়াই বাকী ত্রিশ হাজার টাকা। কি যে করেন? কিন্তু জীবনে সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল তাঁর মনোবল। তাই নিজের সঙ্কল্প ও সাধনার পথ থেকে এক চুলও সরে দাঁড়ালেন না।

অবশেষে এলো প্রকাশ্য সভায় তাঁর মতবাদ প্রচারের শুভলগ্ন। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। সভায় উঠে দাঁড়ালেন ভাষণ দিতে।

গয়া অভিভাষণ

আইন ও শৃঙ্খলা :

আজ ভারতে এক মহা সমস্যার দিন এসেছে এবং তার ফলে আমাদের শাসন সম্প্রদায় এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকগণের সঙ্গে সাধারণ লোকের একটা পরিষ্কার বিচ্ছেদ ঘটেছে। দেশে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টভাবে জেগেছে তা দমনের জন্য আমাদের শাসক সম্প্রদায় বিশেষ করে গত বছর থেকে যে তাণ্ডবনীতি অবলম্বন করেছেন, আমাদের স্বদেশীয় উদারনৈতিক নেতারা তার সমর্থন করে আসছেন। তাঁরা শাসক সম্প্রদায়ের উচ্চারিত 'আইন ও শান্তির' ধুয়ো তুলেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, সর্বত্র এই একই ধুয়ো তুলে শাসক সম্প্রদায় মনুষ্য সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবার অন্তিম চেষ্টা করেছে।

এদেশে আমরা আজ সেই পুরাতন অভিনয়েরই পুনরাবৃত্তি দেখছি। আমাদের শাসনকর্তারা এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকগণ বলেছেন, সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট দেশের মঙ্গলের জন্য একান্ত দরকার এবং সেই জন্যেই প্রজাগণের সহস্র অসুখ, সহস্র অভিযোগ থাকলেও গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব হানিকর কোন কাজ করার অধিকার প্রজার নেই। গভর্ণমেণ্টের

উপর তুমি সন্তুষ্ট না হও, চুপ করে থাক; গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহ-যোগিতা করো না—বড় জোর এই পর্যন্ত পার। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ বিরুদ্ধতা কিংবা গভর্ণমেণ্টের কোন নীতি বা কোন কার্য-পদ্ধতি রোধ করা—এ তোমার অধিকারের বাইরে। এই হ'ল শাসক-তন্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে সমস্ত অত্যাচারী রাজা ও শাসকগণ এই সিদ্ধান্তকে আবহমান কাল থেকে অভ্রান্ত মনে করে এসেছেন।

আমি আইন ও শান্তির দাবী অস্বীকার করতে চাইনে। আমার যুক্তি হচ্ছে—প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রত্যেকে জাতির এটা হচ্ছে ঈশ্বরদত্ত অধিকার, যে-সত্যের উপর দাঁড়িয়ে সে অসত্য বা অধর্মমূলক আইন অমান্য করে। আসল কথাটা এই যে, আইন ও শৃঙ্খলা মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট, মানুষ আইন ও শৃঙ্খলা মানবার জন্য সৃষ্ট নয়।

আমাদের শাসনকর্তারা যে এই অলীক আইন ও শান্তির দাবীর আড়ালে নিজেদের ক্ষমতার দাবীকে আচ্ছাদিত করছেন, এটা আমি মনে করি দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। মানুষ মিথ্যা দাবী তখনই করে, যখন তার সত্য দাবীর কিছু থাকে না। শাসনযন্ত্র যে ভেঙে পড়বার মত হয়েছে, এই মিথ্যা দাবীই তার প্রমাণ। এখন আমাদের সত্যের আদর্শকে আমাদের সামনে উজ্জ্বল করে তুলতে পারলে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবা করে যেতে পারলেই অচিরে স্বাধীনতা আমাদের করতলগত হবে।

আদর্শ—জাতীয়তা :

আমাদের আদর্শ কি ?—এ প্রশ্নের উত্তরে সর্বপ্রথম আমার বলতে ইচ্ছে হয়—জাতীয়তা। জাতীয়তা বলতে আমি কোন বিশেষ গুণ বা তত্ত্ব বুঝিনে।' জাতীয়তা একটা ভাবের ক্রমবিকাশের পদ্ধতি যার ভিতর দিয়ে গিয়ে প্রত্যেক জাতি আত্মোপলব্ধি করে ও পরিণতি লাভ করে। কোন জাতির প্রকৃত আত্মোপলব্ধি হলে সে এমন একটা শক্তিলাভ করবে, যা অন্য জাতির পক্ষে কল্যাণকর না হয়ে পারবে

না। জগতের বৈচিত্র্য ও ঐক্য সমান সত্য, সমান সনাতন। যখন প্রত্যেক জাতি খণ্ডভাবে আপন বিশিষ্ট পথে তার অন্তর্নিহিত পূর্ণতাকে লাভ করবে, তখন তাদের খণ্ড খণ্ড বিচিত্র পূর্ণতা মানব জাতির বিরাট সভাস্থলে এমন অপরূপ সখ্যে মিলিত হবে যে, সেই মহামিলনের পূর্ণতর ঐক্যে তাদের ভেদ ও খণ্ডতা সার্থক হয়ে উঠবে। ইউরোপের জাতীয়তা সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত পরস্পর বিদ্বেষী।

আমরা যদি বুঝি আমাদের জাতীয়তা সমগ্র মানবজাতির অনন্ত পরিমাণ সমুদ্রে একটি জলধারা, যার সংগে মিলিত হওয়াই আমাদের জাতীয় জীবনের চরম সার্থকতা এবং আমরা যদি না ভুলি যে, আমাদের এই জীবনের ধারা যুগযুগান্তর ধরে কত ভাব, কত সাধনার দ্বারা পরিস্ফুট হয়ে এসেছে, তাহলে আমরা আমাদের বিগত ও ভবিষ্যৎ জীবনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব জাতীয়তার সৃজন করে তুলতে পারব—যার সত্যের আভায় সমস্ত মনুষ্যসমাজ গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে।

এই জন্যই আমাদের একান্তমনে জাতীয়তার সাধনা করতে হবে। এই জাতীয়তার সাধনাই স্বরাজ সাধনা।. কারণ যে-পরিমাণে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনকে সত্য করে তুলতে পারব, সেই পরিমাণে আমরা স্বরাজের পথে অগ্রসর হব। স্বরাজ কি, এ ধাঁধা অনেকের মনে আছে। স্বরাজের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কারণ স্বরাজ জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। স্বরাজ কোন বিশেষ আকারের শাসন পদ্ধতি বা গভর্ণমেণ্ট নয়। জাতীয় জীবনের প্রকৃত অভিব্যক্তির সঙ্গে স্বরাজ এক সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং বর্তমান ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা, বড় সাধনা হচ্ছে স্বরাজ।

অহিংসা ও অসহযোগ একমাত্র পন্থা ঃ

আমি জানি, জীবনে বিদ্রোহ নিরর্থক নয়, অন্যায়ের ও অধর্মের গতিরোধের জন্য বিদ্রোহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একথা পাকা করে বুঝতে হবে যে, হিংসা বিদ্রোহের অস্ত্র নয়—হিংসা আপন উদ্দেশ্য-কেই ব্যর্থ করে। অহিংসা ক্ষিপ্রপদ নয়, তার গতি মন্দ কিন্তু অহিংস

ধীরে ধীরে যখন মানুষের মনে স্থান লাভ করে, তখন মানুষ পাকা করেই স্বরাজের পথ ধরে। ভারতবাসী আজ এই পথের সন্ধান পেয়েছে।

অসহযোগের প্রয়োগ :

দেশের বর্তমান অবস্থায় কি করে কোন বিষয়ে অসহযোগ প্রয়োগ করলে সিদ্ধিলাভ হবে, এখন তাই আমাদের বিচার্য। অনেকে মনে করেন, এই কয় বৎসর তাড়নে দেশের লোকের মনে এমন একটা দুর্বলতা, এমন একটা ক্লৈব্য এসেছে যে, আবার উৎসাহের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন চালাবার ক্ষমতা তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি একথা মানিনে। দেশে একটা বাহ্যিক শ্রান্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অসহযোগ এবং অহিংসা দেশে যে প্রাণ জাগিয়ে তুলেছে, তার মধ্যে স্বরাজের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অমর শক্তিতে বিরাজ করছে। এই শক্তিকে জাগ্রত করে সংহত করে তাতে কর্মপ্রেরণা দেওয়াই আমার বিবেচনায় এখন কংগ্রেসের একমাত্র কাজ।

ব্যবস্থাপক সভা বর্জনের কথা :

ব্যবস্থাপক সভা বর্জন সম্পর্কে আলোচনা চলছে। বর্তমান ব্যবস্থাপক সভা ভারতীয়দের পক্ষে অস্বাভাবিক। বিদেশী পার্লামেন্ট এই অস্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করেছে। আমরা ইহাকে স্বরাজের ভিত্তি বলি না। হয় ব্যবস্থাপক সভা আমাদের কার্যোপযোগী করে দিতে হবে—নয় তো এগুলো নষ্ট করতে হবে। আমরা ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করে নিজেদের ইজ্জৎ নষ্ট করছি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি যেন আমাদের স্বরাজ যাত্রার অন্তরায় হয়ে বিদ্যমান না থাকে। এগুলি বিদেশী ব্যুরোক্রেসীর ছদ্মবেশ বা মুখোস—ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করে ভিতর থেকে তা বর্জন করতে হবে।

আর এই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা অসহযোগের নীতিবিরুদ্ধ নয়। হয় তো ব্যুরোক্রেসী অসহযোগীদিগকে ব্যবস্থাপক সভায়

প্রবেশ করতে দেবে না। যদি তাই হয়, তবে অসহযোগ অনুষ্ঠান আরও বলসঞ্চার করবে।

ভারতের এই তরুণ জাতির পরিপুষ্টির জন্য সর্বদা সংগ্রামের প্রয়োজন। দেশে অহিংস বিপ্লব দেখা দিয়েছে। আজ ব্যবস্থাপক সভার দ্বার মুক্ত। আমার তথায় আক্রমণ করবো। কাল যদি সে-দ্বার রুদ্ধ হয়, আমরা অন্যদিক থেকে আক্রমণ চালাবো। এইসব ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে ব্যুরোক্রেসী নতুন শক্তিলাভ করছে। ব্যুরোক্রেসী যদি লোকমত না মানে, আসুন, আমরা ব্যবস্থাপক সভা ভঙ্গ করি।

স্বরাজ রূপের ইঙ্গিত :

আমি পূর্বে বহুবার বলেছি যে, স্বরাজ জিনিসটা কি রকমের হবে, তা বোঝানো যায় না। কেন না, স্বরাজ হচ্ছে জাতীয় অভিব্যক্তির প্রকটরূপ। জাতি যে ভাবে আত্মবিকাশ করবে, স্বরাজ সে-ভাবে গড়ে উঠবে। অনেকে মনে করেন, স্বরাজ লাভের জন্যে যা কিছু চেষ্টা, যা কিছু ত্যাগ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেই করেছে, সুতরাং স্বরাজ লাভ হলে তার যা কিছু সুখ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীরাই ভোগ করবে। অন্য সকলের যে দুঃখ সেই দুঃখ।

এ আশঙ্কা অমূলক। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাও বলতে পারি না। এদেশে স্বরাজলাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা আছে কিন্তু সাধারণ লোক যদি এ সাধনায় যোগ না দিতো, কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেষ্টাতেই স্বরাজলাভ হতো এবং তা তারা স্ব-শ্রেণীর ভোগের জিনিস করে তুলত, তাহলে আমি তাকে কখনই স্বরাজ বলে স্বীকার করতাম না। সরকার হবে জনগণ কর্তৃক পরিচালিত এবং জনগণের জন্য।

আমার কাছে সুগঠিত পল্লীসমাজ ও সংঘবদ্ধ পল্লীর স্থানীয় স্বাধীনতার মূল্য স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে বেশি। উপস্থিত পল্লীসমাজের জীবন গঠনের সহায়তার জন্য প্রাদেশিক ও ভারত সরকারের হাতে যথেষ্ট

ক্ষমতা দিয়ে রাখতে হবে। নিরন্ন শ্রমজীবী ও কৃষকেরাই দেশের প্রধান শক্তি। এখন এই শক্তি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল। এরা জাতীয় মহাসমিতির মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষা এদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেয়ে কম নয়। ধনীর পীড়ন এদের ওপর দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তবে এদের যদি কংগ্রেস আশ্রয় না দেয়, তাহলে এরা প্রাণের দায়ে স্বতন্ত্র দল গঠন করবে। তখন কংগ্রেসের সংগে তাদের যোগ ছিন্ন হয়ে যাবে এবং অন্য দেশের ন্যায় এদেশেও দলে দলে বিরোধ বাধবে।"

ভাবি, সেদিনের দেশবন্ধুর আশঙ্কা আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনে কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠেছে, যদিও বর্তমানের মত ভয়াবহ এবং সংকীর্ণ রাজনীতির কথা কল্পনাও তিনি করতে পারেননি।

দেশবন্ধুর এই সুযুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ যোগ্য সমাদর লাভ করলো না। চারিদিক থেকে প্রতিবাদ উঠলো। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা মানেই তাদের মনে হয়েছিল সহযোগিতা, সুতরাং তাঁদের মতে, ব্যবস্থাপক সভা বর্জন না করলে অসহযোগ নীতি মেনে চলা সম্ভবই নয়। Council প্রবেশ প্রস্তাবে পরাজিত হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—অন্তর দুঃখে ও বেদনায় ভরে গেল, কিন্তু বাইরে সে-ভাব প্রকাশ হতে দিলেন না। আহত সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন, "Although to day I differ from the majority of the members, I have not given up the hope that a day will come when I shall get the majority on my side." (যদিও আজ আমি আমার অধিকাংশ সভ্যের সংগে ভিন্নমতাবলম্বী হয়েছি—তবে অচিরকাল মধ্যেই অধিকাংশ সভ্যকে আমি স্বমতে আনয়ন করবো।)

যেই কথা সেই কাজ—মনের সঙ্কল্পকে তো বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে, উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু মনে একটা সংশয়ের কাঁটা—পারবো কি জয় করতে এই প্রতিকূল ঝড়ের মুখ থেকে আমার

সাধের তরীখানি—যা সোনার স্বপ্নে ভরা।

হ্যাঁ, আপনি পারবেন, এই উত্তর নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন বাংলাদেশের অন্যতম ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বললেন, কিছু ভাববেন না আপনি। এই তো সাধনার পথ। যে সত্য আপনি একান্তমনে উপলব্ধি করেছেন, তা নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করুন।

দেশবন্ধু—সবাই যে বিপক্ষে, শরৎবাবু।

শরৎচন্দ্র—হোক বিপক্ষে। সকলের মত তো আপনার জন্যে নয়, বরং আপনার মত সকলের। বুঝেছেন, সত্যের বাণী প্রথমে কেউ কানে তোলে না। তাই সতীদাহ বন্ধ করতে গিয়ে রামমোহনকে দুর্নাম কিনতে হয়েছিল, বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অপদস্থ হয়েছিলেন। আপনাকেও ভুল বুঝবে কিন্তু শুনবে—কাল না হয় পরশু, পার্থক্য যা এখানেই।

পরাজয়ের ক্ষোভে তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ করলেন। শুধু ভাবছেন, কেমন করে জয়যুক্ত হবেন? কাউন্সিলে প্রবেশ করে প্রতি কাজে বাধা না দিতে পারলে ব্যুরোক্রেসীর মুখোস খুলে দেওয়া যাবে না। ধ্বংসের মধ্যে থাকে সৃষ্টি—প্রলয়ের দেবতার হাতেই থাকে সৃজনের বাণী। সেই প্রলয়ের দেবতার আহ্বান দেশবন্ধুর কানে পৌঁচেছে—তাই এ ব্যবস্থাপক সভা তিনি ভাঙবেন এবং তাকে নতুন রূপ দেবেন। এর জন্য সব বাধাকে অমিতবিক্রমে পরাস্ত করতে হবে। হোক না সহযোগী ও সহকর্মীরা বিরুদ্ধমতবাদী! নিজের মত নিয়ে কি গড়ে তুলতে পারবেন না একটা দল? তবে সে-দল কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে—কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাননি তিনি।

ভাবি, আমাদের এই চোদ্দটা দলের দলাদলির দিনে দেশবন্ধুর এই নীতি যদি আমাদের দেশের লোকেরা গ্রহণ করতেন, তবে আজ দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এমন দুর্বিষহ হয়ে উঠত না।

এর উত্তরে অনেকে হয়ত বলবেন, তখন দেশের লোকের একটাই

উদ্দেশ্য ছিল—সেটা হচ্ছে, স্বাধীন দেশের স্বপ্ন। কিন্তু আজ যবনিকা পাল্টালেও উদ্দেশ্য তো সেই একটাই—সেটা হচ্ছে, শাসনযন্ত্রটি হাতে নেওয়া। আর যখনই যে সরকার শাসনযন্ত্রটি হাতে নেয়, তার বিরুদ্ধে সমস্ত দলগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে, তার দোষত্রুটি দেখায়।

যেমন, আজ দেশের প্রায় অধিকাংশ লোকই কংগ্রেসের সুতীব্র আলোচনায় মুখর—কারণ অপরাধ, কংগ্রেস স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘকাল মন্ত্রীত্ব গ্রহণের দায়িত্ব বহন করেছে। তাই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ এবং আরও অনেক রাজ্যে কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়েছে, হারিয়ে ফেলেছে সে তার ঐতিহ্য, শক্তি ও মর্যাদা। তার জন্য কংগ্রেসের দোষত্রুটি অবশ্যই আছে অস্বীকার করছি না, কিন্তু আমরাও কম দায়ী নই। কারণ কংগ্রেসের মধ্যে অন্যায় দুর্নীতি তো আমরাই এনেছি—আর প্রতিবাদস্বরূপ তুলে ধরেছি চোদ্দটা দল। আজ রাজনীতি বলতে আমরা বুঝি দল আর দলাদলি—যে জিনিসটাকে দেশবন্ধু মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। একতার অভাবই আজ আমাদের রাজনৈতিক জীবনের এই পতনের জন্য দায়ী।

যাক্, যে কথা বলছিলাম। ১৯২২ সালে ৩১শে ডিসেম্বর পণ্ডিতজীর বাসাবাড়ীতে জন্ম নিল স্বরাজ্য দল—প্রথমে এ দলের নাম ছিল কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ্য পার্টি। এই দলের প্রথম সভায় সভাপতিরূপে দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবন্ধু বলেন, "গয়া অধিবেশনের প্রস্তাবের সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। ঐভাবে কার্য চলিতে পারে না এবং স্বরাজের পথ এখনও সুদূর। এখন আমাদের কর্তব্য কি? আমরা কি একেবারে কংগ্রেস ছাড়িয়া দিব? না, কংগ্রেসে থাকিয়াই সমগ্র সভ্যমণ্ডলী ও দেশবাসীকে স্বমতে টানিয়া আনিব। আমার বিশ্বাস, বর্তমান সময়ে অবস্থানুসারে কেবল চরকার সহায়তায়ই স্বরাজ লাভ হইবে না। যেমন চরকা ও গঠনমূলক কার্য আবশ্যক, সেরূপ Council-এ প্রবেশ করিয়াও অমাত্যতন্ত্র অচল করা একান্ত কর্তব্য। এই পথেই দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।"

১৯২৩ সালে জানুয়ারী মাসে বোম্বাইতে একটি ক্ষুদ্র কমিটির সাহায্যে এর নিয়মাবলী গঠিত হয়, ফেব্রুয়ারী মাসে জেনারেল কমিটিতে তা বহাল হয়। এই সভাতেই কংগ্রেস খিলাফৎ কথাটি বর্জন করে এই দলের নাম হয় স্বরাজ্য দল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল এবং হাকিম আজমল খাঁন এই দলেন অন্যতম নেতা। আর বাংলাদেশ থেকে এই দলে যোগদান করলেন সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, সাতকড়িপতি রায়, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং হেমপ্রভা মজুমদার। এঁরা সবাই প্রাণপণ স্বরাজ পার্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এইভাবে কংগ্রেসের মধ্যে গড়ে উঠল দুটি দল—পরিবর্তনবিরোধী এবং পরিবর্তনবাদী।

দেশবন্ধু ফিরে এলেন কলকাতায়—সংগী শুধু তাঁর অপরিসীম মনোবল বিপক্ষে—দেশের প্রতিকূল আবহাওয়া তখনও পুরোদমে বইছে। নিজের দলের মতবাদ প্রচারের জন্য একখানি পত্রিকাও হাতে—প্রতিষ্ঠা করলেন চারপৃষ্ঠাওয়ালা দৈনিক এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা 'বাঙ্গলার কথা'—সম্পাদক সুভাষচন্দ্র। নূতন একটি দলকে চালাতে হলে টাকারও দরকার, কিন্তু হাতে একটি পয়সাও নেই!

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। এক ঝড়-জলের রাত, তখন ৯৷১০ টা হবে। দেশবন্ধু তাঁর অন্যতম সহযোগী সুভাষচন্দ্র এবং ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এক ধনীর বাড়ী গেছেন অর্থ সংগ্রহ করতে। এই ধনীটিকে একবার দেশবন্ধু জেলের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

তাঁরা তিনজন বসে আছেন তো আছেনই, ধনবানের আর দেখা মেলে না। শরৎচন্দ্র বিরক্ত হয়ে বললেন, "গরজ কি একলা আপনারই? দেশের লোক যদি সাহায্য করতে এতটা বিমুখ হয়ে ওঠে তো তবে থাক।"

দেশবন্ধু বললেন, "এ ঠিক নয়, শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই। আমরা কাজ করতে জানিনে। আমরাই তাদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারিনে। বাঙালী ভাবুকের জাত। বাঙালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝবে, তার সর্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে।"

এমনি ছিল তাঁর স্বজাতি প্রীতি—জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তিনি বিশ্বাস হারাননি। তাই পরাজয়ের মেঘ কেটে গিয়ে জয়ের স্বর্ণোজ্জ্বল উষা বারেবারে অভিনন্দিত করেছে তাঁর অমর জীবনের বন্ধুর চলার পথকে।

স্বরাজ্য দল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অপ্রমত্ত হয়ে উঠলো আর তার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম সুরু করলেন দেশবন্ধু। এই সময়ে শান্তিপ্রয়াসী নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই পরিবর্তন-বিরোধী ও পরিবর্তনবাদী দল (অর্থাৎ স্বরাজ্য দলের) একটা মিলনের চেষ্টা করেন। এর কারণ, তিনি অনুভব করেছিলেন যে, দেশবন্ধুর সহযোগিতা ও নেতৃত্ব ভিন্ন জাতীয় কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়বে। তিনি মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে বললেন যে, এপ্রিল মাস পর্যন্ত কংগ্রেস ও পরিবর্তনবাদী দল এক সংগে সম্মিলিত হয়ে চাঁদা তুলবেন ও সভ্য করবেন। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশ যদি সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের জন্য প্রস্তুত না হয়, তাহলে মে মাস থেকে স্বরাজ্য দল কাউন্সিল প্রবেশের কাজে অগ্রসর হবেনএবং এ ব্যাপারে মৌলানা আজাদ ও তাঁর দলবল স্বরাজ্য দলকে সহযোগিতা করবেন।

২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে হাকিম আজমল খাঁ, সরোজিনী নাইডু এবং রাজাগোপালাচারীকে নিয়ে একটি যুক্ত বৈঠকে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের এই যুক্ত কর্মপদ্ধতি স্থির হলো—কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ঘটনার মাত্র ৫/৬দিন পরেই রাজাগোপালাচারী তার করে দেশবন্ধুকে জানালেন যে, এই যুক্ত কর্মপদ্ধতিতে তাঁরা যোগদান করতে পারবেন না, কারণ কংগ্রেসের অন্যতম সদস্য বল্লভভাই প্যাটেল এবং যমুনালাল বাজপেয়ী

এই প্রস্তাব সমর্থনে অসম্মতি জানিয়েছেন।

এরপর দেশবন্ধু দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য ও বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। ১১ই মে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যোগদানের পর দেশবন্ধু বোম্বাই নগরীতে এলেন।

২৭শে মে বোম্বাইতে পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন ও জহরলাল নেহরুর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বসল কংগ্রেসের এই অধিবেশন। এতে বলা হলো যে, স্বরাজ্য দল আপন উদ্দেশ্য নিয়ে Council প্রবেশের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী স্থির করলে কংগ্রেস তাদের বাধা প্রদান করতে পারবে না।

এই সময়ে দেশবন্ধু জহরলাল নেহরুকে স্বরাজ্য দলে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানান—তরুণ জহরলালের কর্মশক্তির কিছুটা পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে একসংগে কাজ করার পর। কিন্তু জহরলাল যোগদান করেননি। এই সময়কার কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "আমার কারামুক্তির কিছুকাল পরেই দেশবন্ধু দাশ আমাকে স্বরাজ্য দলে যোগ দেওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তির নিকট আমি আত্মসমর্পণ না করিলেও আমি যে কি করিব, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না।"

ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, সাহস ও কর্মনিষ্ঠার সংগে হৃদয়ের এই দোলাচল চিত্তবৃত্তি নিয়ে জহরলালকে পরবর্তী জীবনে অনেকবার প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আসলে তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে গান্ধীশিষ্য, তাই সেই পতাকাতল থেকে সরে এসে দেশবন্ধুর দলে যোগদানের ইচ্ছে থাকলেও সাহস ছিল না।

বোম্বাই কংগ্রেস থেকে কিছুটা আশার বাণী নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। হরিশ পার্ক ও মির্জাপুর পার্কে জনসভা করে কলকাতাবাসীকে স্বরাজের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়ে তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন দক্ষিণ ভারত। চিদম্বরম, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর, মাদুরা,

গুনটুর, চিত্তুর, সালেম প্রভৃতি স্থানে তিনি স্বরাজের বাণী প্রচার করে ফিরতে লাগলেন। তাঁর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে একটি বক্তৃতা এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ—

"Am I a rebel? I would rather rebel against the Congress and any institution in India if that felt that the realisation of the demand of Swaraj makes it necessary. I want Swaraj. I want my liberty. I am prepared to fight. I am not ever a coward in my life. I want to fight and if necessary, I am prepared to lay down my life. Begin to-day, test me and I shall prove if I cannot come to your standard."

এই ভাষণের ছত্রে ছত্রে যেন ফুটে উঠেছে স্বদেশ-সেবকের আত্মাহুতির পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। শুধু মনে প্রশ্ন জাগে, দেশকে এমন নিবিড় করে এমনভাবে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন ভারতবর্ষের আর কোন্ জননেতা? তাঁর এই উদ্দীপনাময়ী ভাষণে প্রভাবিত হয়ে গান্ধীপন্থী সমগ্র দক্ষিণ ভারতব্যাপী এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

দেশবন্ধুর দক্ষিণ ভারতের সমগ্র বক্তৃতাবলীর সারাংশ

দক্ষিণ ভারত ছিল দেশবন্ধুর মতের বিপক্ষে। এঁদের স্বমতে আনবার জন্যই দেশবন্ধু যান সেখানে। দারুণ গ্রীষ্ম, তাছাড়া থাকা-খাওয়ার অসুবিধা তো আছেই। কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে দক্ষিণ ভারতের সমস্ত জায়গা পরিভ্রমণ করে সেখানকার জনমতকে স্বীয়মতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি। সেখানকার বক্তৃতাগুলির মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে দেশবন্ধুর রাজনীতি ও স্বাদেশিকতা। বক্তৃতাগুলির সারসংক্ষেপ এখানে দেওয়া হলো।

"আমরা বর্তমানে এক বিরাট সংগ্রামের সম্মুখীন। আশা করি, সে সংগ্রামে মাদ্রাজের অধিবাসীবৃন্দও অংশ গ্রহণ করবেন। যুদ্ধ সমাসন্ন! এতকাল আমরা নিদ্রামগ্ন ছিলাম। এখন সুরু হয়েছে আমাদের জাগরণের অধ্যায়। এখন এমন একটা সময় এসেছে, যখন আমাদের কার্যপদ্ধতির সবিশেষ প্রয়োজন এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, দেশবাসী আমার কথায় কর্ণপাত করবেন।"

... ...

"আমাকে বিদ্রোহীরূপে আখ্যা দেওয়া হয়। আমি নিজেকে বিদ্রোহী বলতে জোরের সঙ্গে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ অসহযোগ আন্দোলনই তো একটা বিরাট বিদ্রোহ। আমার এ বিদ্রোহ সকল স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। যদি তা কংগ্রেসের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে হয়, তবে আমি একজন বিদ্রোহী, কারণ সত্য মতামত স্বীকার করবার মত সাহস আমার আছে। আমি তো কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাইনি—সুতরাং আপনারা বলুন, কি অর্থে আমি বিদ্রোহী? আমি দেশবাসীকে কেবল সেই পথই নির্দেশ করতে চাইছি, যা অনুকরণ করে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যস্থল স্বরাজের স্বর্ণমন্দিরে পৌঁছবেন।"

... ...

"আমাদের ত্রিবিধ বর্জনের মধ্যে রয়েছে স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত, এবং আইনসভা বর্জন। কিন্তু ব্যাপারটা আপনারা একটু ভাল করে ভেবে দেখুন। এই আইনসভায় ইংরেজদের সর্বশক্তি নিহিত। আমি সংখ্যাগরিষ্ঠরূপে কাউন্সিলে প্রবেশ করে আমাদের জাতীয় দাবী উত্থাপন করতে চাই। যদি আমার এই দাবী সমর্থিত না হয়, তবে সরকারের প্রত্যেক কাজে বাধা প্রদান করবো। আমি তাদের এই স্বৈরাচারের মুখোস খুলে দিয়ে এর সামনাসামনি দাঁড়াতে চাই। আমি চাই সব দিক দিয়ে স্বৈরাচারতন্ত্রকে আক্রমণ করে অচল করে তুলতে। কাউন্সিলের অভ্যন্তরে এই স্বৈরাচার সরকারকে অচল করে তুলতে চাই আর কাউন্সিলের বাইরে অসহযোগ

আন্দোলনকে পূর্বের চেয়ে বিরাট আকারে পরিচালনা করতে চাই। এইভাবে ভিতরের এবং বাইরের আক্রমণ দ্বারা তাদের জীবনকে সব-দিকে বিপর্যস্ত করে তুলতে চাই।"

... ...

"আমি জোরের সংগে দাবী করছি, আমাদের স্বরাজ্য দল যে অসহযোগ আন্দোলনের নীতি গ্রহণ করেছেন, তা গোঁড়াপন্থী কংগ্রেসের আন্দোলনের চেয়ে অনেক বেশি প্রাণবান।"

... ...

"আপনারা কাউন্সিল বর্জন করতে পারেন কিন্তু সেটাই ব্যুরোক্রেসীর পক্ষে আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে।"

... ...

"ক্রীতদাসগণ স্বাধীনতা চায় না, তারা শুধু অন্নবস্ত্রের উত্তম সংস্থান পেলেই খুশি।"

... ...

"আসুন, আমরা সমস্ত প্রদেশের মানুষ একত্র হয়ে কাউন্সিলের সমস্ত আসনগুলি দখল করি।"

... ...

"অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন, কাউন্সিলে প্রবেশ করবার পর আমরা যে জাতীয় দাবী উত্থাপন করবো, তার স্বরূপ কি? তা নির্ভর করবে ভোটদাতাদের কথার উপর—সুতরাং আপনারাই সে-দাবীর রূপকার। অবশ্য আপনারা যদি বলেন যে এই মুহূর্তে ইংরেজ তল্পি-তল্পা নিয়ে এদেশ থেকে চলে যাক, সেটা একটা অসম্ভব ব্যাপার—আমাদের স্বরাজ্যের দাবী উত্থাপন করতে হবে। যদি পার্লামেণ্ট বলে, আগামী দশ বছরের মধ্যে স্বরাজ প্রদান করা হবে, এবং সেজন্য নির্দিষ্ট কতকগুলি সর্ত প্রদান করে, তাহলে আমি তা নিশ্চয় মেনে নেবো।"

"রাজনীতি বিষয়ে আপনারা সকলে হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু জীবন রাজনীতির চেয়ে বড়। আমার জীবনের আদর্শের পথে আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করি। স্বরাজ লাভ না করা পর্যন্ত আমার জীবনের কোন দাম নেই। আমার দেহ ও আত্মা সব কিছুই আমি এর কাছে উৎসর্গ করেছি। আপনারা যাঁরা যুবক, তাঁরা হয়ত স্বরাজ লাভের জন্য সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারেন—কিন্তু আমার আয়ুর প্রহর তো আর খুব বেশি নেই।"

... ...

"চরকার অন্তর্নিহিত বাণী স্বাধীনতার বাণী। অন্ততঃ যন্ত্রের ব্যাপারে তো আপনাদের স্বাধীনতা থাকবে। আর এই আত্মনির্ভরতাই স্বরাজের প্রতীক। আমি চাই, আপনারা এই প্রতীককে গ্রহণ করুন। আর হিন্দুদের কাছে তো আদর্শের দামই বড়, নইলে এক খণ্ড পাথরের মধ্যে সে কেমন করে ভগবানকে পায়? সেইরূপ স্বরাজের প্রতীকরূপে আমি আপনাদের চরকার পূজা করতে বলি।"

... ...

"ধ্বংস ছাড়া কোন নতুন সৃষ্টি সম্ভব নয়—আপনারা কি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ধ্বংসসাধন না করে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন?"

... ...

"এখন জাতির কর্মশক্তিকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার লগ্ন সমাগত। তাই দেশবাসীকে আমি আমার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। আমার প্রস্তাবকে আমি কংগ্রেসের কাগজী প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই।"

... ...

"জীবন-নীতি আধ্যাত্মিকতার শুষ্ক তত্ত্বের চেয়ে অনেক বড়। আর সেই জীবনের পাতা থেকে এই ব্যুরোক্রেসীর স্বৈরাচারতন্ত্রকে মুছে

ফেলতে না পারলে আমাদের জীবনে বেঁচে থাকার কোনই অর্থ হয় না। তাই আমি আপনাদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, এই ব্যুরোক্রেসীর অধিকৃত প্রতিটি দুর্গ দখল করুন।"

... ...

"হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বাণী আপনাদের নিকট শুধুমাত্র কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। আপনারা ধর্ম ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে দ্বিধা-বিভক্ত। শুধু একটা ক্ষেত্রেই এই দুই সম্প্রদায়ের মিল দেখতে পাওয়া যায়—তা হচ্ছে, উভয়েই ব্যুরোক্রেসীর বিপক্ষে। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত পরিকল্পনা ছাড়া কোন কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

"আর হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি ছাড়া ব্যুরোক্রেসীকে বাধা প্রদান করা অসম্ভব। এই দুই জাতি যদি একই কর্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে একই সমভূমিতে দাঁড়িয়ে সংগ্রামে রত হয়, তাহলে নিজেদের স্বার্থের জন্যই তাঁদের মনের স্বার্থপরতা দূর হয়ে যাবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ভিন্ন স্বরাজের স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই হবে আমাদের কাছে।"

... ...

"অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সৃষ্টিমূলক পরিকল্পনার অন্যতম বিষয়। ভগবানের মন্দিরে ভগবানেরই সৃষ্ট জীবের অপমান। তাই এদের মনোভাব আজ বিদ্রোহমূলক। ভাবি, যারা এমন করে প্রতিনিয়ত মানুষের মনুষ্যত্বের অবমাননা করেন, তা পাবার প্রত্যাশাই বা কেমন করে করেন?"

... ...

"জমিদাররা যে কেন আমায় সমাদর করেন জানি না—আমি কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকের বন্ধু।"

[দেশবন্ধুর গ্রন্থ Way to Sawraj-এর বঙ্গানুবাদ অবলম্বনে। দেশবন্ধু-কন্যা অপর্ণা দেবী কর্তৃক অনুমোদিত।

এই সময়ে স্বরাজ্য নেতা শ্রীসত্যমূর্তি দেশবন্ধু সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রদান করেন :—

"Does Mr. Vijayraghabachari indulge in legal quibblers? Mr. Das answers him as a patriot and as a lawyer. Does Mr. C. Rajagopalachariar quote the Ramayana against Mr. Das? Mr. Das too has read Ramayana to some purpose and quotes its with deadly effect against Mr. C. Rajagopalachariar. Do Congress Committees here and there want to parade their differences from him? He is not afraid but he asked them what have you done for Swaraj?"

এইরূপে আপন নির্ভীকতা, তেজ ও সত্যের মূর্তির দ্বারা সমগ্র দক্ষিণ ভারতে তিনি আপন বিজয় পতাকা প্রোথিত করে ফিরে এলেন কলকাতা।

ইতিমধ্যে পরিবর্তন বিরোধী-দল প্রচার করলেন যে, বোম্বাই কংগ্রেস অধিবেশনের সিদ্ধান্ত বৈধ নয় এবং স্থির হলো, ১২ই সেপ্টেম্বর মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীতে আর একটি অধিবেশন বসবে।

শুরু হলো অধিবেশন। সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দেশবন্ধুর এই কাউন্সিল প্রবেশ নীতিকে সমর্থন জানালেন। তিনি বললেন, "Congressmen, suspend all propaganda against entering Councils. Our real object was the liberation of the country. Since 1919 we have been following a programme of direct action and this has yielded considerable results. If now among us we felt that we must carry the fight into the legislature, there was no reason why we should stick rigidly to our earlier decision. So long as the object

was the same, each group should be free to follow the programme which it considered best."

এরপর উক্ত সভায় দেশবন্ধু নিম্নলিখিত ভাষণটি দেন :—

"সকলের পক্ষে মতভেদ ত্যাগ করিয়া একযোগে কাজ করা কর্তব্য। মিটমাটের জন্য যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, যুক্তির দিক হইতে দেখিলে তাহাতে ত্রুটিই থাকিয়া যায়, কারণ যুক্তিতে অবিচল থাকিলে মিটমাট হয় না। কিন্তু মনে রাখিবেন, যুক্তি অপেক্ষা জীবন বড়। যাহার উপর স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত, আমি কংগ্রেসে ও ভারতীয় জীবনে সেই জীবন আনিতে বলিতেছি। আমাদিগের মধ্যে মতভেদ আছে জানিয়াও আমরা যে এ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে চাহিতেছি, তাহার কারণ, আমরা একযোগে কাজ করিতে চাই। অনেকে বলিতেছেন, স্বরাজ্য দল অসহযোগ নীতি বর্জন করিতেছেন। আমরা অহিংস অসহযোগ নীতিতে অবিচল থাকিব। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, স্বরাজ লাভই আমাদের কাম্য এবং অসহযোগই স্বরাজ লাভের একমাত্র উপায়।

"ব্যবস্থাপক সভার মধ্য হইতেই অহিংস অসহযোগ নীতি অনুসারে কার্য করিলে অহিংস অসহযোগ সম্পূর্ণতা লাভ করে।

"অসহযোগের অর্থ কি? ইহার অর্থ, যাহা তোমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহার সহিত অসহযোগ। আপনারা মনে রাখিবেন, আপনাদিগের যে ভ্রাতা অসহযোগের পক্ষপাতী, যিনি স্বরাজকামী, যিনি প্রয়োজন হইলে স্বরাজ লাভের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত, তাহার সান্নিধ্য সহ্য করায় আপনারা আপনাদের কার্যের ধ্বংসকর কিছুই সহ্য করিতেছেন না।

"যদি আপনারা আদেশ করেন, আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সম্মত হইব। আমার অনুরোধ, পরস্পরবিরোধী হইবেন না।"

এরপর এই অধিবেশনে দেশবন্ধুর স্বপক্ষে এত অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি অভিমত জ্ঞাপন করলেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে কাউন্সিল

প্রবেশ প্রস্তাব কংগ্রেসের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারতেন। যা হোক্, তাঁর কার্যতালিকা কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হলো এবং গয়া কংগ্রেসের তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে এক বছরও সময় লাগল না।

মৌলানা আজাদ একজন মুসলমান নেতা হয়েও দেশবন্ধুকে ঠিক চিনেছিলেন এবং তাঁর প্রতি অন্তরের যে কী গভীর বিশ্বাস ছিল এবং তাঁর পরিকল্পনা তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, সেকথা তিনি বলে গেছেন তাঁর India Wins Freedom বইএ। তিনি বলেছেন:

"Mr C. R. Das, one of the most powerful personalities, was thrown up by the non-co-operation movement. Mr. Das occupies a very special position in the history of our national struggle. He was a man of great vision and a breadth of imagination. At the same time he had a practical mind which looked at every question from the point of view of a realist. He had the courage of his conviction and stood up fearlessly for any position he regarded as being right.

"He held that if India was to win over freedom through negotiations, we must be prepared to achieve it step by step. Independence could not come all of a sudden when the method followed was that of discussion and persuation. He predicted that the first step would be the provincial autonomy. He was satisfied that the exercise of even limited power would advance the cause of India's freedom and prepare Indians for undertaking

larger responsibilities as and when they were won."

(ভাবানুবাদ) C. R. Das অপরিসীম ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তি, যিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবেন। আদর্শ ও কল্পনার সমন্বয়ে অপূর্ব চরিত্র তাঁর ; তারই বলে বাস্তবতাবর্জিত প্রত্যেকটি প্রশ্নকে তিনি বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করেন। সাহস এবং আত্মপ্রত্যয় তাঁর চরিত্রের দুটি সবিশেষ গুণ, আর এরই ফলে জীবনে যা তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করেন, সাহসের সংগেই তার সম্মুখীন হন।

তিনি বিশ্বাস করতেন, আপোষের দ্বারা মিটমাট করে যদি আমরা স্বাধীনতার দ্বারস্থ হই, তাহলে পরে ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হতে পারবো। রাতারাতি কখনও স্বাধীনতা লাভ করা যায় না—প্রথমেই চাই আমাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। এর ফলে যদি আমরা কম ক্ষমতা লাভ করি, তাতেও ক্ষতি নেই—কারণ তাই একদিন আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারস্থ করে দেবে এবং যেদিন আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবো, সেদিন সে-ভার বহনের যোগ্যতা নিশ্চয় ভারতবাসী অর্জন করবে।

তিনি আরও বিশ্বাস করতেন, "I am convinced that if he had not died a premature death, he would have created a new atmosphere in the country."

ভারতবর্ষের আর কোন রাজনৈতিক নেতা দেশবন্ধু সম্পর্কে এতটা আস্থা, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস পোষণ করেননি (একমাত্র সুভাষচন্দ্র ছাড়া), তাই আজাদের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে তুলে ধরলাম।

তিনি বরাবরই বলে এসেছেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাই এবং চাই গ্রাম্য জীবনের উন্নয়ন,—ব্যবস্থাপক সভায় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা যায়, তাহলে নিজেদের মত অনুযায়ী কাজ করা সম্ভব। সুতরাং এই ব্যবস্থাপক সভাকে বর্জন করে নয়, এর ভেতরে প্রবেশ

করে একে ভেঙে দিতে হবে। অপরদিকে চাই গঠনমূলক কার্য—গ্রাম্য উন্নয়ন—দেশের প্রাণকেন্দ্র গ্রাম—একে সজীব এবং সতেজ করে তুলতে না পারলে সব পরিকল্পনাই বৃথা। এর জন্যই দেশবন্ধু মনে প্রাণে কাউন্সিল প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেসের নেতাদের সংগে মতবিরোধ হওয়াতে ভিন্ন দল গঠন করেও তিনি আপন মত ও পথকে কার্যকরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর এইখানেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেশবন্ধু হয়েছেন একক এবং অদ্বিতীয়। এই নিদারুণ সংগ্রামে জয়লাভ করতে গিয়েই ফুরিয়ে এসেছে পদ্মপাতার ক্ষণস্থায়ী আয়ুর প্রহর।

সুদীর্ঘ ন'মাসের প্রাণপণ সংগ্রাম সফল হলো। দিল্লী কংগ্রেসের জয়পত্র হাতে নিয়ে তিনি ফিরলেন কলকাতায়—এবার বিজয়ের নিশান ওড়াবার পালা। উঠে পড়ে লাগলেন কাউন্সিল প্রবেশের স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্যে। সামনেই নির্বাচন—হাতে সময় মাত্র ছ'মাস।

দিল্লী কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে প্রথমেই তিনি অনুভব করলেন একখানি পত্রিকার অভাব—নিজের দলের মতবাদ গঠনের জন্য একখানি ভাল পত্রিকা না হলে চলে না। ১৯২৩ সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠা করলেন দৈনিক পত্রিকা 'ফরওয়ার্ড'। এ কাগজে তাঁর নিজস্ব দলের মতবাদ তো থাকতই, আরও থাকত পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির খবর।

সত্যি, 'ফরওয়ার্ড' একখানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা ছিল বললে ভুল হবে না। পুরনো 'ফরওয়ার্ডে'র পাতা খুললে একথার সত্যতা পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন। এ পত্রিকাটির সম্পাদনার ভার ছিল প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্রের ওপর।

এবার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন নির্বাচনযুদ্ধে—ভুলে গেলেন আহার নিদ্রা। রঙ্গমঞ্চের আবার পট পরিবর্তন ঘটল। জনসাধারণ দলে

দলে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করলো। নিস্তব্ধ, জনশূন্য রসা রোডের দেশবন্ধুর গৃহ আবার কোলাহলমুখর ও কর্মচঞ্চল হয়ে উঠল। মাত্র দুশো টাকা সম্বল করে তিনি এই নির্বাচনযুদ্ধে নামলেন, সুতরাং পুরনো ঋণের ওপর আরও ৩০ হাজার টাকা ঋণ করে তিনি ভোটের খরচ চালাতে লাগলেন।

বড়বাজার কেন্দ্রে তিনি সাতকড়ি রায়কে দাঁড় করালেন ভ্রাতা সতীশরঞ্জন দাশের বিরুদ্ধে। ব্যারাকপুর অঞ্চলে নবীন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে দাঁড় করালেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশি হওয়ায় তিনি মুসলমান সদস্যদের জন্য মুসলমান-প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিধান রায়কে দাঁড় করানোর জন্য প্রতিপক্ষরা ঠাট্টা করে বললেন, 'আপনার Candidate সাতটা ভোট পাবে তো?' ব্যারাকপুরের নির্বাচন কেন্দ্রে একজায়গায় তিনি বক্তৃতা করছেন, হঠাৎ তাঁর আঙুলে এসে লাগল প্রতিপক্ষের একটি ঢিল। তিনি মৃদু হেসে ছেলেটিকে বললেন, 'সাহস করে সামনে এসে মার না কেন ভাই! কেন কাপুরুষ নামের কলঙ্ক বহন করছো!' তাঁর এই উক্তিতে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় জনতা।

এরপর নির্বাচন দ্বন্দ্বের ফলাফল প্রকাশিত হলো। নবীন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় জয়ী হলেন প্রবল প্রতিপক্ষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যাকে পরাজিত করে। ব্যর্থ ও পরাজিত হয়ে ভারতের রাজনৈতিক আকাশের একদা-উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সুরেন্দ্রনাথ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন ভারতের রাজনৈতিক আকাশে উদিত নব-জ্যোতিষ্কের পানে!

কাউন্সিলে ৪০ জন সদস্য নির্বাচিত হলেন স্বরাজ্য দলের। বাংলা দেশের মত মধ্যপ্রদেশেও স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে জয়লাভ করলো। কিন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ আসাম প্রভৃতি স্থানে স্বরাজ্য দল তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারলো না।

Council সংগ্রামে জয়লাভ করবার পর লর্ড লিটন ১১ই ডিসেম্বর দেশবন্ধুকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু পুরোপুরি ক্ষমতা হাতে না পেলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের কোন সার্থকতা নেই। দেশবন্ধু লর্ড লিটনের সংগে আলোচনা করে ফিরে এসে তাঁর সহকর্মীদের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করে লর্ড লিটনকে একটি চিঠি দিলেন। সেই চিঠিটি নিম্নে দেওয়া হলো :—

148 Russa Road (South)
Bhowanipur
16th Dec 1923

Your Excellency,

I placed before our Party the position as explained by your excellency and they have just declined not to accept your excellency's kind offer. The members of this Party are pledged to do everything in their power by using the legal right granted under the Reforms Act to put an end to the system of diarchy. This duty they cannot discharge if they accept office. The Party is aware that it is possible to offer obstruction from within by accepting office, but they do not consider it honest to accept office which is under the existing system in your excellency's gift and then turn it into an instrument of obstruction. The awakened consciousness of the people of this country demands a change in the present system of Government and until that is done or unless there is some

change in the general administration indicating a change of heart, the people of the country cannot offer willing co-operation. Under the circumstances, I regret, I cannot undertake the responsibilities regarding the transferred departments. My Party, however, wishes to place or record their appreciation of the spirit of consitutionalism which actuated you in making the offer which, we feel, bound not to accept.

C. R. Das

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের আর-একটি স্মরণীয় ঘটনা কোকনাদ কংগ্রেসের অধিবেশন। অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলী। এই কংগ্রেসের অধিবেশনেও চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল প্রবেশ নীতি সমর্থিত হয়—কিন্তু আর-একটি ব্যাপার নিয়ে এখানেই চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে তুমুল হৈ চৈ পড়ে যায়, তা হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান চুক্তি। যা Bengal Pact নামে খ্যাত। এই প্রসঙ্গে এই Pact সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা আবশ্যক।

চিত্তরঞ্জন কাউন্সিল জয় করবার পরই বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেন যে, আমাদের দেশের মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি আবশ্যক। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, আমাদের দেশের মুসলমানরা সংখ্যায় শতকরা ৫০ভাগেরও অধিক, কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে তারা উন্নত নয়—শিক্ষা-দীক্ষা সব ব্যাপারেই তারা কিছুটা পশ্চাৎপদ। সুতরাং রাজনৈতিক ব্যাপারেও তারা তেমন উৎসাহী নয়। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে চেতনা জাগানো দরকার। বিশেষ করে, তাদের জীবনে কতগুলি সুখসুবিধা দিলে তারা উন্নত হয়ে আমাদের স্বরাজ আন্দোলনে সহযোগিতা করতে পারবে। ফলে, আমাদের স্বরাজের পথও হবে সুগম। জাতীয় সংহতি না থাকলে স্বাধীনতার কোন অর্থই হয় না।

তাই, সমস্ত লোকপ্রিয়তা বিসর্জন দিয়েও দেশবন্ধু এই মিলনের আদর্শকে বড় করে দেখেছিলেন এবং এর জন্য চালিয়েছিলেন অপ্রতিহত সংগ্রাম।

আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ চিরকালের—তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য করেছিলেন এই বিরোধ দূর করতে গেলে উভয়ের মধ্যে সমতা আনা দরকার। তিনি বলতেন "হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ী এই দেশেই, উভয়েরই তুল্য স্বার্থ, তখন কোন সম্প্রদায় যদি অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা অল্প সুবিধা পাইলে অশান্তির সৃষ্টি হয় তবে উভয় সম্প্রদায়কে তুল্য সুবিধা দেওয়াই কর্তব্য।" এই মর্মে তিনি কতকগুলি সর্ত সমেত একটি চুক্তিপত্র করেছিলেন যা Bengal Pact বা Hindu Muslim Pact নামে পরিচিত।

(১) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সাম্প্রদায়িক লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যা স্থির হইবে এবং স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচন হইবে। নিখিল ভারত হিন্দু মুসলমান চুক্তি এবং কংগ্রেস খেলাফৎ কমিটির নির্ধারণে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ও পরিবর্জন হইতে পারিবে।

(২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্য নির্বাচনে জেলায় যে সম্প্রদায়ের আধিক্য, সেই সম্প্রদায় হইতে ৬০ জন এবং অপর সম্প্রদায় হইতে ৪০ জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন।

(৩) সরকারী চাকরীর শতকরা ৫৫টি মুসলমানরা পাইবেন। তাহার ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রূপ হইবে—যতদিন পর্যন্ত চাকরীর শতকরা ৫৫টি মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত না হয়, ততদিন যোগ্যতার সর্বনিম্ন আদর্শানুরূপ হইলেই মুসলমানেরা চাকরী পাইবেন। এবং ততদিন হিন্দুরা শতকরা ২০টি চাকরী পাইবেন।

(৪) যে সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব বা আইন উঠিবে, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদিগের শতকরা ৭৫জন নির্বাচিত সদস্যের

সম্মতি ব্যতীত সেরূপ প্রস্তাব বা আইন গৃহীত হইতে পারিবে না।

(৫) মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য হইবে না।

(৬) ধর্মগত ব্যাপারে গো-বধে আপত্তি করা হইবে না।

(৭) ব্যবস্থাপক সভায় গো বধের বিষয়ে আইন করা হইবে না। তবে ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে উভয় সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে একটা মিটমাটের চেষ্টা করা হইবে।

(৮) গো-হত্যা এমনভাবে সংঘটিত হইবে যাহাতে হিন্দুদের মনে আঘাত না লাগে।

(৯) হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ঘটিলে তাহার মীমাংসা করিবার জন্য প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া সমিতি গঠিত হইবে। তাহার সদস্য অর্ধেক হিন্দু ও অর্ধেক মুসলমান হইবেন—সমিতি আপনার সভাপতি নির্বাচন করিবেন।

বিরোধী দলরা বললেন, দেশবন্ধুর এই প্যাক্টের ফলে ভারতবর্ষের সর্বনাশ হবে—কেউ কেউ বললেন, মুসলমান সম্প্রদায়কে হাতে রাখবার জন্যই দেশবন্ধু এই Pact গ্রহণ করছেন। এই Pact-এর বিরুদ্ধে কলকাতায় এলবার্ট হলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে Pact বিরোধী এক সভা হয়। তাতে বলা হয়, সব ব্যাপারেই মুসলমান সম্প্রদায় এত পিছিয়ে আছে তখন তাদের এই বিশেষ অধিকারগুলো দেবার অর্থ কি!

দেশবন্ধু বিলের ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট রইলেন না। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি কর্তৃক এই বিল পাশ করিয়ে কোকনাদ কংগ্রেসে উপস্থিত হলেন। সেখানেও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি। তীব্র প্রতিবাদ উঠল Bengal Pact এর বিরুদ্ধে। অনেকে চীৎকার করে উঠলেন, 'Bengal Pact মুছে ফেলো।' তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন দেশবন্ধু। বললেন, "আপনারা Bengal Pactএর প্রস্তাব মুছে ফেলতে পারেন কিন্তু ভারতবর্ষের কংগ্রেসের ইতিহাস থেকে বাঙালাকে মুছে ফেলতে পারেন না। এই কংগ্রেসে বাঙলা

তার অভিমত জানাবেই। কার সাধ্য বাঙলাকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে? বাঙলাকে এ ভাবে মুছে ফেলবার চেষ্টা করলে সে তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে জানে।

অহিংস অসহযোগ ভিন্ন আমাদের স্বরাজ লাভ অসম্ভব এবং এই আন্দোলন কার্যকরী হবে না, যদি না হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি থাকে। যদি হিন্দু ও মুসলমানেরা স্বরাজ চায় তবে তাহাদের ঐক্যভাবে কাজ করা খুবই প্রয়োজন। অতঃপর অনেক বাদানুবাদের পর এই কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, ভারতীয় প্যাক্ট কমিটি সমস্ত প্রদেশের মতামত নিয়ে এই Pact-এর বিষয়ে বিবেচনা করবেন। এই কংগ্রেসে একজন বিরুদ্ধবাদী লোক এসে দেশবন্ধুকে বললেন, "মশাই, আইন করিয়া গো-হত্যা বন্ধ করুন।"

দেশবন্ধু—আইন হইলে গো-হত্যা আরও বাড়িবে। আপোষ করিয়া করিব।

লোকেরা—আপনি unpopular হইয়া যাইবেন।

দেশবন্ধু রাগিয়া উত্তর দিলেন—আমি কখনও popularity seek করি নাই, জীবনে কখনও করিব না। Seek করি নাই বলিয়া ইহা আপনা হইতে আসে, তাই unpopular হইলেও আমার তাতে দুঃখ নাই। যা ভাল বুঝি তাই করিব।

নির্বোধ লোকের দল এবার চুপ করে চলে যায়।

এই সময় কোকনাদ ছাত্র সম্মিলনীর সভাপতি হয়েছিলেন দেশবন্ধু।

কোকনাদ কংগ্রেস অধিবেশনের পর ফিরে এসে এই প্যাক্ট সংক্রান্ত সভাসমিতিতে সর্বত্রই তিনি জয়লাভ করতে লাগলেন। এই Pactএর দ্বারা দেশবন্ধু যে আমাদের জাতীয় জীবনের কতখানি উপকার সাধন করতে চেয়েছিলেন, সে কথা বুঝেছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম মুসলমান নেতা মৌলানা আজাদ। তিনি তাঁর 'India Wins Freedom' বইএ বলেছেন :—Mr Das was able to

ধুতি ও চাদর প'রে কাউন্সিলে আসতেন, ফলে বিদেশীভাবাপন্ন কাউন্সিল গৃহে এলো জাতীয়তার পবিত্র ভাব।

কাউন্সিলে জয়লাভ করেই দেশবন্ধুর দৃষ্টি পড়লো করপোরেশনের প্রতি। তিনি দেখলেন, গঠনমূলক কাজ করতে হলে এবং তা প্রসার করতে হলে সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং কলিকাতা করপোরেশন দখল করা দরকার—সুতরাং এবার তিনি এদিকে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন।

ইতিপূর্বে কংগ্রেসে স্বায়ত্তশাসনের প্রথম মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের প্রবর্তন হয়েছিল এবং স্থির হয়েছিল ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের নির্বাচনের পর এই নূতন আইন কার্যকরী হবে—১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নূতন নির্বাচনের সময় দেশবন্ধু কংগ্রেস থেকে প্রার্থীপদের জন্য অধিকসংখ্যক প্রার্থী (Councillor-এর জন্য) নিয়োগ করেন এবং মুসলমানেরা সংখ্যায় অধিক হওয়ার জন্য তিনি মুসলমানদের জন্য মুসলমান প্রার্থী নির্বাচন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে এ ব্যাপারে লোককে অনুপ্রাণিত করেন—ফলে ৭৫টি আসনের মধ্যে ৫৫টি আসন দখল করেন স্বরাজ্যদল। বিজয়লক্ষ্মী বারবার অভিনন্দিত করলেন দেশবন্ধুর স্বপ্নকে। Council ও Corporation দুটিই তাঁর দলের হাতে এসে গেলো, কর্মযোগীর সাধনা সফল হ'লো। এবার তা রূপদানের পালা।

করপোরেশনের কাজ হাতে পেয়েই তিনি এর পরিচালনের সুবিধার জন্য কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন নামে একটি সংঘ গড়ে তুললেন। এরপর এপ্রিল মাসে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্টের স্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নির্বাচিত হলেন কলকাতা করপোরেশনের প্রথম মেয়র। সুরাবর্দী নির্বাচিত হলেন ডেপুটি মেয়র আর প্রিয়শিষ্য সুভাষচন্দ্র হলেন প্রধান কর্মকর্তা। প্রথম মেয়রের আসনে বসে যে বাণী তিনি

রেখে গেছেন জনসাধারণের জন্য, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়েছে কল্যাণকামী মানবদরদী এক দেশবন্ধুর মূর্তি ঃ—

C. R. Das addresses to the Corporation :—

I have to thank you heartily for the great honour you have confirmed on me to-day. I take this honour given not to me personally but to the great cause which I have always represented. Indian people consisting of diverse communities with diverse interests united and federated as a nation. In this Corporation I find plenty of work possible in that direction. So far as it lies in me you will find that no communal interest will be sacrificed unless that interest goes against the well-being of the whole community by which I mean the Indian people or the citizen of Calcutta in this particular respect.

My policy here will be to direct you to carry out constructive work. We are here not to destroy the Corporation, but to carry it on inproved lines for the welfare of the citizen of Calcutta.

All this is so far as the act and circumstances will allow :— (1) Free primary education, (2) Free medical relief for the poor, (3) Purer and cheaper food and milk supply, (4) Better supply of filtered and unfiltered water, (5) Better sanitation in Bustees and congested areas, (6) Housing of the poor, (7) Development of suburban

areas (8) Improved transport facilities. (9) Greater efficiency of administration at a cheaper cost.

What I desire is that the Corporation should sincerely embark on to proceed a little way in advance. I should think that we should have accomplished a great deal.

I shall try to carry out this work with honesty, with courage, with determination.

It is a great ideal of Indian people that they regard the poor as "Daridra Narayana." To them God comes in the shape of the poor and the service of the poor is the service of God to the Indian mind. I shall therefore try to direct your activities to the service of the poor and you will have seen that in the programme which I have drawn up, most of the items deal with the poor. If this Corporation succeeds even to a very limited extent in this work it will justify itself.

16. 4. 24

ভাবানুবাদ :—"আজকে আপনারা আমাকে যে সম্মান দিলেন তার জন্য আমি আমার আন্তরিক-ধন্যবাদ প্রদান করছি। এ সম্মান আমার নয়—জাতির যে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আমি নির্বাচিত, এ অর্ঘ্য তার প্রতি। বিভিন্ন জাতির সমবায়ে বিভিন্ন জাতির স্বার্থ নিয়ে ভারতীয় সংযুক্ত জাতি. গঠিত। এই দিক দিয়ে বিচার করলে এই করপোরেশনের ভেতরে অনেক কাজ করবার আছে। কিন্তু কোন

সম্প্রদায়গত স্বার্থই সিদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়—যতক্ষণ না তা সমগ্র জাতির মঙ্গল বিধান করবে।

"আমি এখানে গঠনমূলক কাজ করতে চাই :—তার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অন্যতম। (১) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা (২) গরীবদের বিনা বেতনে চিকিৎসার ব্যবস্থা (৩) খাঁটী এবং সস্তায় খাদ্য এবং দুগ্ধ সরবরাহ (৪) পরিস্রুত এবং অপরিস্রুত জলের উন্নততর সরবরাহ (৫) বস্তি প্রভৃতি অঞ্চলে জল নিকাশ প্রভৃতির ভাল ব্যবস্থা (৬) দরিদ্রদের গৃহ নির্মাণ (৭) শহরতলীর উন্নতি সাধন (৮) পরিবহন ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত (৯) সমস্যায় উন্নততর পরিচালন ব্যবস্থার প্রবর্তন। এসব কাজ আমি সততা সাহস এবং দৃঢ়তার সংগে করতে চেষ্টা করবো।

"ভারতীয় আদর্শে দরিদ্রদের বলা হয় দরিদ্র নারায়ণ। তাদের ভগবান নেমে আসেন দরিদ্রদের মধ্য দিয়ে তাই দরিদ্রদের সেবা মানে ভগবানের সেবা করা হয়। আমি আমাদের কর্মক্ষমতাকে এই দরিদ্র-নারায়ণের সেবার নিয়োজিত করবো। আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন অধিকাংশই আমি গ্রহণ করেছি দরিদ্রদের জন্য। যদি এই করপোরেশনে খুব সীমার মধ্যেও কাজ করতে হয় তাহলেও এগুলি যোগ্য মর্যাদা লাভ করবে।"

সুভাষচন্দ্রের মত কর্মী পেয়ে তিনি মনপ্রাণ নিয়োজিত করলেন কলিকাতার দরিদ্র অধিবাসীদের উন্নতির জন্য—জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, স্বল্প মূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ, বস্তি উন্নয়ন, অবৈতনিক পাঠশালা প্রভৃতির কাজ অতি সুন্দর ভাবেই সম্পন্ন হতে লাগলো। শহরের অধিবাসীদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করবার জন্য তিনি 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন—যে পত্রিকা আজও পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

এই সময় ঝাড়ুদাররা একবার ধর্মঘট করে। তিনি তাদের বলেন, "তোমাদের কাজ এই জনসেবার মধ্য দিয়ে তোমরা পুণ্য অর্জন করছো।

সুতরাং তোমাদের বিষয় অবশ্যই আমি বিবেচনা করবো কিন্তু তোমরা কাজে যোগদান না করলে আমি আমার সহকর্মীদের নিয়ে এ কাজ করবো।" তাঁর এই কথায় ঝাড়ুদারগণ অবিলম্বে কাজে যোগদান করলো। তিনি বলতেন, এদের প্রতি যেমন কোমল হওয়া উচিত তেমনি কঠোর হওয়াও কর্তব্য।

যে গঠনমূলক কাজের স্বপ্ন তাঁর ছিল করপোরেশনের মধ্যে থেকে তিনি তা করতে পেয়ে সবিশেষ আনন্দ লাভ করেছিলেন। তথাপি সমালোচকের দল তো চিরকালই আছে, তাঁরা বলত, "আমাদের সস্তায় দুধ মাছের কি হলো?" বা এই ধরণের কঠোর মন্তব্য শুনতে হতো, বিরক্ত হয়ে তিনি বলতেন—"আমাদের একটু নিঃশ্বাস ফেলতে দিন। আমি তো খাটছি, সব কাজ লোকসান করে আপনাদের জন্য সুভাষকে দিয়েছি, সবই হবে। একটু সময় দিন।"

মেয়রের পদলাভ করে প্রথম তিনি স্থির করেছিলেন যে একাজ অন্যকে দিয়ে করাবেন কারণ নিজের পার্টির কাজ করে তার সময়ই বা কোথায় তাঁর হাতে। কিন্তু পরে ভেবে দেখলেন যে অন্যকে দিয়ে চালালে কাজ হয়ত ঠিক মনের মত নাও হতে পারে, তাই হাসিমুখে দায়িত্বের ওপর দায়িত্বের বোঝা মাথায় তুলে নিলেন—তার পরিকল্পনাও পরিপূর্ণতা লাভ করতো, কলকাতার নাগরিকবৃন্দ লাভ করতো সহজ স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবন—কিন্তু মহাকালের পরিকল্পনা ছিল অন্য রকম। ইংরাজীতে একটা কথা আছে Man proposes but God disposes. সেই নিয়তির খেলায় পরাভূত হলো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগ্ন দেহতরী। আর পারবেনই বা কি করে? একজনই মানুষ বীরবিক্রমে একটার পর একটা সমস্যা সমাধানের জন্য জীবনপাত করছেন—জেলে থাকতেই গেছে দেহ ভেঙ্গে। সেই ভাঙ্গা দেহ নিয়ে সৃষ্টির প্রলয় বীণা কতদিনই বা বাজানো চলে? মহাকাল নিয়ে গেলেন এই যজ্ঞের ঋত্বিককে।

কলকাতার মত ভারতবর্ষের নানাস্থানে মিউনিসিপ্যাল এই সময়

কংগ্রেসের হস্তগত হলো। বিঠলভাই প্যাটেল নির্বাচিত হলেন বোম্বাই করপোরেশনের সভাপতি এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আহম্মদাবাদের করপোরেশনের সভাপতি হলেন। তাছাড়া যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানেও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি পদের জন্য নির্বাচিত হলেন কংগ্রেসপ্রার্থীরা।

তবুও সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের অপরিসীম কর্মপ্রেরণায় স্বরাজ্য দল কলকাতা করপোরেশনের যে উন্নতি করছিল তাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতার অনেক রাস্তাঘাট ভারতীয় মহাপুরুষদের নামানুসারে নামাঙ্কিত হলো—শিক্ষা বিভাগের সূচনা ঘটলো এবং এর পরিচালনার ভার দিলেন একজন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় স্নাতকের ওপর। বিনা বেতনে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া শিখতে শুরু করলো। সহরের প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাস্থ্যকেন্দ্র—দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র স্থাপিত হলো। প্রতিষ্ঠিত হলো স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র। দেশ-বিদেশের মাননীয় ব্যক্তিরা এলে ব্যবস্থা করা হলো তাঁদের নাগরিক সম্বর্ধনা জানাবার—স্বরাজ্য দলের এই সুষ্ঠু কাজের জন্যই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসেও দেশবন্ধু পুনরায় নির্বাচিত হলেন মেয়র—কিন্তু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করায় এর কাজ আর আগের মত সাফল্যের পথে এগিয়ে চলতে পারলো না আর দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুর কথা তো আগেই বলেছি।

দেশবন্ধুর জীবনে বিজয় বৈজয়ন্তীর বছর ১৯২৪—একদিকে কাউন্সিলের অপ্রতিহত ক্ষমতা, অপর দিকে কলকাতা করপোরেশনের উপর পূর্ণ প্রভাব, এই নেতার ক্ষমতায় সমগ্র দেশবাসী মুগ্ধ হয়ে গেল—কংগ্রেসের ক্ষমতা পুরোপুরি চলে গেল স্বরাজ্যদলের হাতে—শুধু বাংলার নয়, ভারতের রাজনৈতিক আকাশের একছত্র নায়ক হয়ে উঠলেন দেশবন্ধু। কিন্তু দেশবন্ধুর চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল যে ক্ষমতা হাতে পেয়ে নিজেকে তিনি সম্রাটের আসনে বসিয়ে সহকর্মীদের

আপন প্রজ্ঞা করে তোলেননি। প্রত্যেকটি ব্যাপারে তিনি দলের মতবাদকেই প্রাধান্য দিতেন—দলের প্রত্যেক সহকর্মীদের মতামত শুনতেন, বিবেচনা এবং বিচার করতেন, তা সে স্বরাজ্যদলের কাজই হোক অথবা করপোরেশনের ব্যাপারই হোক। একবার কোন এক সহকর্মীকে নিয়োগ ব্যাপার নিয়ে সহকর্মীদের সংগে তার মতভেদ হয়—পরে তিনি বিবেচনা করে সহকর্মীদের মতামতই মেনে নিলেন। এমনি না হলে কি নেতা হওয়া যায়। করা যায় জনসাধারণের ওপর এমন অপরিসীম প্রভাব বিস্তার? তাই মনে হয়, শুধু আজকের ভারতবর্ষে বা আগামী দিনের ভারতবর্ষেই শুধু নয়—রাজনৈতিক নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের গুণাবলী সর্বকালের ও পৃথিবীর সর্ব দেশের নেতাদের শাশ্বত আদর্শ স্বরূপ।

স্বরাজ্যদলের আবেদন ক্রমে ১৯২৪ খ্রীঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী মুক্তিলাভ করলেন এবং শরীরের অসুস্থতার জন্য তিনি বোম্বাই এর জুহুতে থাকতেন—তাঁর কারাবাস কালেই স্বরাজ্যদল গঠিত হয়ে গেছে এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় একছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে অতএব এই দলের বিষয় জানা এবং আলোচনার দরকার। ১৮ই মে দেশবন্ধু ও মতিলাল গেলেন জুহুতে গান্ধীজীর সংগে সাক্ষাত আলোচনা করবার জন্য।

গান্ধীজী কাউন্সিল প্রবেশকে আন্দোলনের বাধাস্বরূপ মনে করলেন। তবে দিল্লী ও কোকনাদ কংগ্রেস অনুমোদন করার পর Council প্রবেশ সম্পর্কে কংগ্রেস যেন কোন বিরুদ্ধ মতামত প্রচার না করে একথাও তিনি বললেন। এপ্রসঙ্গে তিনি যা বলেছিলেন :—

"I am sorry to say that I have not been able to see eye to eye with the Swarajists. I retain the opinion that Council entry is inconsistent with non-cooperation. I would, however, be no party to putting any obstacles in their way or to carrying

on any propaganda against the Swarajists' entry into the legislature though I cannot actively help them in a project in which I do not believe."

বলাই বাহুল্য, গান্ধীজীর এ উক্তিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বা মতিলাল নেহরু কেউই খুশি হলেন না। এরপর স্বাক্ষরিত হলো 'গান্ধী-দাশ প্যাক্ট'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহরু এক যুক্ত বিবৃতিতে বললেন :

"We fail to understand how such entry can be regarded as inconsistent with the non-cooperation resolution of Nagpur Congress. But if non-cooperation is merely a matter of mental attitude rather than of the application of a living principle to the existing facts of our national life, we conceive it to be our duty to sacrifice even non-cooperation to serve the real interests of the country. Council entry is and can be thoroughly consistent with the principle of non-cooperation as we understand that principle not to be inconsistent with non-cooperation."

"আমরা বুঝিতে পারিলাম না এই প্রবেশ প্রস্তাব কেমন করিয়া নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধী হইল। অসহযোগ প্রস্তাব তো কেবলমাত্র একটা মনের পরিকল্পনা নয়—ইহাকে জীবন্ত সত্তারূপে আমাদের জাতীয় জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা অসহযোগ আন্দোলনকে দেশের প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিব। কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব অসহযোগের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ—আমরা তো বুঝি অসহযোগের সংগে ইহার কোন অসঙ্গতি নাই।"

এই Pact অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, মহাত্মা গান্ধী খাদি ও চরকার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবেন আর দেশের রাজনৈতিক পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ রূপে নামবে স্বরাজ্য পার্টির ওপর। এইরূপে দেশবন্ধুকে পূর্ণ নেতৃত্ব দিয়ে গান্ধীজী প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে কিছুকালের জন্য দাঁড়ালেন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দেশবন্ধু গেলেন সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে। এই সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন মৌলানা আক্রম খাঁ। এখানে তিনি রাত্রি একটা পর্যন্ত প্যাক্টের সমর্থন বক্তৃতা করলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতাদের আপত্তি সত্ত্বেও এই সভায় Bengal Pact গৃহীত হয়েছিল। এই সম্মেলনে একটা বিষয় নিয়ে আবার ঝামেলা বাঁধল—লোকে দেশবন্ধুকে ভুল বুঝল। ঘটনাটি এই :—গোপীনাথ সাহা নামে একজন বিপ্লববাদী যুবক ১৯২৪ খ্রীঃ ১২ই জানুয়ারী পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে হত্যা করলো ডে নামক জনৈক নিরপরাধ শ্বেতাঙ্গকে।

বিচারে গোপীনাথের ফাঁসি হলো। পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের আগে গোপীনাথ দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে গেলেন, "একজন নিরপরাধ লোককে মেরেছি বলে আমি দুঃখিত। তার চাইতে বেশী দুঃখিত যে টেগার্টকে মারতে পারিনি। না, মৃত্যুর জন্য আমার এতটুকু দুঃখ নেই। কারণ আমি জানি আমার প্রতি ফোঁটা রক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে শত শত গোপীনাথের জন্ম দেবে।"

গোপীনাথের এই বাণী বিচলিত করেছিল সুভাষচন্দ্রকে—'জেল গেট থেকে বেরিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি তাকিয়ে রইলেন সামনে টাঙানো ভারতবর্ষের বৃহৎ মানচিত্রটার দিকে। কবে তোমার কথা সত্য হবে গোপীনাথ? কবে তোমার মত শত শত যুবক জন্ম নেবে ভারতের মাটিতে? আর কতদিন দেরী?'

(আমি সুভাষ বলছি—শৈলেন দে)

সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে গোপীনাথের আত্মোৎসর্গের

জন্য তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মানের জন্য একটি প্রস্তাব পাঠ করা হয় :—

"The Conference, while denouncing or dissociating itself from violence and adhering to the principle of non-violence, appreciates Gopinath Saha's ideal of self-sacrifice misguided though that is in respect of the country's best interests and expresses its respects for his great self-sacrifice."

"এই সম্মেলন সর্বপ্রকার হিংসানীতির পরিপন্থী হইয়া এবং অহিংসনীতির সমর্থনকারী হইয়াও গোপীনাথের আত্মোৎসর্গের জন্য প্রশংসা করিতেছে যদিও সে পথভ্রান্ত কিন্তু তাঁহার দেশপ্রেম এবং আত্মোৎসর্গ মহান।"

তাছাড়া দেশের ইউরোপীয় সমাজ স্পষ্টই বলল যে, এই উক্তির দ্বারা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।

দেশবন্ধুর এই উক্তিতে দেশে তাঁর শত্রুগণ প্রচার করলেন, তিনি কেবল মুখেই কিংবা সুবিধের জন্য অহিংসনীতি গ্রহণ করেছেন কিন্তু আসলে তিনি এনার্কিষ্ট—এ যে কত বড় ভ্রান্ত ধারণা তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। এই যুবকদের জন্য তাঁর অন্তরে মমতা ছিল ঠিকই এবং সে পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অসংখ্য স্বদেশী মামলা গ্রহণ করে—এই যুবকদের প্রাণরক্ষা করে, কিন্তু হিংসার পথকে তিনি কখনও ন্যায্যপথ বলে গ্রহণ করেন নি—চৈতন্যদেবের প্রেমমন্ত্রে যিনি দীক্ষিত, তিনি কেমন করে অহিংসার পূজারী হবেন। সব সময়েই তিনি বলতেন:—"হিংসায় কখনও দেশে স্বরাজ হইতে পারে না। প্রেম ও সমদর্শিতার ভিত্তি না হইলে ভারতবর্ষের মত এতবড় শ্রেণীবহুল দেশে কখনও শান্তি সম্ভব নয়।" হিংসামূলক কোন ঘটনার কথা শুনলেই ব্যথিত চিত্তে তিনি বলে উঠতেন, "ওঃ, হ'ল না, দেশটাকে পিছিয়ে দিলে দেখছি।"

সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে গোপীনাথের মৃত্যুতে শোক

প্রস্তাব আনবার জন্য রেগে গেলেন গান্ধীজী। তিনি বললেন :— "কংগ্রেসের মধ্যে এসব কেন? ওদের জন্ত আমাদের কেন এই মাথাব্যথা?"

ফলে উল্টে আমেদাবাদ ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আর্নেষ্ট ডে'র মৃত্যুর জন্য শোক প্রস্তাব আনা হ'লো। এবার প্রতিবাদ করে উঠলেন দেশবন্ধু। বললেন, শহীদ গোপীনাথ আজ ভাল-মন্দ নিন্দা প্রশংসা সব কিছুর উর্ধে। দেশগতপ্রাণ শহীদের উদ্দেশ্যে প্রশংসা না হোক মানবিক ধর্ম অনুযায়ী একটু সহানুভূতির কথাও কি বলা যায় না? গান্ধীজীর স্পষ্ট উত্তর—না, তা যায় না। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর তাঁর বিষয়ে গান্ধীজী ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখেছেন তার একস্থানে বলেছেন—"গোপীনাথ সাহা সম্পর্কিত প্রস্তাবের জন্য তাঁর ও আমার মধ্যে কোন বিদ্বেষ জাগেনি। উভয়ের প্রত্যেকেই ভাবতুম অপরজন ভুল বুঝেছেন—যেমন প্রণয়ীর মধ্যে কলহ হইলে হয়।"

দুজনের মধ্যে বারেবারে মতবিরোধ ঘটলেও দেশবন্ধুর বিরাট চরিত্র যে মহাত্মা গান্ধীকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করেছিল, একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

দেশবন্ধু নিজে ব্রাহ্মপিতার সন্তান হলেও হিন্দুধর্মের প্রতি যে তাঁর সুগভীর প্রীতি ও মমতা ছিল, তার পরিচয় মেলে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে —হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থস্থান তারকেশ্বর মোহান্তের অনাচার ও অত্যাচারে কলুষিত হচ্ছে এ সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই ঘটনা সম্পর্কে ১৯২৫ খ্রীঃ ২৫শে মার্চ অমৃতবাজার পত্রিকার উক্তি লিপিবদ্ধ করা হলো :

Tarakeswar affair is known to have passed through many phases. For a number of years, there have been various allegations against the Mohunts.

Matters ebbed and flowed until towards the end of 1923 when Swami Vishuddhananda and Swami Sachchidananda, two religious reformers, appeared in the scene. They had previously attempted to remove abuses attached to the Hindu shrines in other parts of India and they came to Tarakeswar with the same object. A band of volunteers, known as the Mahabir Dal, accompanied to enlist a considerable amount of local support and the movement they inaugurated gradually grew in strength.

In the meantime, the Bengal Congress Committee had passed under the domination of the Swaraj Party. How the movement was started by the two Swamis was given a semi-political complexion. The Satyagraha was connected with it and Mr C. R. Das's whirl-wind campaign on behalf of the movement are all to recent history to need recapitulation.

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ এবং সচ্চিদানন্দ যখন এ ব্যাপার নিয়ে একটা আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে চাইলেন, তখন তাঁরা বাধা পেলেন ব্রাহ্মণ সভার কাছ থেকে—এই সময় দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র দুজনে তারকেশ্বরে গেলেন এবং আসল ব্যাপারটা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এলেন—তাঁরা দেখলেন সত্যিই ধর্মের নামে এখানে চলছে অনাচার ও ব্যভিচার —(জহরলাল নেহরু তাঁর Letters to the daughter-এ বলেছেন যে, ধর্মের নামেই চলে যত অনাচার।)

কলকাতায় ফিরে এসেই তিনি তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ঘোষণা

করলেন—ধর্মের নামে যে অনাচার তা দূর করার জন্যই এ সত্যাগ্রহ —এ প্রসঙ্গে মির্জাপুর পার্কে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম শুধু বাঙ্গালী জাতির সংগ্রাম নহে। সমগ্র ভারতবাসীরই ইহাতে যোগদান করিবার অধিকার আছে। অনেকে সত্যাগ্রহ এই নামটায় আপত্তি তুলিয়াছেন। আমি ইহাকে সত্যাগ্রহ না বলিয়া সত্যাশ্রয় ধর্মাশ্রয় বলিতেও প্রস্তুত আছি। বাঙ্গলার হিন্দু, আজ তোমার দেবতার মন্দিরে তোমাদের প্রবেশাধিকার নিষেধ, তোমাদের তীর্থকেন্দ্র বিপন্ন, কলুষিত। ধর্ম সংগ্রামে যোগদানের জন্য আজও কি তোমাদের অসারতা নির্জীবতা ভঙ্গ হয় নাই! আজ তারকেশ্বরে যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে শুধু মানুষ চাই—প্রাণ দিতে পারে এমন মানুষ চাই—প্রাণ দিতে পারে এমন মানুষ চাই। এ সংগ্রামে বাঙ্গালীকে তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে হইবে, প্রাণ দিয়া এই আন্দোলন পরিচালনা করিতে হইবে। আমি হিন্দু, আমার ধর্মে আঘাত লাগিয়াছে এবং আমি আমার ধর্মের সেই পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য জীবনপাত করিতেও প্রস্তুত।"

দেশবন্ধুর এই আহ্বানে বাঙ্গালাদেশের যুবক দলে দলে এই আন্দোলনে যোগদান করলো—চিত্তরঞ্জন প্রথমেই পুত্র চিররঞ্জনকে পাঠালেন—চিররঞ্জনের বরাতে জুটল পুনরায় কারাবাসের ধূসর দিনগুলি। কেবলমাত্র জনবলই নয়, অর্থ দিয়েও দেশবাসী এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ধর্মস্থানের ব্যাপারে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপে চটে গেল ব্রাহ্মণসভা—চিত্তরঞ্জন এক সভায় এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন—

"কংগ্রেস তারকেশ্বরের আন্দোলন ভার গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণ সভা কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কেন? কংগ্রেস কি হিন্দুর প্রতিষ্ঠান নহে? দেশবাসীর ধর্মের সহিত কংগ্রেসের কি কোন সম্পর্ক নাই? কংগ্রেস কি হিন্দুছাড়া? তারকেশ্বরের আন্দোলন

ভার গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস কি একটা অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছে? ব্রাহ্মণসভা বলিয়াছেন, আমি হিন্দু নই, হিন্দুর ধর্মান্দোলনের পরিচালন করিবার ভার আমার নাই। আমি বলিব, আমার হিন্দুত্ব মারে কে? যাঁহারা আজ হিন্দুত্বের ব্রাহ্মণত্বের বাজে বড়াই করেন, কই তাঁহারা ত এ আন্দোলন পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হন নাই? এ আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর তো তাঁহারা পাইয়াছেন। আমি যে হিন্দু আজ তাহার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি—যাঁহারা হিন্দুত্বের বড়াই করেন, তাঁহারা আজ তীর্থস্থানকে অত্যাচারের কবলমুক্ত করিবার জন্য যে শাস্তি বরণ করিবেন, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা কঠোরতর শাস্তি বরণ করবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত আছি। আজও যদি তাঁহারা এই আন্দোলনের পরিচালন ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস সানন্দে সে ভার তাঁহাদের করে ন্যস্ত করিতে প্রস্তুত আছে। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ সংগ্রাম জীবন্ত সত্য। এ আন্দোলন সমগ্র হিন্দুজাতির প্রাণের আন্দোলন।”

দেশবন্ধুর এই প্রস্তাবের ফলে ১৯২৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে মোহান্ত যতীন গিরি সম্মানজনক আপোষে রাজী হলেন। তিনি বললেন, তাঁর জায়গায় তাঁর শিষ্য প্রভাত গিরি মোহান্ত হবেন—সমগ্র দেবসম্পত্তি সাধারণ ও যাত্রীদের সুবিধের জন্য ব্যয় করা হবে এবং সকল বিষয়ে দেখাশুনার জন্য জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন একটি পরিদর্শক কমিটি গঠিত হবে।

কিন্তু এই পরিদর্শক সমিতিতে ব্রাহ্মণ সভার কর্তৃত্ব না থাকায় এবং তারা এর বিরোধিতা করায় এই আপোষ শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি—তবে তারকেশ্বরের মত মহাতীর্থের অনাচার অত্যাচার ও গ্লানি যে বহুলাংশে দূর হয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য।

১৯২৪ সালের ১৬ই অগাস্ট তারিখে বাগবাজারে পশুপতি নাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে স্বরাজ্য দলের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই

সভায় সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জন নিম্নলিখিত ভাষণটি দান করেন—

"স্বরাজের জন্য আমরা যে প্রয়াস করছি তার তাৎপর্য এ নয় যে আমরা কোন শাসন পদ্ধতি বিশেষের বিরোধী বা কোনটার পক্ষপাতী। কথাটা হচ্ছে আমরা চাই সেই অধিকার যার জোরে আমরা আমাদের উপযোগী আমাদের কল্যাণকর শাসন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এইটাই হল স্বরাজের মূল ভিত্তি। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অধিকার আর কোন একটা বিশিষ্ট আকারের শাসনযন্ত্র, এর মধ্যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, সেটা ভুললে চলবে না।

"একথা অনেকে জানতে চান আমরা যে স্বরাজ চাই সে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কিনা অর্থাৎ ইংরেজ সাম্রাজ্যের সংগে আমরা সম্পর্ক রাখতে চাই, না, সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে চাই। আমি চাচ্ছি আমার দেশের স্বাধীনতার অধিকার। ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে যদি আমাদের যে অধিকার নষ্ট না হয়, সে সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকায় আমার কোন আপত্তি নেই—তবে ইংরেজ সাম্রাজ্যে থাকায় আমাদের যদি সে অধিকার নষ্ট হয়, তবে আমি বলবো এ সাম্রাজ্যের প্রতি আমার যে প্রীতি আমার স্বদেশের প্রতি অনুরাগ তার চেয়ে অনেক বেশী।

"আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের যে অধিকার সে ঈশ্বরদত্ত অধিকার, আমরা সে অধিকারে বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারিনে। আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট কি বা কি রকমের হলে দেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে, কি রকমের শাসনপদ্ধতি আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে উপযোগী হবে, সে মীমাংসা আমরা করবো। আমাদের বিচারক সাজবার অধিকার বিদেশীর নেই।

"এই ত হ'ল স্বরাজের কথা। স্বরাজ লাভ করতে হ'লে এই সরকারের সংগে সর্বাংশে অসহযোগ প্রয়োগ করতে হবে। অসহযোগের তাৎপর্যে দেশে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করতে হবে যে, লোকে বিদ্বেষ বুদ্ধি বর্জন করে অন্যায়ের রোধ করতে পারে এবং এই স্বেচ্ছাচারী আমলাচালিত শাসন পদ্ধতি অচল করে তুলতে পারে। স্বেচ্ছা-

চারী আমলাচালিত সরকার আমরা চাই না। তাই বলে এ নয় যে, অরাজকতা চাই এবং কোন প্রকার শাসন পদ্ধতি চাই না। এমন কথা আমরা বলিনি। এই কর্মচারীতন্ত্রের এই স্বেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রিত এই গভর্ণমেণ্ট আমরা চালাতে দেবো না এবং সেই উদ্দেশ্যেই দেশের লোকের মনের ভাব এমন করে তুলতে চাই যে তারা ক্রমে সর্বপ্রকার সহযোগিতা বন্ধ করে এই গভর্ণমেণ্টকে অচল করে তুলতে পারে ও আমাদের জাতীয় দাবী এবং জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত হয়ে ওঠে।

"আপনারা যদি অন্যায়ের রোধ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন এবং সমস্ত জাতির মধ্যে সে-শক্তি জাগ্রত করে তুলতে পারেন, তখন আপনারা কি করবেন? তখন গভর্ণমেণ্টকে আমাদের স্পষ্ট করে বলতেই হবে, 'আমাদের বাঁচবার জন্য এ অধিকারের ন্যায্যতা আজ হোক কাল হোক পাঁচ বছর পরেই হোক, তোমরা স্বীকার করতে বাধ্য। কারণ, সে-অধিকার প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতি স্বাভাবিক অধিকার।'

"কোন গভর্ণমেণ্ট আমাদের এ অধিকার দিতে পারে না—আপন শক্তিতে এ অধিকার আমাদেরই অর্জন করতে হবে এবং গভর্ণমেণ্ট যদি তা স্বীকার করতে না চায় তো তাদের বাধ্য করে দেখিয়ে দিতে হবে যে, সে-অধিকার আমাদের জন্মগত অধিকার এবং তা আমরা সাধনা দ্বারা অর্জন করেছি।

"এইজন্য আমাদের শাসনকর্তাদের আমরা বলছি যে, যদি তাঁরা আমাদের এ ন্যায্য দাবী স্বীকার না করেন, তাহলে বর্তমান শাসনযন্ত্রটি না ভেঙে আমাদের কোন উপায়ই নেই। কারণ, আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, এই গভর্ণমেণ্ট এমনি করে চললে আমাদের জাতীয় জীবনের স্ফুরণ অসম্ভব এবং আমাদের জাতীয় উপযোগী রাষ্ট্রতন্ত্র নির্মাণ করাও অসম্ভব। নতুবা বর্তমান শাসন পদ্ধতি বিনষ্ট করায় আমাদের যে-একটা আনন্দ আছে, তা নয়।

"বিশ বছর ধরে আমি আমার দেশের মুক্তির কথা চিন্তা করে

জীবনের অপরাহ্নে কাজে নেমেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আপনারাও এ বিশ্বাস রাখবেন যে, ভগবানের আশীর্বাদে আমার জীবনান্তের পূর্বে আমি আমার উদ্দেশ্য সাধন করতে সমর্থ হব।" (সংক্ষেপিত)

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূজোর সময় ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য দেশবন্ধু সিমলা গেলেন—সেখানকার শান্ত, সুন্দর ও নির্জন পরিবেশে তাঁর শরীরের দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য আরাম তাঁর বরাতে ছিল না। স্বরাজ্য দলের অপ্রতিহিত প্রভাবের ফলে ভীত হয়ে উঠলেন ব্রিটিশ সরকার, জারী করলেন Bengal Ordinance Act (১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর)।

সুভাষচন্দ্র সহ ৭০ জন স্বরাজ্য কর্মীকে গ্রেপ্তার করলেন ব্রিটিশ সরকার। শুধু তাই নয়, এই জনরবও রটে গেল যে, দেশবন্ধু বিদেশ থেকে ফিরে আসামাত্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। বিদেশে প্রিয় শিষ্যদের গ্রেপ্তারের ফলে বিচলিত হয়ে উঠলেন দেশবন্ধু। "সুভাষকে ধরেছে, এবার আমি গভর্ণমেন্টকে কাঁপিয়ে ছাড়ব।"

এই শিষ্যরা ছিলেন তাঁর পুত্রতুল্য—তিনি এদের প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন। একবার কোন এক আত্মীয়ের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে বসেছেন, তখন তাঁর আত্মীয় জনৈক সহকর্মী সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, "I hate him." চিত্তরঞ্জন বিষণ্ণ হয়ে বললেন, "আমি কিন্তু তাকে ঘৃণা করতে পারি না।" নিজের সংসার খরচের টাকা নেই, কোন সহকর্মী এসে সাহায্য চাইলেন; বিনা দ্বিধায় তিনি নিজের টাকা খরচের না রেখে তাকে দিয়ে দিলেন। এ নিয়ে কেউ বললে বলতেন, "আহা, ও যে খেতে পাচ্ছে না।"

তাছাড়া তাঁর স্বরাজ্য দলের এই চরম সার্থকতার মূলে ছিল এই কর্মীদের অবদান—আমাদের ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কোন নেতাই এমন সংঘবদ্ধ কর্মীদল পান নি। সুতরাং এই কর্মীদের গ্রেপ্তারে তিনি যে বিচলিত হবেন, তা খুবই স্বাভাবিক। কলকাতায় ফিরবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তিনি—ফেরার পথে কাশ্মীরের পথে সেই

যে এক সাধু মাদুলী দান করেছিল, তা হারিয়ে গেল। আয়ুর প্রহর আসছে ফুরিয়ে, এই কথাটাই সংগোপনে দিয়ে গেল জানিয়ে।

ফিরে এসেই কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দিলেন। সে-সভায় তিনি উদ্দীপ্ত করলেন বাংলার যুবক সম্প্রদায়কে। তিনি বললেন, "বাংলার যুবক, তোমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতার আগুন জ্বলিয়া উঠুক। স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া এস। আত্মবিসর্জন দিয়া দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া ওঠ। এই জরাজীর্ণ দেহ লইয়া আমি সর্বাগ্রে অগ্রসর হইব। তোমরা অনুসরণ কর। মা, একবার সংহারমূর্তিতে প্রকাশিত হও। মা, আমরা সকলে তোমার সম্মুখে আত্মোৎসর্গ করিয়া স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখি।"

এরপর ১৯২৪ সালের ২৯শে অক্টোবর মেয়রের আসন থেকে তিনি গর্জন করে উঠলেন এই আইনের প্রতিবাদে—"দেশের মধ্যে যদি কোথাও বোমা ফাটে বা কেহ পিস্তল ছোঁড়ে, আমরা অমনিই চীৎকার করিয়া উঠি, 'কী নৃশংস অত্যাচার!' কিন্তু আমরা 'কী নৃশংস অত্যাচার' বলিয়া চীৎকার করি কেন? কারণ, বাস্তবিকই আমরা সেরূপ কার্য অতি গর্হিত অতি নৃশংস বলিয়া বিবেচনা করি।

"কিন্তু আজ এমন দিন আসিয়াছে যে, আমাদের যে সকল দেশবাসী পশুবলে আস্থাসম্পন্ন, শুধু তাহাদের নৃশংসতার নিন্দা করিলে চলিবে না, পরন্তু গভর্ণমেণ্টের নৃশংসতার প্রতিবাদ করিতে হইবে। সুভাষচন্দ্রকে আবদ্ধ করিয়া আমার মনে হয় গভর্ণমেণ্ট এই নৃশংসতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট যে আইন পাশ করিয়াছেন এবং যাহার বলে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, উহা আইন নামের অযোগ্য। উহা বে-আইনী আইন।

"যদি জিজ্ঞাসা করেন, বে-আইনী আইন কাহাকে বলে? তাহা হইলে ১৯১৮ সালে ভারত সংরক্ষণ বিধির (Defence of India Act) প্রতিবাদে আমি কলিকাতার টাউন হলে যাহা বলিয়াছিলাম, সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিব, যে সত্য ও ন্যায়ের

উপর সমাজের স্থিতি, তাহার সেবা ও সংরক্ষণ যে আইনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নয়, সে আইনকে বে-আইনী আইন ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না।

"আমি স্বীকার করি, আমাদের দেশে বিদ্রোহী দল আছে—একথা আমি পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছি এবং আজও করিতেছি। কিন্তু আমি বিদ্রোহ দমনের যে উপায় নির্দেশ করিয়াছি (১৯১৮ সালের ভারতরক্ষা আইন দ্রষ্টব্য), সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কি কখনও চিন্তা করিয়াছেন? সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের সাক্ষ্য এই দমন-নীতির বিরুদ্ধে, কিন্তু এই দমন-নীতি ছাড়া তাহারা কি আর কোন উপায়ই দেখিতে পান না? শুধুই দমন। দমন। আর কোন পন্থার কথা কি তাঁহাদের মনে উদয় হয় না?

"আমি রাজদ্রোহী নহি, রাজদ্রোহীর পন্থা আমার পন্থা নহে। তথাপি আমার হৃদয়ের মধ্যে রাজদ্রোহীর তীব্র মুক্তি কামনা স্পন্দিত হইতেছে। মুক্তির জন্য আমি জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আজ আপনাদের সম্মুখে আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, যদি স্বাধীনতার জন্য জীবন দান প্রয়োজন হয়, আমি সেজন্য সর্বদা প্রস্তুত।

"যদি বিদ্রোহিতায় আমার আস্থা থাকিত, যদি এ বিশ্বাস আমার জন্মে যে, বিদ্রোহিতা সাফল্যলাভ করিবে, তাহা হইলে কালই আমি বিদ্রোহী দলে যোগ দিব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বিদ্রোহ চেষ্টা কখনও সফল হইবে না, এই কারণেই আমি তাহাতে যোগ দিতে পারি না। কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার কথা মনে হইলে আমার বোধ হয় বুঝি আমিও তাহাদের একজন। এই স্বাধীনতার জন্য যদি অশেষ কষ্ট, ঘোরতর প্রতিকূলতা মাথা পাতিয়া লইতে হয় অথবা আমার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু ব্যয় করিতে হয়, তাহার জন্য আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

"সিমলায় থাকিতে আমি শুনিয়াছিলাম যে, আমি যে মুহূর্তে হাওড়ায় পদার্পণ করিব, সেই মুহূর্তেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে।

গ্রেপ্তারের ভয় আমি রাখি না। আমি কোন অন্যায় কর্ম করি নাই। প্রত্যেক সৎ ভারতবাসীর যাহা অবশ্য কর্তব্য, তাহাই করিয়াছি। আমার নিজের ঘরের ব্যবস্থা আমি নিজেই করিতে চাই। এ আমার স্বাভাবিক জন্মগত অধিকার। এ অধিকার আমি চাই।

"স্বদেশপ্রীতি যদি অপরাধ হয়, মুক্তির অনুরাগ যদি অপরাধ হয়, আমি স্বীকার করিতেছি, আমি অপরাধী। সে-অপরাধের জন্য যদি আমাকে ফাঁসিকাঠেও ঝুলিতে হয়, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই—তথাপি বর্তমান ভারতবাসীর যাহা একান্ত কর্তব্য বলিয়া আমি মনে প্রাণে অনুভব করি, তাহার সাধনে আমি পরাঙ্‌মুখ হইব না।

"আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলাম যে, সুভাষচন্দ্রকে যদি বিদ্রোহী বলিয়াই ধরা হয়, তবে তিনি আমার চেয়ে বড় বিদ্রোহী নন। অথচ আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কি আমি জানিতে ইচ্ছা করিতে পারি? জন্মভূমিকে ভালবাসিলে যদি অপরাধ হয়, তবে আমি অপরাধী।

"বিদ্রোহী দলের অত্যাচার নিবারণ করা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।" আইনসঙ্গত উপায়ে দেশের উন্নতির জন্য যে সকল সংঘ বা দল গঠন করা হয়, তাহা নিবারণ করাই এই সকল অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য। ইহাতে কি আপনারা মনে করিবেন না যে, এরূপ অত্যাচারের ফলে বিদ্রোহীদের অত্যাচার শত-গুণ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। এই সকল দমননীতি ও বেআইনী আইনের দ্বারা বিদ্রোহীদের দুষ্কৃতি দমন করা অসম্ভব। তাহা পূর্বে কখনও হয় নাই, ভবিষ্যতে কখনও হইবে না।

"১৯১৮ সালের রেগুলেশনের অপ্রচলিত বিধি অনুসারে সুভাষ-চন্দ্রের গ্রেপ্তার এই মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষেও বিশেষ শঙ্কার বিষয়। ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের শুভাশুভের দিক হইতে অথবা গভর্ন-মেণ্টের সহিত আমাদের জাতীয় বিরোধের দিক হইতে না দেখিলেও, এই গ্রেপ্তারে মিউনিসিপালিটির যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ আছে। গভর্ণ-

মেন্ট যদি আজ অবাধে আপনাদের প্রধান কর্মচারীকে বন্ধন করিতে পারেন, তাহা হইলে বন্ধনের পর বন্ধনের দ্বারা গভর্ণমেন্ট স্বরাজ্য দল-ভুক্ত সভ্যগণ পরিচালিত এই মিউনিসিপ্যালিটির কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

"মনে করুন, গভর্ণমেন্ট যদি ভাবেন, আর একথা মিথ্যা নয়, গভর্ণমেন্ট তরফের কেহ কেহ ভাবেন যে, কংগ্রেসের লোকভুক্ত দলের হাতে এই মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনা ভার রাখা ঠিক নয়, সেই হিসাবে উর্ধতন কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে অন্যান্য কর্মচারীদের গ্রেপ্তার এবং মিউনিসিপ্যালিটিকে অচল করিয়া তোলেন, তাহা হইলে কি কর্তব্য?

"ব্যক্তিগতভাবে সুভাষচন্দ্রের দিক হইতে বা অন্যান্য দিক হইতে না দেখিলেও শুধু মিউনিসিপ্যালিটির হিতাহিতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমার বোধহয় গভর্নমেন্টের এই গর্হিত আচরণের বিরুদ্ধে আপনাদের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করা আবশ্যক এবং আপনাদের যে কর্মচারীকে এইরূপে আপনাদের মধ্য হইতে অপসারিত করা হইয়াছে, তাঁহারা প্রতি আপনাদের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান আবশ্যক।"

এমনি চ্যালেঞ্জের মনোভাব নিয়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দেশপ্রেম যদি অপরাধ হয়, তবে আমি সে অপরাধী, সুতরাং আমাকে গ্রেপ্তার করা হোক—এই উক্তিই স্পষ্ট হয়ে উঠলো মেয়র চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণে।

তাঁর প্রিয়শিষ্য সুভাষচন্দ্রকে বিনা অপরাধী গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এ সহ্য করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বলতেন, "সুভাষকে গ্রেপ্তার করে যেন আমার ডান হাতখানাই কাটা গেছে।"

গঠনমূলক কাজ সুরু করবার পরিকল্পনা রয়েছে কিন্তু কর্মী কোথায়? বিশেষ করে সুভাষের মত অক্লান্ত দেশপ্রেমিক, সাহসী ও বীর কর্মী?

এদিকে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা সরবে প্রচার করলো, সুভাষ এই

ষড়যন্ত্রের অধিনায়ক বলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সুভাষের এ্যাটর্নী এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনলেন। কিন্তু সেই মামলার নিষ্পত্তি হতে কেটে গেল অনেকটা সময়।

এদিকে দেশের এই অবস্থা দেখে নেতারা সবাই বিচলিত হয়ে উঠলেন। গান্ধীজী কলকাতায় দেশবন্ধুর বাড়ীতে এলেন এ সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য। মতিলাল নেহরুও এলেন। দেশবন্ধুর বাড়ীতেই এক ঘরোয়া বৈঠকে দেশের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি স্থির করা হলো। তাতে বলা হলো:—

(১) অসহযোগ আন্দোলন আপাততঃ স্থগিত থাকবে।

(২) খদ্দর পরিধান ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন কংগ্রেসের অন্যতম কার্য হবে।

(৩) স্বরাজ্য দলের কার্য কংগ্রেসের কার্য বলে পরিগণিত হবে এবং তার পরিচালনা ও অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব স্বরাজ্য দলের হাতে থাকবে।

(৪) প্রতিমাসে ২০০০ গজ চরকার সুতো দিয়ে কংগ্রেসের সদস্য হতে হবে।

এই প্রস্তাবে দেশবন্ধু, মতিলাল ও গান্ধীজী স্বাক্ষর করলেন।

এরপর নভেম্বর মাসের ২১ তারিখে বোম্বাইতে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে যোগদানের জন্য দেশবন্ধু বোম্বাই গেলেন। মহাত্মা গান্ধী এই সম্মেলনে স্বরাজ্য দলের এই সাফল্যকেই ব্রিটিশ সরকারের এই চণ্ডনীতির হেতু বলে উল্লেখ করলেন।

এই সম্মেলন থেকে ফিরে এসেই দেশবন্ধু তাঁর পল্লী সংগঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে আহার নিদ্রা ভুলে গেলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ স্বরাজ্য সপ্তাহ রূপে নির্ধারিত হলো। তিনি নিয়ম করলেন যে, কলকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালটির প্রত্যেক ওয়ার্ডে অর্থসংগ্রহের জন্য মুখ-বন্ধ বাক্স দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক গৃহস্থকে কমপক্ষে এক টাকা করে এই ভাণ্ডারে চাঁদা দিতে হবে।

এসময়ে তাঁর অনুগত কর্মীরা সবাই জেলে, সুতরাং একাই তাঁকে সব দিক রক্ষা করতে হয়েছে—দোকান দোকান বাড়ী বাড়ী ঘুরে অর্থসংগ্রহ করা, সভা-সমিতিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দেওয়া ; ফলে, শরীরটা ভেঙে গেল খুব তাড়াতাড়ি।

তিনি নিজেও বলতেন, "স্বরাজ্য সপ্তাহের অতিরিক্ত পরিশ্রমই আমার স্বাস্থ্যভঙ্গের হেতু।" কিন্তু কি করবেন? তিন লক্ষ টাকা যে তাঁর খুব দরকার। এতদিন নানা কাজের চাপে সময় পাননি। কিন্তু বাংলার পল্লী সংগঠন যে তাঁর আজীবনের স্বপ্ন, তা আমরা তাঁর ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর বক্তৃতাতেই দেখেছি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পল্লীবাসীদের দুঃখ-দারিদ্র্য লাঘব না হলে, ভারতবর্ষের গ্রামগুলি উন্নত না হলে জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগতে পারে না। আর, এই পল্লীবাসীরাই তো সংখ্যায় অধিক, সুতরাং এদের জীবন-দেউলে আলোকের দীপবর্তিকা না জ্বালিয়ে তুললে দেশকে জাগানো সম্ভব নয়। সেইজন্য চাই অর্থ, চাই কর্মী, চাই প্রকৃত গঠনমূলক কাজ। সহকর্মীরা সবাই জেলে, সুতরাং একলাই এ কাজের জন্য মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন।

এই সময়ে একটি সভায় তিনি বলেছিলন, "আজ জীবনের সন্ধি-ক্ষণে দাঁড়াইয়া বুঝিতে পারিয়াছি—পল্লীসমাজই ভারতের জীবন, পল্লীসংগঠনেই ভারতের মুক্তি। কিন্তু এই বিপ্লব অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ কোথায়? স্বরাজ্য দলের মধ্যে প্রায় সকলেই তো অর্থহীন। গত নির্বাচনের সময় আমি নিজের নামে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া এই দ্বন্দ্বে সাহায্য করিয়াছি। আপনারা জানেন, আমি ব্যবসা ছাড়িয়াছি। অন্য কোন আয়েরও সংস্থান নাই। আজ আমি কর্পদকহীন। যদি আমার অর্থ থাকিত, বা আমি ব্যবসা কার্যে লিপ্ত থাকিতাম, তবে আমি সামান্য অর্থের জন্য আপনাদের নিকট প্রার্থী হইতাম না। বরাবর তো ঋণ করা যায় না। আর বিনা অর্থে এই জাতীয় সংগ্রামই বা কিরূপে পরিচালিত হইবে?

"কত অর্থ আপনারা থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড়, সিগারেটে ব্যয় করেন। সেই অর্থ হইতে যাহা কিছু বাঁচাইতে পারেন, তাহা দান করিলে আপনাদের কোন অস্বচ্ছলতা হইবে না।

"ইংরাজদের অন্য দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু স্বদেশ হিতৈষণার সমবায় যত্নের তুলনা নাই। জাতীয় স্বত্ব সংরক্ষণে তাহারা অকাতরে অর্থ বিতরণ করিতেছে। Anglo-Indian পত্র সম্পাদকগণ আমদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য কোনরূপ যত্নের ত্রুটি করিতেছে না। আমেরিকা, জাপান ও চীন প্রভৃতি দেশেও আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রচারিত করিতেছে। আমাদেরও সেই রূপ Organisation দরকার।

"কিন্তু সমস্ত কার্য চালাইবার অর্থ কোথায়? আপনারা যদি সকলে মিলিয়া সেই ভার বহন না করেন, আমি একা কি করিয়া পারি? ব্যবসা না ছাড়িলে আমিই সমস্ত অর্থ দিতে পারিতাম। কিন্তু আজ আমি যে দরিদ্র, অক্ষম, কপর্দকহীন। আমি তো ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হই নাই। আমি চাই ভারতের মুক্তির জন্য আপনার প্রদেয় শুল্ক। দেশের লক্ষ লক্ষ প্রাণ কি জাতীয় জীবন সংরক্ষণে ছুটিয়া আসিবেন না?

"এই দুঃসাধ্য সংগ্রামে কি উপায়ে বিজয়লক্ষ্মী আমাদের করতলগত হইবে আমি তো চিন্তা করিয়া পাগলের ন্যায় হইয়াছি। ব্যুরোক্রেসী কেবল অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়ায়াই ক্ষান্ত থাকিবে না। ক্রমে কংগ্রেস ধ্বংসের দিকে তাহাদের লক্ষ্য হইবে। আমার কথা শুনিয়া আপনারা দৃঢ় পণ করুন, ছয় মাস কি বৎসরের মধ্যে প্রমাণ করিয়া দিতে পারি, এই চণ্ডনীতিমূলক আইন কত ব্যর্থ ও অচল। আর যদি স্বরাজ-লাভের পূর্বে আমার মৃত্যু হয়, তবে আমার চিতাভস্মের উপর কোন স্মৃতিচিহ্ন না রাখিয়া কেবল এইমাত্র লিখিয়া রাখিবেন—'বাঙ্গলায় এক বাতুল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এই পথ দিয়া তাঁহার অতৃপ্ত আত্মা চলিয়া গিয়াছে'।"

দেশবন্ধুর অন্তরের সুগভীর বাণী তাঁর এই ভাষণে প্রকাশ পেয়েছে। কুবের আজ ভিখারী হয়েছেন, তাই নিঃসঙ্কোচে জনসাধারণের কাছে হাত পাতলেন তাদের স্বাধীনতার শুল্ক দেবার জন্যে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সংগৃহীত হলো লক্ষাধিক টাকা। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ঘটে আর এক। তাঁর এই স্বপ্নকে সফল করবার পূর্বেই এলো মহাকালের আহ্বান! সুতরাং এই পল্লীসংগঠন সম্পর্কে কেবল কর্মতালিকাই নির্দেশ করে গেলেন। কিন্তু কাজ করে যেতে পারলেন না। অথচ কত কষ্ট করে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অর্থ। কেবল মনে হয়, দেশবন্ধু যা কিছু চেয়েছিলেন, সমস্তই বহুজনসুখায় এবং বহুজনহিতায়, এবং তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা যদি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর উত্তরসূরীরা গ্রহণ করতেন, তাহলে আজকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা হতো অন্য রঙে, অন্য তুলিতে।

তিন সপ্তাহ ধরে স্বরাজ্য সপ্তাহের জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি রওয়ানা হলেন বেলগাঁও কংগ্রেসে। এই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই মহাসম্মেলনে তিনি সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে যে মিলনের বাণী রেখে যান, তাকে জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে। তিনি বলেন:

"I knew that the lasting unity would be achieved when Mahatma Gandhi would be released and I was right. The Bureaucracy has challenged India in Bengal and what was the reply to the challenge? Boycott of foreign cloth. The Bureaucracy expected a feast of quarrels at Belgaum but Mahatmaji has disappointed it. I fully believe in the constructive programme but I also believe in giving the enemy no quarters in uprooting its foundation whenever possible. Councils, I know, will not bring

Swaraj but they impeded our progress and must be destroyed. Local bodies should be captured to build up our lives. Counsel work is not the permanent point of activity with the Swarajists. We should come out after destroying them."

এই কংগ্রেসই দেশবন্ধুর জীবনের শেষ কংগ্রেস। স্বরাজ্য দলের সংগে কংগ্রেসের স্থায়ী মিলন দেশবন্ধুর অন্তরকে পরিতৃপ্ত করলো। জীবনের এই শেষ কংগ্রেসে তিনি পরিপূর্ণভাবে সংযুক্ত হলেন এবং সূচনা ঘটল গান্ধীজীর সংগে স্থায়ী মিলনের।

১৯২৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি বেলগাঁও কংগ্রেস থেকে ফিরে এলেন। শরীর তো আগে থেকেই খারাপ ছিল। তার ওপর বেলগাঁওতে তাঁর থাকা ও খাওয়ার খুব অসুবিধে হয়েছিল। ফিরে এসেই এক চিন্তা—সরকারের Black Bill রোধ করতে হবে। ১৯২৫ সালের ১লা জানুয়ারী পড়লেন বিছানায়—অসহ্য পিত্তশূলের যন্ত্রণা।

শরীরের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল এবং ৪ঠা তারিখে তা গুরুতর আকার ধারণ করলো। ডাক্তারগণও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, কারণ দেহিক অবনতির সংগে সংগে হৃদযন্ত্রও হয়ে পড়ল দুর্বল।

৫ তারিখের পর থেকে অবস্থা একটু উন্নত হলো। ডাক্তারেরা শঙ্কা কাটিয়ে উঠলেন কিন্তু শয্যাশায়ী তিনি। ৬ তারিখে এক বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি দেশবন্ধুর সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন। অশ্রুসজল নেত্রে তিনি তাঁকে বললেন, "আমি চলেছি, দেশ রইল আর আপনারা রইলেন।"

এলো ৭ই জানুয়ারীর প্রভাতবেলা। শরীরে বল নেই, কণ্ঠ দুর্বল। সেই ক্ষীণকণ্ঠেই সর্বশক্তি দিয়ে বলে উঠলেন তিনি, "না, আমাকে আজ যেতেই হবে। আমার দেশের সোনার ছেলেরা বিনাবিচারে নির্বাসিত আর আমি নিজের শারীরিক কষ্টের জন্য দেশের প্রতিনিধি

ছাড়া সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়ে নেবার সুযোগ দেবো! প্রাণ থাকতে তা হতে দেবো না।"

তাঁর এ উক্তিতে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন ডাক্তাররা। উৎকণ্ঠিত হলেন আত্মীয় পরিজনরা—এই শরীরে বাইরে গেলে কি বাঁচবেন? কিন্তু না যেতে দিলেও মানসিক উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতার ফলে শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হবে। এইসব বিবেচনা করে ডাক্তাররা শেষ পর্যন্ত যাওয়ার পক্ষেই রায় দিলেন।

বাড়ী থেকে স্ট্রেচারে করে এলেন কাউন্সিল গৃহে। তাঁর এই অপরিসীম স্বদেশভক্তি দেখে সকলে বিমুগ্ধ হলো। ইংরাজরাও তাঁর স্বদেশপ্রীতির ভূয়সী প্রশংসা না করে পারলেন না। কাউন্সিল গৃহে তিনি সর্বক্ষণ শুয়েই ছিলেন। কর্তব্যের আহ্বানে এই গুরুতর পীড়াকে উপেক্ষা করে আসতে দেখে বিরোধী পক্ষরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর পক্ষে ভোট দিল। ভোট গ্রহণ শেষ হলে দেখা গেল, Ordinance Bill-এর স্বপক্ষে দেওয়া হয়েছে ৫৫টি ভোট, আর তার বিপক্ষে পড়েছে ৬৬টি ভোট—অতএব দেশবন্ধুই জয়ী হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সরকারের বিশেষ ক্ষমতা বলে এই Ordinance বিলকে আইনে রূপান্তরিত করা হলো।

এর ৪।৫ দিন পরে তিনি বিশ্রামের জন্য তাঁর ভাই প্রফুল্লরঞ্জনের কাছে গেলেন। এই সময় অনিদ্রা রোগে তিনি খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন—আর পাবেন নাই-বা কেন—সমগ্র দেশের চিন্তা একজনের মাথায়! ডাক্তার এলে তিনি তাঁকে বললেন, "ডাক্তারবাবু, না ঘুমিয়ে মারা গেলুম। তিন মাস ঘুমুইনি, কিছু ওষুধ দিয়ে ভাল করতে পারেন?"

ডাক্তারবাবু অনেক প্রশ্ন করে বললেন, "আপনি বড় ভাবেন, ভাবনা ছাড়ুন।"

দেশবন্ধু—ভাবনা ছেড়েছি। ব্যারামের দরুণ ঘুম হয় না।

এরপর ডাক্তারের চিকিৎসায় তাঁর সুনিদ্রা হলো। রাত্রে ৭ঘণ্টা করে ঘুম হলো। তিনি ডাক্তারকে বললেন, "আপনি আমার খুব

উপকার করলেন। আপনাকে কিছু নিতে হবে। কেন নেবেন না?"

ডাক্তার—আপনি কি দেবেন? দেশের জন্য তো সর্বস্ব দিয়ে আপনার কি আছে?

দেশবন্ধু—না, আমার কিছু নাই। অবশ্য দ্বিধা করবারও কিছু নাই।

এরপর তিনি ধীরে ধীরে একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। রোজ বিকেলবেলা বেড়াতে যেতেন, সংগে নিতেন ডাক্তার সান্যালকে। এ সময় দুজনের মধ্যে নানা বিষয়ের আলোচনা হতো।

একদিন দেশবন্ধু বললেন, "আমার কিছুদিন বাঁচা দরকার মনে করি। কিন্তু বেশিদিন বাঁচবো না। My days are numbered."

ডাক্তার তাঁর এই কথা শুনে চুপ করে রইলেন। দেশবন্ধু বললেন, "The Silent Doctor shook his head."—বলে সজোরে হেসে উঠলেন।

এমনিভাবে কেটে গেল দু'মাস। মার্চ মাসে কাউন্সিলে আবার মন্ত্রীর বেতন প্রসঙ্গ উঠবে, সুতরাং তাঁকে ফিরে আসতে হলো কলকাতা।

কলকাতা পৌঁছেই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি কাউন্সিলের সভ্যগণকে আহ্বান করে বললেন, "যদি মায়ের ডাক কানে পৌঁছিয়া থাকে, তবে সকলে মিলিয়া মন্ত্রীর বেতন অগ্রাহ্য করুন। আপনার নিজের বলিতে আছে এক বিবেকবাণী। আজ স্বার্থচালিত হইয়া সে-বাণীর কণ্ঠরোধ করিবেন না। আপনার স্বদেশপ্রাণ বীরগণ আজ জেলে শৃঙ্খলিত, আপনার কোন স্বাধীনতা নাই। আজ আপনার স্বদেশবাসী বুভুক্ষিত, ব্যাধি ক্লেশ অনাহারে জর্জরিত। আজ ব্যুরো-ক্রেসীর হাত হইতে সমস্ত সহায়তা অপসারিত করুন। ব্যুরোক্রেসীর নিরূপিত মন্ত্রীর বেতন অগ্রাহ্য করুন।"

তারপর এ ব্যাপার নিয়ে এই ভাঙ্গা শরীর নিয়েই তিনি দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন।

এলো ১০ই মার্চ—কাউন্সিলে বৈঠক বসলো। প্রেসিডেন্ট ইভান্স কঠিন রোগমুক্তির জন্য দেশবন্ধুকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। সভায় একে একে অন্যান্য বক্তারা বক্তৃতা দেবার পর দেশবন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, "আমার শরীর অসুস্থ. তথাপি কাউন্সিলের সম্মুখে আজ যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে দুই-একটি কথা না বলিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। আমার কয়েকজন বন্ধু শ্রীযুক্ত ফজলুল হক মহাশয়ের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি ও আমি বিষয়টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক হইতে দেখি। কিন্তু তাঁহার মতের ভিত্তি কি, তাহা কেন অনেকে দেখিতে পান না, তাহা আমি বুঝি না। আমি তাঁহার সহিত একমত নহি, তবু তাঁহার মতবাদের ভিত্তি কি, তাহা আমি বুঝি।

"দ্বৈত শাসন পদ্ধতির পক্ষে আজ যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মর্ম এই যে, সকল বিভাগের কর্তৃত্ব মন্ত্রীগণের হাতে দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা আমরা কেন দেশের উন্নতিকল্পে কাজে লাগাইব না? কেন সাধারণ প্রজাগণের হিতসাধনের, কৃষি শিল্পীগণের উন্নতির সুযোগ নষ্ট করিব?

"শ্রীযুক্ত ফজলুল হক মহাশয় বলিতে চান যে, মন্ত্রীগণ যতক্ষণ কায়েমী না হন, দেশের হিতসাধনের জন্য তাহাদের যে সামান্য ক্ষমতা আছে, তাহা কার্যে পরিণত করার উপযুক্ত অবসর তাঁহারা যতক্ষণ না পান, ততক্ষণ সে চেষ্টা করা বৃথা।

"আমার বিবেচনায় দ্বৈতশাসন এদেশে একদম নিষ্ফল হইয়াছে। আমার আরও বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে দ্বৈতশাসন পদ্ধতি চালানো আরও দুরূহ হইয়া উঠিবে। স্বরাজ্য দলের সভ্যগণ শুধু ধ্বংস করিতে চান, একথা বলিলে তাহাদের উপর ঘোরতর অবিচার ও অবমাননা করা হয়। তাঁহারা ভাঙ্গিতে চান সত্য, কিন্তু সে শুধু গড়িবার জন্যই।

"বর্তমান গভর্নমেন্টের কাজে আমরা বাধা দিই, তাহার কারণ,

গভর্নমেন্টকে সংস্কৃত করিয়া নূতন করিয়া গড়িবার অবসর খুঁজি। আমার মনে হয়, এ নীতি অতি সহজ। যে কোন দেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন, ঠিক একই নিয়মে সে-দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস গঠিত হইয়াছে। অবাধ রাজশক্তিকে প্রতিহত না করিয়া কোন দেশের প্রজাবর্গ রাষ্ট্রশক্তির অধিকারী হয় নাই। আমাদের দেশের শাসনপদ্ধতি অধর্মমূলক ও অকল্যাণকর।

"গভর্ণমেণ্ট যখন সমস্ত ব্যাপারে নিজের জিদ বজায় রাখিবেন, কাজেই এই অবস্থায় সহযোগিতার অর্থ ভারতবাসীগণ তাহাদের ইচ্ছা আকাজ্ক্ষা ও নীতি জলাঞ্জলি দিয়া সর্ববিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট মস্তক অবনত করে। আমি কিন্তু সহযোগিতার এই অর্থ জীবনে কখনও শিক্ষা করি নাই। গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু আমি চাই আপনারা আমাকে সত্য ও আন্তরিক সহযোগিতার পথ প্রদর্শন করুন। বর্তমান অবস্থায় সে-পথ আছে বলিয়া আমি মনে করি না।

"আমরা তখনই সহযোগিতা করিব, যখন আমরা দেখিব, গভর্ণ-মেণ্টের সহিত আদানপ্রদান সম্ভব, যখন আমরা দেখিব, গভর্ণমেণ্টের অন্তরে প্রজাগণের দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, যখন দেখিব গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার দিতে প্রস্তুত। বর্তমানে আপনারা কি তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইতেছেন? আমি গভর্ণমেণ্টের সেরূপ কোন ইচ্ছার অস্তিত্ব অনুভব করি না।

"আমাদের মুক্তির জন্য আমরা যাহা কিছু করিতে চাই, তাহা ঘৃণিত অপরাধ বলিয়া গণ্য। দেশের এই অবস্থায় আপনারা আমাকে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে বলেন? বর্তমান অবস্থায় আন্তরিক সহযোগিতার কোন পথ নাই। স্বরাজ্য দল সহযোগিতার বিরুদ্ধে একথা কখনও মুখে আনিবেন না। যে-গভর্ণমেণ্ট সৎ, সম্মানার্হ এবং প্রজাহিতকর, সেরূপ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে স্বরাজ্য দল সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

"আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, দ্বৈতশাসন বিনষ্ট করিলে আমাদের কি লাভ হইবে? আমরা এরূপ রাষ্ট্রবিধান করিতে চাই, যাহা প্রাণহীন হইবে না, যাহা আমাদের স্বাধীনতার সোপান হইবে, যাহার ফলে ভারতবাসী ভিন্নদেশীয় হিতৈষীগণকে প্রকৃতবন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। আমি জোর গলায় বলিব, আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় বিধানে সে-সুযোগ নাই।

"আর-একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে, দ্বৈতশাসন ধ্বংস করিবার পর আমরা কি করিতে চাই? উত্তর—তাহা অবস্থার পরিবর্তন ও পরিণতির উপর নির্ভর করিবে। আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান শাসনপদ্ধতি অন্যায় ও অধর্মমূলক এবং কোন সৎ লোক আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া এই গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে না, স্বরাজ্য দলের এই সিদ্ধান্ত। এই জন্যই আজ আমি গভর্ণমেন্টের এই প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছি।

"যদি প্রস্তাব গৃহীত না হয়, গভর্ণমেন্টের সম্মুখে দুইটি পথ আছে। যে সকল বিভাগ মন্ত্রীগণের কর্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহাদিগের পরিচালনার ভার গভর্ণমেন্ট স্বহস্তে লইতে পারেন। যদি করেন তবে তাহা আমাদের পক্ষে গৌরবজনক বিবেচনা করিব, কারণ এরূপ গভর্ণমেন্ট চালাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও সমুদয় দোষভার গভর্ণমেন্ট স্কন্ধে নিপতিত হইবে। এরূপ না করিয়া গভর্ণমেন্ট বর্তমান সদস্যসভা ভাঙ্গিয়াও দিতে পারেন।

"তাহা করিলে আমি সন্তুষ্টই হইব—কারণ, স্বরাজ্য দলের সভ্যগণ আরও অধিক সংখ্যার নির্বাচিত হইয়া কাউন্সিলে ফিরিয়া আসিবেন। তাহাতে স্বরাজ্য দলের সুযোগ ও সুবিধা আরও বর্ধিত হইবে। গভর্ণমেন্ট যাহাই করুন, তাহাতে আমরা ভীত নহি। আমাদের দেশবাসীগণ আমাদের সহায়।" (সংক্ষেপিত)

তাঁর এই অভিভাষণ জনগণ কর্তৃক আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করলো। মৃত্যুর পূর্বে কাউন্সিলের শেষ অভিযানে জয়ী হলেন।

ডায়ার্কি আপাততঃ ধ্বংস হলো। ২৬শে মার্চ কাউন্সিলের কাজও বন্ধ হয়ে গেল আপাততঃ। অবশেষে নিরুপায় হয়ে লর্ড লিটন মন্ত্রীর শাসন কাউন্সিলের সদস্যদের দ্বারা পরিচালনা করতেন।

দেশবন্ধুর এই জয়ে Statesman পত্রিকা লিখলো: "India's evil genius, servant of chaos. His spiritual House is Moscow, the general headquarters of force, of hate."

এই মার্চ মাসে একরকম ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করেই তাঁকে পুনর্বার মেয়র নির্বাচিত করা হলো।

কাউন্সিলে জয়লাভের পর, আবার তিনি ফিরে গেলেন পাটনায়। আত্মীয়-পরিজনগণ তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে খুবই আনন্দলাভ করলেন। তিনি নিজেও ডাক্তারবাবুকে বললেন, "সান্যাল মহাশয়, ভাল হয়ে গেছি। আর কোন অসুখ নেই।"

ডায়ার্কি ধ্বংস করায় নূতন উদ্যম ফিরে পেলেন। মনে অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন—কত কাজ বাকী! একে একে এখন সেগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

কিন্তু হায়! নির্মম বিধাতার নির্দেশে অসম্পূর্ণ জীবনের রথ গেল থেমে। তিনি পাটনায় অবস্থান কালেই লর্ড বার্কেনহেডের সংগে একটা আপোষ নিষ্পত্তির আলোচনা হয়। এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর মনে খুব আশা ছিল যে, একটা কিছু হবেই।

দেশবন্ধু এই আপোষের প্রস্তাব করলে অনেক বিদ্রূপের সুরে বলতে সুরু করলেন, দেশবন্ধু মডারেট হয়েছেন, তিনি নরম সুর ধরেছেন।

লোকের একথার উত্তরে তিনি বললেন, "আমি পূর্বেও যা বলিতাম, এখনও তাই বলি—অগ্রসর হও, অবিশ্রান্ত যুদ্ধ কর। কিন্তু তোমাদের কাজে যেন কোন কলঙ্ক স্পর্শ না হয়।"

এই সময়ে পাটনায় অবস্থানকালে তাঁর ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও

আশার ছবি তিনি মেলে ধরতেন পরম বন্ধু এবং চিকিৎসক ডাঃ সান্যালের কাছে। তিনি বলতেন, "এই আপোষ-নিষ্পত্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেছি, তার কারণ খানিকটা Compromising attitude না নিলেও হয় না। গঠনমূলক কাজ দরকার। Political freedom-এর চেয়ে Economic freedom বেশি দরকারী। দেশের জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা দরকার। They feel and groan, but cannot speak."

ডঃ সান্যাল—এ সবের জন্যেই অনেক টাকা দরকার।

দেশবন্ধু—কত টাকা রোজগার করেছি। আজ যদি ৩০।৪০ লাখ টাকা থাকতো, এ সব দিকেই ব্যয় করতাম। Corporation-এর মধ্য দিয়ে যদি লোককে টাকায় ৪।৫ সের দুধ দিতে পারি, পাঁচ-ছআনা যদি মাংসের সের হয়, আর ভাল খাওয়ার সঙ্গে free education দিতে পারি, তবেই কলকাতার লোকদের সুবিধে হয়।

তিনি আরও বলতেন, "Healthy and plenty of food, spiritual development এবং political unity—এই হচ্ছে ভারতবর্ষের ideal. আমার কাজ দেশের দারিদ্র্য দূর করা। গভর্ণমেণ্ট যতই রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করবেন, টাকাকড়ি ততই অপরের হাতে গিয়ে পড়বে। বড় একটা ব্যাঙ্ক করে ত্রিশ কোটি টাকা হাতে রেখে আমি চাষীদের অবস্থার পরিবর্তন করবো। ইয়োরোপীয়ান মার্কেট যেভাবে খুশি কম্যাণ্ড করতে পারবো। সেরে উঠেই সেটা আমার next step হবে।

"Efficiency of party system-এর কতকটা আইডিয়া আমি দেশের লোককে দিতে পেরেছি; আমি মরে গেলেও লোকে তা ছাড়বে না। কিন্তু economic slavery meet করবার জন্যে কোন চেষ্টাই হচ্ছে না। এই economio sluvery থেকে মুক্তি পাবার উপায়, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করা। আমাদের দেশের লোকেরা ব্যবসা ও শিল্পে আত্মনির্ভর হতে ভুলে গেছে। মনে

হয় গিরিশ ঘোষের কথা—তিনি বলতেন :

কিন্তু এই দুঃখ মনে,   ভারত-সন্তানগণে,
কোনমতে শিখিল না আপন নির্ভর।
শিল্পকার্যে নিয়োজিত করিল না মন॥"

জীবনের প্রথম থেকেই দেশের এই ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কথা শুনলে দেশবন্ধু খুব আনন্দিত হতেন এবং তাঁর আইনজীবী জীবনে অনেক ব্যবসায়ে তিনি অনেক টাকা দিয়েছেন।

তাঁর এই সব পরিকল্পনার কথা শুনে ডাক্তার বলতেন, "আপনি আবার প্র্যাকটিস্ করুন, টাকা হবে, আবার অনেক কাজ করতে পারবেন।"

দেশবন্ধু—সান্যাল মশায়, অনেক দেশ ঘুরলুম। মানুষ অনেক দেখেছি। পূর্বে লোক চেনবার শক্তি হয়নি। অবকাশও হয়নি। প্রকৃত ভাল লোকের সঙ্গে ভগবান এ অবস্থায় আমায় দিচ্ছেন। দেখুন দেখি কোন্‌টা ভাল? আমার তো মনে হয় রাজারাজড়ার আয় অপেক্ষা এই আনন্দেরই মূল্য বেশী।

একদিকে দেশকে জাগিয়ে তোলার অদম্য বাসনা, অন্যদিকে মনটা পড়ে আছে মজরুল হকের আশ্রমের মত এক নিভৃতের অন্বেষণে। কিন্তু সে অবসর কোথায়? সামনে যে পড়ে আছে বিরাট দেশ—দেশবাসীর কাছে স্বরাজের স্বপ্নকে করে তুলতে হবে সার্থক। তাই মনে হয়, দেশের জন্য দেশবন্ধুর ব্যবসা ত্যাগ বা সর্বস্ব ত্যাগকে ছাপিয়ে উঠেছে আত্মার মুক্তির জন্য ক্রন্দনের বাসনাকে দেশের মুক্তির জন্য অবদমিত করা—নইলে পরিণত জীবনে আমরা মহাপ্রভুর ভাবে বিভোর অন্য এক দেশবন্ধুর সাক্ষাৎ পেতাম। তিনি হতেন সাধক দেশবন্ধু!

২৮শে এপ্রিল তিনি পাটনা থেকে ফিরে এলেন কলকাতা—ডাক এসেছে ফরিদপুর সম্মিলনীতে যাবার জন্য। ৩০শে এপ্রিল তিনি রওয়ানা হলেন ফরিদপুর। ২রা মে অধিবেশন—দেশবন্ধুর শরীর

খুব খারাপ। কিন্তু তাঁর কাছে শরীরের চেয়ে কর্ত্তব্যের আহ্বান যে কত মূল্যবান, তা আমরা দেখেছি তাঁর Ordinance Bill-এর বিরুদ্ধে ৭ই জানুয়ারী Council উপস্থিতিতে। এই সময়ে অনেক বিপক্ষদলীয় লোক ঝামেলা বাঁধাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তাদের বুঝিয়ে শান্ত করেন।

এই ফরিদপুর অভিভাষণ দেশবন্ধুর জীবনে শেষ অভিভাষণ। মনে পড়ে সেই স্কুলের ছাত্র ছোট্ট ছেলেটি বন্ধুবান্ধব বা ভাইবোনকে একত্র করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতো—সেই উদাত্ত ও মধুর কণ্ঠস্বর আর শোনা যাবে না।

সভায় উঠে দাঁড়ালেন সভাপতি দেশবন্ধু। সুরু করলেন তাঁর অপূর্ব অভিভাষণ ঃ

"যুগে যুগে ভারতবর্ষে এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে—'মুক্তি কোন্ পথে?" ইহাই ভারতবর্ষের আত্মপ্রশ্ন। চৈতন্যচরিতামৃতেও এই প্রশ্নের সমাধানের একটা চেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া কেবল ধর্ম নহে, কেবল দর্শন নহে, কেবল কাব্য বা মহাকাব্য বা সাহিত্যও নহে, পরন্তু কত বড় বড় সাম্রাজ্য, কত বড় বড় রাজপ্রতাপ আমাদের জাতির ইতিহাস পথে গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার কালক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের পথ—গতিমুক্তির পথ। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস তাহাও এক প্রচণ্ড গতিপথে যুগে যুগে মুক্তি পাওয়ার ইতিহাস অথবা এক চিরন্তন মুক্তিপথে পুনঃ পুনঃ অতিদুর্দম গতিবেগের ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবল ধর্মের ইতিহাস নহে, শুধু দাসত্বের ইতিহাসও নহে।

"ব্যক্তিই হউক বা জাতিই হউক, মুক্তির প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বিচার করিতে হইবে—কি হইতে মুক্তি? সকলেই বলে যে, দাসত্ব হইতে মুক্তি। আমি তাহার সঙ্গে আরও বলিতে চাই যে, পাপ হইতেও মুক্তি। কে এই পাপ করে? আমি বলি, যে দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল ক্রীতদাসের গলায় বলপূর্বক বন্ধন করিয়া দেয়, সে-ই পাপ করে। আমি আরও

বলি, যে ক্লীব, ভীরু, দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার সময়েও বাধা দেয় না, সে-ও পাপ করে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব দণ্ড যেন তারে বজ্রসম দহে।'

"মুক্তির আদর্শ লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে আমার মনে হয় স্বরাজের আদর্শ অপেক্ষা Independence-এর আদর্শ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ। ইহা সত্য যে, Independence-এর অর্থ dependence বা অধীনতার অভাব। কিন্তু অধীনতার অভাব হইলেই ভাবাত্মক (Positive) কিছু স্বতঃই আমরা নাও পাইতে পারি—আমাদের প্রয়োজন শুধু অধীনতার অভাব নহে, ভাবাত্মক বা বস্তুগত এক অখণ্ড স্বরাজের প্রতিষ্ঠা।

"কল্য প্রভাতেই ভারতবর্ষ Independent অর্থাৎ অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, যদি যে কোন উপায়েই হউক, ইংরেজ এদেশ হইতে চলিয়া যায়। কেবল তাহাতেই আমি স্বরাজ অর্থে যাহা বুঝি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। ইংরেজ চলিয়া যাওয়া একটা অভাবাত্মক ব্যাপার; স্বরাজ অভাবাত্মক কিছু নয়। সুতরাং ইংরেজ চলিয়া যাওয়া আর স্বরাজ লাভ—এক বস্তু নহে। স্বরাজ লাভ একটা বিশেষ রকমের ভাবাত্মক বস্তুর উদ্ভব বা প্রতিষ্ঠা।

"জাতীয় মুক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে independence-এর আদর্শের মধ্যে একটা শৃঙ্খলার বড় অভাব বলিয়া বোধ হয়। যেন নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এই বিবিধ উপকরণ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এক সুমহান ঐক্য স্থাপনের জন্য শৃঙ্খলা রক্ষা করা বা শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা স্পষ্ট আমাদের বুঝা উচিত আমরা যাহা প্রতিষ্ঠা করিতে যাইতেছি, তাহার সহিত যেন আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির যে বৈশিষ্ট্য, যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক আবেষ্টন, তাহার মিল থাকে।

"আমার মনে হয়, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভারতবর্ষীয়দের

মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার লোকেরা আছে, তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ঐক্যস্থাপনের জন্য আমাদের জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমি বলি না, তাহার জন্য আমাদের দুই হাজার বৎসর পূর্বে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমাদের সম্মুখের নবযুগের মহামিলন ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু আমরা আমাদের জাতীয় সভ্যতার যে বৈশিষ্ট্য, তাহাকে পরিত্যাগ করিব না। তাহাকে রক্ষা করিয়া উত্তরোত্তর তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া অগ্রসর হইব।

"এখন দেখিতে হইবে, independence-এর আদর্শ হইতে স্বরাজের আদর্শে পার্থক্য কি? আমি বলি, আমাদের জাতির সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার যে আদর্শ, তাহাই স্বরাজ। Home rule এবং self-government-এর যে আদর্শ, তাহার মধ্যে আমি ত্রুটি দেখিতে পাই। এই সমস্ত আদর্শের মধ্যে যাহা আছে, স্বরাজের আদর্শের তাহা আছে। কিন্তু আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাতে rule অর্থাৎ শাসন এই কথাটির মধ্যে যে ভাব ফুটিয়া ওঠে, তাহার বিরুদ্ধে আমার মন বিরূপ হইয়া ওঠে। তা যে শাসন—ঘরেরই (Home) হউক আর পরেরই (Foreign) হউক।

"তারপর প্রশ্ন—আমরা যে জাতীয় মুক্তিলাভ করিব, তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া, না, তাহার বাহিরে গিয়া? কংগ্রেস ইহার স্পষ্ট উত্তর দিয়াছে। আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার যে সমস্ত অধিকার, তাহা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বীকার করে, তবে আমাদের এই সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। আর যদি স্বীকার না করে, তবে বাধ্য হইয়া সাম্রাজ্যের বাহিরে আমাদের যাইতে হইবে। কেন না, জাতীয় মুক্তি আমাদের লাভ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত।

"আমি নিজে এই সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিবার জন্য একটি বিশেষ কারণে উৎসাহ পাই। এই কারণটি রাজনৈতিক নহে, আধ্যাত্মিক। সমগ্র মানবজাতির একটা মহামিলনের যে স্বপ্ন, তাহাকে আমি সত্য

বলিয়া বিশ্বাস করি। মানব জাতির ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা বড় কিছু কল্পনায় বা ধারণায় আসে না।

"এখন জাতীয় মুক্তির আদর্শ ছাড়িয়া দিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

"হিংসা কোন যুগেই আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ছিল না, বা এখনও নাই। সুতরাং হিংসামূলক কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারি না। কেন না তাহা আমাদের জাতীয় সভ্যতার আদর্শে নাই। অবশ্য আমি বলি না যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ নাই অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই। আমি বলিতে দ্বিধা করি না যে হিংসামূলক বিদ্রোহ দ্বারা আমরা কখনই জাতীয় মুক্তিলাভ করিতে পারিব না কিন্তু আমি যেমন হিংসামূলক উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলাম, তেমনই আমি না বলিয়া পারি না যে, গভর্ণমেন্টের হিংসামূলক শাসনপদ্ধতিই বাংলাদেশে প্রজাশক্তির মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করিয়াছে।

"রাজ-অত্যাচারের পরেই একটা রাজদ্রোহিতার সূত্রপাত হয়। আবার এই রাজদ্রোহিতার পরে পুনরায় একটা রাজ-অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে। খালি তাই নয়, গভর্ণমেন্ট যখনই প্রজার হিতের জন্য কোন আইন পাশ করেন, আবার ঠিক তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দমন নীতির সমর্থন করিয়া আর-একটা আইনও পাশ করা হয়।

"যাহা হউক, হিংসামূলক রাজদ্রোহিতার ভাব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেন না, এই উপায় প্রথমতঃ নীতিবিরোধী। দ্বিতীয়তঃ ইহার দ্বারা কৃতকার্য হওয়া যাইবে না।

"তারপর প্রশ্ন সেই চিরন্তন প্রশ্ন—তবে 'মুক্তি কোন্ পথে?' কি উপায় অবলম্বনে আমরা স্বরাজ লাভ করিব?

"আমি যদি বুঝিতাম Reform Act-এ সত্যকার কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব আমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যাহার বলে আমরা

জাতীয় অভাব সকল পূর্ণ করিয়া জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কার্য করিতে স্বীকৃত হইয়া Council Chamber-এর ভিতরে থাকিয়াই জাতির গঠনমূলক কার্যে প্রবৃত্ত হইতাম ও আমার দেশবাসীকে সেইরূপ করিতে পরামর্শ দিতাম। কিন্তু মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া আমি আসল বস্তুটি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নই।

"বর্তমান Reform Act-এর আসল কথা হইতেছে যে, গভর্ণমেণ্ট মন্ত্রীদিগকে বিশ্বাস করে না, অবিশ্বাস করে এবং যেখানে এইরূপ অবিশ্বাস মনের মধ্যে থাকে, সেখানে সেই অবিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে সহযোগিতা বা একত্রে কাজ করিবার কথা মুখে আনা যায় না।

"আমার কথা এই যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত একত্রে কাজ করিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই—কেবল যদি গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিয়া সত্যকার ক্ষমতা ও দায়িত্ব আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেন। একত্রে কাজ করাকে সার্থক করিতে হইলে দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমাদের শাসনকর্তাদের আমাদের উপর মনের ভাব যথার্থ পরিবর্তন হওয়া চাই।

"দ্বিতীয়তঃ, সম্পূর্ণ স্বরাজ নিকটবর্তী ভবিষ্যতে আপনা হইতেই বিনা বাধায় যাহাতে আমরা পাইতে পারি, এখনই তাহার সূত্রপাত করা দরকার। গভর্ণমেণ্ট এবিষয়ে আমাদিগকে এমনভাবে কথা দিবেন যে, তাহার যেন আর নড়চড় না হইতে পারে।

"আমি বরাবর বলিয়াছি যে, গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করিবার সুযোগ লাভ করিতে হইলে আমাদের প্রচুর স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। আপনারা বুঝিতে পারেন যে, একটা জাতির ইতিহাসে, স্বাধীনতা লাভ করিবার পথে কয়েক বৎসর মাত্র ব্যবধান খুব বেশি সময় নয়। অবশ্য সেই পথে অগ্রসর হইতে এখনই যদি আমরা সুযোগ পাই, প্রকৃত স্বরাজ লাভের ভিত্তি এখনই যদি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যথার্থরূপে যদি আমাদের ও গভর্ণমেণ্টের মনোভাব পরিবর্তন হয়, উভয়পক্ষের সব

যদি সরল হয়, তবে সফলতা সহজেই করতলগত হইতে পারে। অন্যথা সফলের কোন সদুপায় আমি তো দেখি না।

"বাঙ্গলা দেশের মনের ভাব আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আভাসে কতকগুলি সর্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্টের হঠাৎ দমননীতি প্রয়োগের যে কতকগুলি ক্ষমতা ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ রাজনৈতিক বন্দীদের সর্বপ্রথমেই ছাড়িয়া দিবেন।

"দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ সামাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই যাহাতে আমরা নিকটবর্তী ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিতে পারি, তাহার সম্বন্ধে পাকা কথা দিবেন। সে-কথার কোন নড়চড় হইতে পারিবে না।

"তৃতীয়তঃ পূর্ণ স্বরাজ লাভের পূর্বে ইতিমধ্যে এখনই আমাদের শাসনযন্ত্রকে এমনভাবে পরিবর্তন করিবেন, যাহাতে পূর্ণ স্বরাজ লাভের স্থায়ী পাকা ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

"তারপরের কথা, গভর্ণমেণ্ট যদি আপোষের কথায় কর্ণপাত না করেন, তখন আমরা কি করিব? ইহার উত্তর খুব সহজ। গত দুই বৎসর কাল যেভাবে কার্য করিয়া আসিতেছি, সেইভাবে সেই পথেই কার্য করিতে থাকিব এবং তাহাতে ফল এই হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট তাহার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত অধিকারের প্রয়োগ ও অপব্যয় করা ভিন্ন স্বাভাবিক নিয়মে শাসনযন্ত্রের পরিচালনা করিতে পারিবেন না—যেমন এখন পারিতেছেন না।

"চারিদিকেই আমি মনের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু যদি আপোষের সকল প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়, সকল ভরসা নির্মূল হইয়া যায়, তবে নিশ্চয় ভারতবাসীকে অহিংসামূলক অবাধ্যতা (civil disobedience) গ্রহণ করিতে হইবে।

"আমার আশঙ্কা হয়, মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কার্য পূর্ণরকমে সফল না হইলে civil disobedience সম্ভবপর হইবে না। তথাপি

আমাদের আদর্শকে সর্বদাই আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল রাখিতে হইবে। কেননা, যে রকমেই হউক, স্বাধীনতাকে আমরা লাভ করিবই।

"তবে আমি বলিতেছি, আপোষের সম্ভাবনা আমি দেখিতেছি। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি দেখিতেছি, বিচ্ছিন্ন মানবজাতির মধ্যে একটা গঠন, একটা শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের জন্য মানবের আত্মা ব্যাকুল হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি, জগতের এই মহামিলনে ভারতবাসী খুব বেশি সাহায্য করিবে। জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষের কিছু বলিবার আছে। ভারতবর্ষ তাহা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পায়ে ভর করিয়া ভারতবর্ষ দাঁড়াইয়াছে। মানবের বিভিন্ন জাতির মিলন মন্দিরের সিংহদ্বারে ভারতবর্ষ তাহার যুগ-যুগান্তরের অমরবাণী লইয়া সমুপস্থিত। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ কি পথের কণ্টক হইবেন? আমি আশা করি না। ভারতবর্ষের ইংরেজ সম্প্রদায়কে আমি বলি যে, তোমরা স্বাধীনতার পতাকা বহনকারী এক মহিমান্বিত জাতির বংশধর আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে কি তোমরা সাহায্য করিবে না?

"বাংলার উৎসাহী কর্মীদিগকে আমি বলি যে, তোমরা এই স্বাধীনতার যুদ্ধে এ যুগে বহু স্বার্থত্যাগ করিয়াছ, বহু কষ্ট পাইয়াছ। তোমাদের উপরই রাজরোষ সংহারের মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এখনও সময় আসে নাই, যখন তোমরা সসম্মানে অস্ত্রত্যাগ করিয়া বিশ্রামলাভ করিতে পার। যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, যখন সন্ধি হইয়া শান্তি আসিবে—নিশ্চয় আসিবে—তখন সংযত শান্ত পদক্ষেপে সে শান্তিময় মিলন মন্দিরে তোমরা দলে দলে প্রবেশ করিবে। এই স্বপ্ন সাশ্রুনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছি।

"আমি চাই ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ তাহার আপন সভ্যতার, আপন ধর্মের আপন আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য নবযুগের উপযোগী-ভাবে রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত একজাতীয়তার মধ্যে মিলিত

হইবে। প্রত্যেক প্রদেশই ভারতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত ভারতের একতাকে রক্ষা করিবে।

"ভারতের এই প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ও মিলন সাম্রাজ্যের এই মহা-মিলনের অঙ্গীভূত। প্রত্যেক স্বতন্ত্র জাতির স্বাধীনতার সার্থকতা সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে সাহায্য করিবার উপর নির্ভর করিতেছে। জাতিতে জাতিতে মিলন পৃথিবীপৃষ্ঠে ব্যাকুল মানবাত্মার শান্তি আনয়ন করিবে।"

জীবনের শেষ অভিভাষণ! বিশ্বের দরবারে রেখে গেলেন মানুষের মহামিলনের অমৃতবাণী—যে-বাণী যুগে যুগে সর্বদেশে সর্বকালে ধ্বনিত হয়েছে মহাপুরুষের কণ্ঠে! সমগ্র মানবজাতির মহামিলনের স্বপ্ন ছিল তাঁর মনে,—কিন্তু স্বার্থপর মানুষ তাঁর এই অমূল্য অভি-ভাষণের যোগ্য মূল্য দিল না। অভিমানে স্তব্ধ হয়ে গেল দেশবন্ধুর অন্তর—দেশবাসী তাঁর কথা বুঝতে পারল না।

কিন্তু বুঝেছিলেন গান্ধীজী। এই সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দেশবন্ধু দাশের প্রত্যেকটি কথার সহিত আমি একমত।'

এ সম্পর্কে দেশবন্ধু বলতেন, "আমার ফরিদপুর অভিভাষণ নিয়ে সবাই খুব হৈ চৈ করছে। বলছেন, 'দেশবন্ধু মডারেট হয়ে গেছেন। সেই ডায়নামিজম তাঁর আর নেই। Provincial autonomy গ্রহণ করে মিঃ দাশ গভর্ণর হতে চাইছেন।' আমি যা বলেছি তা কেউ বোঝেনি। আমি সহযোগ করতে চাইনে। যদি গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছে কাজে দেখায়, তবে আমি সাময়িক truce করতে রাজী আছি। অভিভাষণেও আমি এই কথা বলেছি। Politics-এ surprise দিতে হয়। আমি সব কাজেই surprise করেছি। অগাস্ট মাস পর্যন্ত চুপ করে থাকবো, তারপর ওদের দেখাব যে, আমি মডারেট না আর কিছু।"

তিনি বিষণ্ণচিত্তে আরও বলতেন, "মহাত্মার কোন শত্রু নেই, কারণ

হিংসা নেই। আমার নিশ্চয়ই হিংসা রয়েছে, তাই আমার এত শত্রু।" অন্তরাত্মা দুঃখে বেদনায় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে চাইল। পাশে এসে দাঁড়ালেন বন্ধু শরৎচন্দ্র। বললেন, "দুঃখ করবেন না দেশবন্ধু। এ দুঃখ সঞ্চিত থাকুক সমস্ত দেশের জন্য, সমস্ত জাতির জন্য। আপনি অভ্রান্ত, আপনি অগ্নিশুদ্ধ, আপনিই নেতা। দেশ আপনারই। কিছু দিন দার্জিলিং থেকে ঘুরে আসুন। স্বাস্থ্যটা পুনরুদ্ধার হোক, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মানবদরদী ও তাঁর প্রতি হৃদয়ে একান্ত শ্রদ্ধাশীল বন্ধু শরৎচন্দ্রের সান্ত্বনার বাণীকে সম্বল করে ১১ই মে তিনি যাত্রা করলেন দার্জিলিং-এর পথে। আশা—শরীর ভাল হবে, আবার নূতন উদ্যমে কাজ করতে পারবেন তিনি। কিন্তু কে জানত এই তাঁর শেষ যাত্রা!

তাঁর ছোট ভাই ভোলা যেদিন দার্জিলিং-এ মারা যায়, সেদিন শোকাকুল মাতা বলেছিলেন, "আমি বলে গেলাম, আমার বংশের কেউ যেন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে দার্জিলিং না যায়।" হায়! সেদিন মায়ের এই বাণীটি তাঁর আত্মীয় পরিজনরা সবাই ভুলে গিয়েছিলেন।

এখানে আর একটা কথা না বলে পারছি না। দেশবন্ধুর জনৈক প্রখ্যাত জীবনীকার বলেছেন যে, এই অসুখের জন্য ডাক্তাররা দেশবন্ধুকে বিলেত যেতে বলেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তিনি যেতে পারেননি। কিন্তু দেশবন্ধুর পরিবারের একান্ত আপনজনের কাছে অবগত হয়েছি যে, ঘটনাটা কোনক্রমেই সত্য নয়—এ ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এবং আমিই তাঁকে জিজ্ঞেস করি।

দেশবন্ধুর নিজের টাকা ছিল না ঠিকই, এবং স্বরাজ ফাণ্ডের টাকা তিনি নিজের জন্য ব্যয় করতেন না। কিন্তু প্রফুল্লরঞ্জন দাশ যিনি সেই সময়ে মাসে হাজার হাজার টাকা উপায় করতেন এবং যে-দাদা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলেছিলেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য ২০।৩০ হাজার টাকা অকাতরে এবং সানন্দচিত্তে তিনি ব্যয় করতে পারতেন।

তাছাড়া সেদিন দেশের জনগণের ওপর দেশবন্ধুর যে অপরিসীম প্রভাব ছিল, সেখানে জনসাধারণও তাঁকে অনায়াসে এই টাকাটা তুলে দিতে পারতেন।

কিন্তু বিদেশ যাবার কোন রকম প্রস্তাবই হয়নি, এবং দেশের সেই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে দেশকে ছেড়ে যাবার ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। তাই আমার মনে হয়, দেশবন্ধুকে দরিদ্র করতে গিয়ে জীবনীকার তাঁর আত্মীয়পরিজনকেই ছোট করে ফেলেছেন।

সর্বোপরি ছিল তাঁর প্রাণতুল্য দুই কন্যা এবং তাঁদের উপযুক্ত জামাতারা। অবশ্য এখানে অনেকে বলতে পারেন, মেয়ের টাকা কেনই-বা তিনি নেবেন? কিন্তু জীবন-মরণ সমস্যার উপকূলে দাঁড়িয়ে প্রাণপ্রতিম ভাইএর শ্রদ্ধার্ঘ্য কি তিনি গ্রহণ করতেন না?

১১ই মে শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম—অগণিত জনতা ও সহকর্মীর ভিড়। জনতা ধ্বনি তুলল—'দেশবন্ধুর জয়'। জনতার মধ্যে থেকেই উঠল তার প্রতিধ্বনি, কিন্তু সহকর্মীরা রইলেন নীরব। দুঃখে অভিমানে তাঁর অন্তরাত্মা ফেটে পড়তে চাইলো, চোখের জল বাধা মানলো না।

এক সময়ে গার্ডের হুইশল্ বাজল—বিরাট যন্ত্রদানবটা হুস্ হুস্ শব্দ করে ভারতের মুক্তিকামী মহাত্মাকে, ভারতবাসীর পরম বন্ধুকে চিরকালের জন্য নিয়ে গেল অস্তাচলের পানে। সেদিন কি তিনি একবারও ভেবেছিলেন, তাঁর জন্ম, কৈশোর ও সমগ্র জীবনের অন্যতম লীলাভূমি এই কলকাতাকে ছেড়ে যাচ্ছেন চিরতরে।

যাবার পথে হিমায়েৎপুরে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমে তিনি ৩।৪ দিন বিশ্রাম করেন এবং তাঁর মা মনোরমা দেবীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় পদ্মা নদীর অপূর্ব শোভা ও এখানকার সুন্দর পরিবেশ তাঁর মনে এক অপূর্ব প্রশান্তি এনে দিয়েছিল। সাগর সংগীতের কবি যেন নূতন করে পদ্মার অপূর্ব গতিছন্দের মধ্যে খুঁজে পেলেন জীবনের ধারাকে। রাজনৈতিক আবর্তের বিবাদ-বিসম্বাদ

থেকে মুক্তি লাভ করে আবার যেন মন তাঁর হারিয়ে যাওয়া দোসরকে খুঁজে পেলো। আজ জীবনের পরিপূর্ণতায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমের উপলব্ধিতে তাঁর মন পরিবর্তিত হয়েছে সাধক চিত্তরঞ্জনে।

দীপ নিভে গেল

১৫ই মে তিনি যাত্রা করলেন দার্জিলিং-এর পথে। এসে পৌঁছলেন Step Aside. স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের গৃহে। শোনা যায়, এই গৃহেই নাকি ভাওয়ালের মেজকুমার দেহরক্ষা করেছিলেন।

স্টেপ এসাইডে এসে দেখলেন, দরজায় তালা লাগানো—ঝন্ ঝন্ করে কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ হলো! দেশবন্ধু চমকে ফিরে তাকালেন। বললেন, 'কাঁচ ভাঙ্গার কি দরকার ছিল। একটু অপেক্ষা করতাম।'

প্রবেশলগ্নেই এই অশুভ ইঙ্গিত ভাল লাগে নি। সেদিন কে জানতো, এই প্রবেশ আর প্রস্থানের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে জন্ম-মৃত্যুর সীমানা।

এখানকার জলবায়ুতে তাঁর শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলো—তিনি রোজ সকাল বিকেল বেড়াতে যেতেন। সংগে রিক্সা থাকতো, কিন্তু তিনি পায়ে হেঁটেই যেতেন। শরীরটা ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষিধেও বাড়ছিল। ভাবছিলেন, এখানেই কিছুদিন থেকে শরীরটা সারিয়ে নেবেন—কারণ সামনে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র পড়ে—বিশেষ করে পল্লী সংগঠনের কাজ আরম্ভ হচ্ছিল না বলে তিনি একটুও শান্তি পাচ্ছিলেন না।

ওদিকে বার্কেনহেড কি করলেন, সেটাও একটা চিন্তার বিষয়। ২৬শে এপ্রিল লর্ড বার্কেনহেড এই আপোষ নিষ্পত্তির বিষয়ে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সংগে আলোচনার জন্য লণ্ডন গেছেন। বার্কেনহেড যদি কিছু না করেন, তবে আবার কংগ্রেসকে প্রোগ্রাম বদলাতে হবে।

এইসব রাজনৈতিক চিন্তায় মন ব্যাকুল—আবার তার মধ্যে জুটেছে এক উপদ্রব—সে এক ছোট্ট চাবি। তালাচাবি ব্যাপারের

সংগে কোনদিনই তাঁর কারবার ছিল না—কিন্তু সংগে একটা এ্যাটাচি, তাতে দেশের সমস্ত দরকারী কাগজপত্র—সুতরাং বিরাট দায়িত্ব। জামা বদলান আর হাত দিয়ে অনুভব করেন চাবির অস্তিত্ব।

মাঝে মাঝে কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করেন আর উদাস হয়ে যান—আবার গভীরভাবে কি চিন্তা করেন। আবার তারই মাঝে মধ্যে মধ্যে মনের বালুচরে নেমে আসে প্রশান্তির ম্লান ধূসরতা। কে জানে তিনি হয়তো মনে মনে অনুভব করেছিলেন জীবনের আয়ুর পথে ফুরিয়ে আসছে পদ্মপাতার দিনগুলো—এবার তাদের পাপড়ি খসাবার পালা।

এই সময় তিনি জনৈক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "এবার যদি বাঁচি তো বাঁচার মত করে বাঁচব, আর যদি মরি তো মরার মত করেই মরবো।" এই অধীনতা, এই দাসত্ব শৃঙ্খলের গ্লানি বোধহয় তাঁর মনকে বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে তুলেছিল।

মে মাসের শেষে এলেন মিসেস এ্যানি বেসান্ত—তাঁর কমনওয়েল্থ বিল সম্পর্কে দেশবন্ধুর সংগে আলোচনা করার জন্যে। দেশবন্ধু বললেন, "আপনাদের কমনওয়েল্থ বিল সম্পর্কে আমি ভেবে দেখবো, তবে এরূপ আইন বিধিবদ্ধ না হলে আপনারা কি আমাদের সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সে যোগ দেবেন?"

এ্যানি বেসান্ত—না, তা দেবো না।

দেশবন্ধু—আপোষ না হলে আমরা তা করবো, কারণ এইটি হচ্ছে আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।

দেশবন্ধুর বিশেষ আমন্ত্রণে ৪ঠা জুন মহাত্মা গান্ধী এলেন দার্জিলিংএ—হিমালয়ের নিভৃতিতে ঘটলো দুই মহামানবের মহা-সম্মেলন। গান্ধীজী দেশবন্ধুর আতিথ্য অনেকবার স্বীকার করেছেন, কিন্তু তখন তিনি নিজে তাঁকে যত্ন করবার সময় পাননি—এ কাজ স্ত্রী এবং মেয়েরাই করেছেন।

মনে পড়ে গেল এ প্রসঙ্গে, অপর্ণা দেবী গান্ধীজীর খাওয়ার যে

তালিকা দিচ্ছিলেন। প্রতিদিন বাদাম বাটা, ফল আর ছাগলের দুধ। সেই ছাগল আনতে ওঁদের কত না কষ্ট করতে হতো। তা আবার বাসন্তী দেবী রূপোর বাটিতে করে জ্বাল দিতেন, ফলে রোজ একটা করে রূপোর বাটি নষ্ট হয়ে যেতো।

গান্ধীজী বলতেন, "আমি তো খাই মাত্র চার পয়সার।"

অপর্ণা দেবী বলতেন, "চার পয়সা না হাতী।" অবশ্য এই রাজসিক সংযম তিনি যে সব সময় পালন করতেন, তা নয়।

গান্ধীজীর দুধের জন্য শিলিগুড়ি থেকে দেশবন্ধু পাঁচটি ছাগল আনালেন। একদিন দেশবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "ছাগল ঠিক মত দুধ দিচ্ছে তো?"

এর উত্তরে দার্জিলিংএ তাঁর তত্ত্বাবধায়ক অনুপবাবু বললেন, "দুইটা দিয়াছে এবং তিনটা শুইয়া পড়িয়াছে।"

এই কথা শুনে গান্ধীজী হেসে বললেন, "I am very glad they have got self-respect in them." (ছাগলের আত্ম-সম্মানবোধ দেখে আমি ভারী খুশী।)

দেশবন্ধু বললেন, "ছাগলেরা non-cooperation করেছে। তাদের মধ্যে যে দুটি বিনীত, তাদের খেতাব দেওয়া হবে, আর বাকী যারা অবাধ্য, তাদের কয়েদ করা আবশ্যক।" রসিকতায় দুজনেই হেসে উঠলেন।

দেশবন্ধু গান্ধীজীকে বললেন, "আপনার কিন্তু ২।৩ দিন থাকলে চলবে না, ৫।৬ দিন থাকতে হবে।" গান্ধীজী কাজের অজুহাত দিলেন, কিন্তু দেশবন্ধু তাঁর সেসব কথায় আমলই দিলেন না।

হিমালয়ের কোলে ভারত-আত্মার এই দুই মুক্তিকামী মহামানবের শেষ মিলনস্মৃতি কালের পাতায় অক্ষয় সঞ্চয় হয়ে রইল। হাস্য পরিহাস, নানারূপ রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে কেটে যায় দিন।

একদিন কথা উঠলো চরকা প্রসঙ্গে। দেশবন্ধু বললেন, আমার চরকা সম্পর্কে বিশ্বাস ক্রমশই বাড়ছে। এ বৎসর প্রোগ্রাম কিছু

বদলানো হবে না। আমরা এই Spinning franchise খুব ভাল করে চেষ্টা করিনি। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, আপনার এই চরকার কাজে সমস্ত শক্তি ও সাধনা প্রয়োগ করি। অসুস্থ হয়ে পড়লাম, আর হয়ে উঠল না।

মহাত্মা—আপনি কাটতে শিখেছেন?

দেশবন্ধু—হ্যাঁ, কিছু কিছু পারি।

মহাত্মা—তবে প্রচার করছি আপনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ করেছেন।

দেশবন্ধু—তা...

বাসন্তী দেবী— না, এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

এবার আলোচনার প্রসঙ্গ ফিরল।

দেশবন্ধু—এবার গ্রাম্য জীবন গঠনই আমার প্রধান ভাবনার বিষয় হয়েছে। চরকা ও পল্লীসংস্কার ছাড়া ভাল কাজ এখন আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

এরপর দেশবন্ধু ক্ষণকাল নীরব থেকে আলোচনার মোড় ঘোরালেন, বললেন—আমার খুব বিশ্বাস, লর্ড বার্কেনহেড কিছু করবেন। উনি একজন জবরদস্ত লোক—I like strong man.

মহাত্মা—আমার সে আশা বড় কম। আজকাল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি নেই, সর্বত্র দলাদলি। বাংলায় দেখুন, কত বিবাদ বিসম্বাদ। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই অবস্থায় কিছুই পাবো না। সংহতি না থাকলে, খুব একতাবদ্ধ না হলে কিছু হবে না। ইংরেজ কোন দুর্বল শক্তির নিকট মস্তক অবনত করে না।

দেশবন্ধু একটু অধীর হয়ে বললেন, আপনি নৈয়ায়িকের মতো কথা বলছেন। কিন্তু আমার মন বলছে, হবে। Something within tells me that we are for something big.

দেশবন্ধুর এই আশাবাদী মনই জীবনে একটার পর একটা প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে আপন বিশ্বাসের তরীটির দাঁড় টেনে রেখেছে এবং তিনি

জয়ীও হয়েছেন। তাই এ ব্যাপারেও ছিল তাঁর অচল বিশ্বাস।

দেশবন্ধু জীবিত থাকলে ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত কি করতো বলা যায় না, কিন্তু ব্যুরোক্রেসীর পরম শত্রু দেশবন্ধুর মৃত্যুতে ইংরেজ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সকলের সংগেই পারা যায়, কিন্তু এ মানুষটাকে ভোলানো যায় না—ইনি যে শাঁস ও খোসার পার্থক্য বোঝেন।

চতুর ইংরেজ—(যার সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, জানোয়ারের মধ্যে শৃগাল, পক্ষীর মধ্যে কাক, আর মানুষের মধ্যে ইংরেজ) ভারতবাসীকে ভোলাতে এসেছিল, কিন্তু দেশবন্ধু ধরে ফেললেন তার সেই চতুরতা—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন ফাঁকা মন্ত্রীত্বের কোন দাম নেই। এখন আর তাদের দোষত্রুটি ভুল এমন চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দেবে না।

যাই হোক, যা বলছিলাম। এই আপোষের ব্যাপারে মতিলাল নেহরুও দেশবন্ধুর মত আশাবাদী ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, "Here is only one difference between him and me—he expected much from lord Barkenhead, which I did not."

আর একদিন দেশবন্ধু ও মহাত্মা আলোচনা করছিলেন—আবার চরকার কথা উঠে পড়ল। দেশবন্ধু বললেন, আমার ইচ্ছা হয় দেশে আবার চরকার বার্তা বহন করি। সমস্ত গ্রামগুলি পঞ্চায়েতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করি। গ্রাম যাতে আবার বাসোপযোগী হয়, সমস্ত শক্তিতে সেই কাজ করি।

মহাত্মা—আমরা উভয়ে একসঙ্গে কাজ করবো। এতেই ভারতের মুক্তি।

দেশবন্ধু—হ্যাঁ, এতেই মুক্তি। যদি লর্ড বার্কেনহেড কিছু না করেন, কাউন্সিলে আর বিশেষ কিছু হবে না। কেবল সীটগুলো হাতে রাখা মাত্র—এই কাজই সার হবে। We must prosecute your programme of Charka and organise our villages.

We must become an industrious nation once more. We shall bring power in the Councils.

মহাত্মা—আজ আমার প্রাণে বড় আশা হচ্ছে, খুব বিশ্বাস হচ্ছে।

দেশবন্ধু—আপনার অহিংসার ধারণা আমাতে আপনার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নেই। অহিংসা ছাড়া ভারতের মঙ্গল নেই। আর এ ছাড়া Civil disobedience-ও হতে পারে না। আর, সে-অবস্থার সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক।

মহাত্মা—অহিংসাই একমাত্র পথ।

দেশবন্ধু—সকল জাতির মধ্যে সমভাব রাখতে এই অহিংসা ছাড়া উপায়ই নেই। এ জাতি অহিংসা ছাড়া কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না।

মহাত্মা—আপনার ধারণা খুবই উচ্চশ্রেণীর। আজ আপনার পরিষ্কার ধারণা দেখে আমার বহুদিনের একটা ভ্রম দূর হলো।

এখানে পাঠক লক্ষ্য করবেন—দেশের উন্নতি যে কোন্ পথে এবং কি উপায়ে, সে সম্পর্কে দেশবন্ধু রাজনৈতিক জীবনের সূচনার দিন থেকে (অর্থাৎ যেদিন প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চে এলেন ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে)—আর এই হিমালয়ের কোলে দীপ নিভে যাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একই ধারণা দিয়ে গেছেন দেশবাসীকে—পল্লী উন্নয়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। এ কথা বহুবার তিনি আমাদের বলেছেন।

ভারতবর্ষকে বাঁচাতে হলে তার প্রাণকেন্দ্র পল্লীগ্রামকে বাঁচানো দরকার, একথা দেশবন্ধুর মতো করে ভারতবর্ষের আর কোন রাজনৈতিক নেতা অনুভব করেননি, তা আমি জোরের সংগেই বলতে পারি। বিশেষ করে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পল্লীবাসীদের এবং কৃষকের দুর্দশা দেখে দেশবন্ধুর কথাই বারে বারে মনে পড়ে। তিনি যদি আরও কিছুদিন বাঁচতেন, তবে এর একটা স্থায়ী রূপদান করে যেতে পারতেন। কিন্তু—হায়, অকস্মাৎ ঝড়ের বাতাসে

দীপ নিভে গেল!

সেই অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে রূপদানের জন্তে কেউ এগিয়ে এলেন না। আর কেউ না থাক, গান্ধীজী তো ছিলেন। তাই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের আবার পটপরিবর্তন ঘটলো—জাতির মুক্তি হলো বিলম্বিত। চোখের জলের সংগে মনে পড়ে ভারত-আত্মার মুক্তি-সংগ্রামের তুই সাধক—দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র—যাঁরা ভারতমাতার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য সর্বস্ব সমর্পণ করে গেলেন—তাঁরাই দেখে গেলেন না ভারতের পূর্বগগনে আবার স্বাধীনতা সূর্যের উদয়। আরও মনে পড়ে তাঁরা যদি থাকতেন তবে আমরা পেতাম অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। মুসলমান তো আমারই ভাই, তার জন্য কেন থাকবে আলাদা রাষ্ট্র? বিশ্ববাসী ভারতের ইতিহাসে এই ভ্রাতৃবিরোধের কথা শুনে নিশ্চয়ই পরিহাস করে।

এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক্। গান্ধীজী ও দেশবন্ধু মহা-মিলনের ও মুক্তির বাণীতে একমত হয়ে হিমালয়ের কোলে লিখে গেলেন মহামিলনের ইতিহাস! ৯ই জুন বিদায় নিলেন গান্ধীজী। এই তাঁদের শেষ দেখা।

ফুরিয়ে এলো বেলা—এবার দীপ নেভার পালা! প্রতি সোম-বারই দেশবন্ধুর জ্বর আসতো—সুতরাং রবিবার এলেই তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়তেন। ১৪ই জুন রাত্রে খাওয়ার পর খাবার টেবিলে বসে নানা গল্প আলোচনা করছেন। উঠে পড়লো সাহিত্যের কথা। তিনি বললেন, প্রকৃত কলাবিদ্ কে? True to the kindred point of Heaven and Home হতে হবে।

তারপর তাঁর কবিতার কথা থেকে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি পড়তে পড়তে তিনি ভাবের আবেগে বিহ্বল হয়ে গেলেন। কে জানতো তাঁর হৃদয়ের কবিদের কাব্যের রসগ্রহণের পালা জীবনের মত শেষ! চণ্ডী-দাস ও মহাপ্রভুর ভাবে অনুপ্রাণিত ভারত-আত্মার মুক্ত পথিক দেশবন্ধুর কর্মময় জীবনের আয়ুর প্রদীপ-শক্তি নিঃশেষিত!

রাত ১২টার পর তিনি ওপরে উঠে গেলেন। সেই দিনই রাত্রি-বেলা ১০৩ ডিগ্রী জ্বর এলো। দুদিন চললো যমে-মানুষে টানাটানি। সেই অবস্থার মধ্যেই স্ত্রীকে বললেন, "দেখ তো, বারান্দায় কে বসে? ভোলা আমায় নিতে এসেছে।" সবাই বুঝলেন, আর আশা নেই। ১৬ই জুন বিকেলবেলা দেশবন্ধুর মুক্ত আত্মা হিমালয়ের কোলে চিরশান্তিতে বিশ্রাম লাভ করল—কালবৈশাখীর ঝড়ে নিভে গেল দীপ।

সমগ্র ভারতব্যাপী ক্রন্দনের রোল উঠলো। শিশু, আবালবৃদ্ধ-বনিতা, শত্রুমিত্র সবাই সমস্বরে কাঁদলেন। এ কি বিশ্বাস করা যায় যে, দেশবন্ধু নেই! গান্ধীজী তার করলেন মতিলাল নেহরুকে, লিখলেন—I am sorry to say the fact is quite true.

এ সংবাদে শিশুর মত চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন দেশবন্ধুর পরম বন্ধু বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র। বললেন, "বেশ করেছেন! কাঁদতে কাঁদতে যেদিন তিনি বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন তো আমরা কেউ বলিনি, ওগো, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো তুমি—তুমি বিশ্বাস করো, তোমাকেই আমরা চাই।"

পাগলের মতো নিজের মনে বলে উঠলেন, "বেশ করেছেন, শোধ নিয়েছেন তিনি।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো সারা ভারতবাসী—আর বাংলাদেশ-বাসী বুকফাটা ক্রন্দনধ্বনিতে মুখরিত করে তুললো বাংলার আকাশ-বাতাস! আর করবে নাই-বা কেন? বাংলার জীবন্ত প্রাণের তিনিই তো ছিলেন মূর্তিমান বিগ্রহ—তাই সে-বিগ্রহের মধ্যে বাঙালী জাতি নিঃশেষে করেছিল আত্মবিলোপ—কোন রাজনীতি বা আন্দোলনের বিচারে নয়—তিনি ছিলেন বাঙালীর প্রাণ, বাংলার প্রাণ, তাই অকস্মাৎ এই আঘাতে সেদিন বাঙালী জাতি অসাড় হয়ে পড়েছিল। আর কে এমন করে তাদের কথা বলবেন—কে এমন করে তাদের ভালবাসবেন? তাই দেশবন্ধুর তিরোধানে তারা কেবল কোন রাজনৈতিক নেতার

বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়ে ওঠেনি; একান্ত প্রিয়-বিচ্ছেদের বেদনায় বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

আর দার্জিলিংবাসী—তারা এই মর্মান্তিক খবর পেয়ে দলে দলে এসে সমবেত হলেন Step Aside-এ। ক্রমে রাত গভীর হলো, একে একে সবাই বিদায় নিলেন। এলেন এক সন্ন্যাসী। বাসন্তী দেবী জিজ্ঞেস করলেন, "কে বাবা আপনি?" সাধুজী বললেন, "আজ রাত্রে আমি এখানেই থাকবো, মা।"

প্রকৃতিও তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারিয়ে শোকাকুল, অন্ধকার নিশীথিনী, কুজঝটিকাময় রাত্রি। মহামানবের পবিত্র দেহকে ঘিরে রইলেন সন্ন্যাসী, সারারাত ধরে করলেন পূজাপাঠ। সবাই অবাক হয়ে ভাবলেন, কে এই সন্ন্যাসী? ইনি কি ভগবানেরই প্রেরিত—এসেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানের মরদেহকে রক্ষা করবার জন্য?

জাতির জীবনের সেই অভিশপ্ত তারিখ ১৬ই জুনের রাত্রি প্রভাত হলো। সমস্ত ব্যবস্থা করে শবদেহ পাঠানো হলো কলকাতা। দার্জিলিং-এর পথেঘাটে অগণিত জনতা—সবাইএর চোখে জল—মুসলমানরাও এলেন দলে দলে। তিনদিনের জন্য তারা গোস্ত খাওয়া ছেড়ে দিলেন।

শবদেহ পৌঁছল কলকাতা। মহাত্মা গান্ধী নিজে শবাধার বহন করে নিয়ে চললেন কেওড়াতলা। আর, সেই বিপুল, শোকাকুল জনতার বর্ণনা দেওয়ার মতো ভাষা নেই—শুধু এইটুকুই বলতে পারি, পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে কোন রাজা, সম্রাট বা মহাপুরুষের মৃত্যুতে এমন শোকযাত্রা কোনদিন বিশ্ববাসী এর আগে দেখেনি। এ প্রসঙ্গে Mr. Carvin নামে জনৈক ইংরেজের বর্ণনা উধৃত করলে পাঠক সেই দৃশ্যের বিপুলতা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন:—

"Unless you have had even a momentary glimpse of Asia, no imagination will enable you to conceive it. Amongst us, only a few in a milliou can

realise that the funeral of a popular leader in Calcutta last Thursday was the greatest scene wittnessed anywhere in the British empire for many a day. Covered with flowers, the body of Mr Das was borne in procession through vast crowds to the burning ghat. Mahatma Gandhi, clad only in his loin cloth, was carrying his body on shoulder high to the place of fire and ashes. No hero-worship in the West compares with the vehement though often fugitive idolatry devoted in India to any conspicuous man who can magnetize the religious and racial sentiment of the people. We must look on a mourning like this with sympathy and respect apart from any reasoned differences of ideas about the future of Indian Government."

শেষের শেষ বিদায়ের গান রচিত হলো কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে—দেশবন্ধুর নশ্বর দেহ মিলিয়ে গেল পঞ্চভূতে! শোকাকুল জনতা চোখের জল মুছতে মুছতে ক্লান্ত সন্ধ্যায় ফিরে গেল ঘরে—ভাবছে, আজ কেমন করে থাকবে অন্ধকার ঘরে, কারণ বিধাতার নির্মম খেলায় তাদের প্রদীপ যে গেছে নিভে!

কিন্তু মহামানব তো চির অমর। মানুষ চলে যায়, থাকে তার আদর্শ। সেই অবিনশ্বর আদর্শের মধ্যেই শোকাকুল মানুষ ও জাতি খুঁজে পায় তাদের মুক্তির পথ—সমগ্র জীবনব্যাপী কঠিন সংগ্রামে যে-পথ দেশবন্ধু আমাদের জন্য তৈরী করে দিয়েছিলেন, তাকে যদি ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস বাঁচিয়ে রাখতো, তাহলে ভারতের ইতিহাসের ধারা যেতো বদলে।

অতীতকে তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না, তাই আমাদের জাতীয়

জীবনে সুদূর অতীতের সেই ভুলের জন্য অনুতাপ করা ছাড়া পথ নেই। বর্তমানে স্বাধীন নাগরিক আমরা, কিন্তু যে রাজনৈতিক হানাহানি এবং দলাদলির পথকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে চলেছি, তাকে আমরা ভুলে গিয়ে আবার একতাবদ্ধ হয়ে দেশের উন্নতির জন্য দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করতে পারি, যদি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শান্বিত পথে অগ্রসর হই।

দেশবন্ধু সম্পর্কে তাঁর প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র Indian Struggle বইতে যা লিখেছেন, তার থেকে উপলব্ধি করা যাবে যে, গুরুর মহত্ত্ব তিনি সমগ্র হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন :—

"The death of Deshabadhu on June 16th, 1925 was for India a national calamity of the first magnitude. Though his active political career consisted of barely five years, his rise had been phenomenal. With the reckless abandon of a Vaishnava devotee, he had plunged into the political movement with heart and soul, and he had given not only himself but his all in the fight for Swaraj. When he died, whatever wordly possessions he still had, were left to the nation.

"By the Government, he was both feared and admired. They feared his strength, but admired his character. They knew that he was a man of his word. They also knew that though he was a hard fighter, he was nonetheless a clean fighter; and further, he was also the man with whom they could bargain for a settlement. He was clear headed, his political instinct was sound and unerring,

and unlike Mahatma, he was fully conscious of the role he was to play in Indian politics. He was conscious of his exact role namely that of a practical politician, and he was, therefore, never afraid of courting un-popularity.

"In the affairs of nations, it often happens that the appearance or disappearance of a single personality often means a new chapter in history."

(বঙ্গানুবাদ): "১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যু ছিল ভারতের পক্ষে বিরাট জাতীয় বিপর্যয়। যদিও তাঁহার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন মাত্র পাঁচ বছরের ছিল, তাহার সাফল্য ছিল একটি অসাধারণ ঘটনা। বৈষ্ণব ভক্তের অকুণ্ঠ ত্যাগ লইয়া তিনি সর্বান্তঃকরণে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং স্বরাজের লড়াইতে তিনি কেবল নিজেকেই উৎসর্গ করেন নাই, তাঁহার সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে পার্থিব সম্পত্তি যাহা কিছু তাঁহার অবশিষ্ট ছিল, তিনি জাতিকে দান করিয়া যান।

"গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যেমন ভয় করিতেন, তেমন শ্রদ্ধাও করিতেন। তাঁহারা তাঁহার শক্তিকে ভয় করিতেন, কিন্তু শ্রদ্ধা করিতেন তাঁহার চরিত্রকে। তাঁহার কথার মূল্য কতখানি, ইহা তাঁহাদের অজানা ছিল না। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, যদিও তিনি একজন কঠোর সংগ্রামী ছিলেন, তাঁহার সংগ্রামের মধ্যে কোন লুকোচুরি ছিল না; উপরন্তু তিনি একজন এমন লোক ছিলেন, যাঁহার সহিত মীমাংসার জন্য তাঁহারা দর কষাকষি করিতে পারিতেন। তিনি ছিলেন অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, গভীর ও অভ্রান্ত ছিল তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধি, এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহাকে যে ভূমিকা গ্রহণ করতে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ সচেতনতা ছিল।

"অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি ভাল জানিতেন যে, শত্রুর

নিকট হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার মতো অনুকূল সুযোগ বারবার আসে না ; এবং যখন তাহা আসে, তখন বেশিদিন স্থায়ী হয় না। যখন সঙ্কট স্থায়ী হয়, তখন দর কষাকষি করিতে হয়। তিনি ইহাও জানিতেন, জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পৌঁছে, তখন মীমাংসায় উদ্যোগী হইলে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয় এবং ফলে, কিছু অখ্যাতিও হইতে পারে। কিন্তু নির্ভীকতা ছিল তাঁহার সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁহার যথার্থ ভূমিকা অর্থাৎ বাস্তব-জ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিবিদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং সেই জন্যই অখ্যাতি বরণ করিয়া লইতে ভয় পান নাই।

"ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ১৯২৫ সালের জুন মাসটি একটি সন্ধিকাল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে দেশবন্ধুর বিশাল ব্যক্তিত্বের অন্তর্ধান ভারতের পক্ষে এক প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য। যে স্বরাজ্য দল তাঁহার নিকট খুব বেশি ঋণী ছিল, উহা তাঁহার মৃত্যুর পর অচল হইয়া গেল এবং দলের মধ্যে ক্রমশঃই বিরোধ দেখা দিল।

"আজ ১৯২৫ সালের দিকে ফিরিয়া তাকাইলে ইহা আমরা অনুভব না করিয়া পারি না যে, দেশবন্ধু যদি আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস সম্ভবতঃ অন্যরূপ হইত।"

ভারতের তথা বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সত্যিই তো দেশবন্ধু এনে দিয়ে গেলেন নতুন সুর, নতুন প্রাণ—তাদের মধ্যে রেখে গেলেন প্রথম জাগার উন্মাদনা--প্রতিষ্ঠা করে গেলেন স্বরাজের ভিত্তি। পৃথিবীর মহামানবের ইতিহাসে তাই তাঁর আসন চির শাশ্বত।

এই মহামানবের প্রয়াণে গান্ধীজীর একখানি চিঠি দিয়ে এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানছি।

চিরং জীবতু দেশবন্ধু "প্রতিধ্বনি"

২৫শে জুন ইয়ং ইণ্ডিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গান্ধীজী লিখিত।

"পুরুষোত্তম চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। বঙ্গদেশ আজ বিধবার মতো। তাঁর জায়গায় দাঁড়াবার মতো লোক আর আমাদের দেশে নেই। যদি আমি বলতে পারতুম কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আসনে কে বসতে পারবেন, তাহলে আমি বলতে পারতুম যে, নেতা হিসাবে দেশবন্ধুর স্থানে কে দাঁড়াতে পারবেন। বাঙলায় দেশবন্ধুর আসনের কাছেও যেতে পারে, এমন মানুষ কেউ নেই। তিনি শত যুদ্ধের বিজয়ী বীর ছিলেন। দোষত্রুটি মার্জনা করতে সততই উদারহৃদয় ছিলেন। আইন ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করলেও নিজেকে কখনও ধনী ভাবতেন না। এমন কি শেষে প্রাসাদতুল্য বাসভবন—তাও দান করেছিলেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

পান্থপাদপ চিত্তরঞ্জন

মরুভূমির দেশে একরকম গাছ আছে, যা শ্রান্ত পথিককে ছায়া দেয়—তারই নাম পান্থপাদপ। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মেন, যাঁরা জীবন দিয়ে সর্বস্ব দিয়ে মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করেন—জীবনের উষর মরুভূমিতে পথশ্রান্ত মানুষ যে মহামানবের হৃদয়ের ছায়ায় এসে বিশ্রামলাভ করে, খুঁজে পায় শান্তি, কল্পতরু বৃক্ষের মত জীবনের ঈপ্সিত কামনার পূরণে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে যায়— আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেই পান্থপাদপ ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

বহুবিচিত্র স্বল্পায়ু জীবনে যশঃ অর্থ ও সৌভাগ্যের স্বর্ণরথ তাঁকে বসিয়েছিল সম্রাটের আসনের—সেই আসন থেকে দু'হাত ভরে বিলিয়েছেন অর্থ, করেননি পাত্রমিত্রের বিচার।

পৌরাণিক যুগে আমরা রাজা হরিশচন্দ্রের দানের কথা শুনেছি। সে-কাহিনী সহস্র সহস্র বৎসর ধরে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মাটিতে যে বাউল কবি, প্রেমিক ও রাজনীতিক জন্মেছিলেন, তাঁর সাগরতুল্য দানের কথা কি ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্থান পাবে না?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—তাঁর এই বাণী সত্য হয়ে উঠেছিল চিত্তরঞ্জনের জীবনে। তিনি বলতেন, 'ঈশ্বর আমার হাতে এত টাকা দেন দশজনের জন্যেই। টাকা কি আমার?' তাই যেমন দু'হাত ভরে রোজগার করেছেন, তেমনি আবার তা অকাতরে দীন, দুঃখী, নানা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে বিলিয়েছেন।

প্রভাতবেলায় সূর্য দেখেই বোঝা যায় দিন কেমন কাটবে, তেমনি চিত্তরঞ্জনের এই বিশেষ গুণটি বিকশিত হয়েছিল তাঁর অতি শৈশব

বেলা থেকেই। নিজে না খেয়ে বন্ধুদের খাওয়াতেন, নিজের অতিপ্রিয় খেলার জিনিস সঙ্গীসাথীদের বিলিয়ে দিতেন।

ব্যারিস্টারী পাশ করে তিনি দেশে ফিরলেন মনে অনেক স্বপ্ন ও আশা। কিন্তু রূঢ় বাস্তবের নির্মম আঘাতে সে-স্বপ্ন প্রায় ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হলো। হাইকোর্টে তখন রথী-মহারথী ব্যারিষ্টারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর গৃহের অবস্থা তার চেয়েও শোচনীয়—পিতা দেউলিয়া, ভাইবোন মিলে বিরাট সংসার এবং তা পরিচালনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রীফলেস তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের ওপর। নিরুপায় হয়ে তিনিও ১৯০৬ সালে দেউলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হলেন। জীবনের চারিদিকে যেন অন্ধকার আর হতাশা করাল ছায়া ফেলল। কবি চিত্তরঞ্জন ভাগ্যবিধাতাকে প্রশ্ন করলেন :—

"সম্মুখে পশ্চাতে মোর জীবন ব্যাপিয়া
ঘনায়ে আসিছে ধীরে অন্ধ অন্ধকার।
ওহে চিরোজ্জ্বল রবি! কেন অন্ধকার
জীবন ভরিয়া মোর ?"

কবিপ্রাণের এই বাণী পৌঁছল ভাগ্যবিধাতার হৃদয় দুয়ারে। জীবনের অন্ধকার দেউল আলোকিত হয়ে উঠলো—আলিপুর বোমার মামলাকে কেন্দ্র করে ব্যারিস্টার সি, আর, দাশ-এর নাম ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হয়ে উঠলো। সুবর্ণ-স্রোতের বন্যায় টলমল করে উঠলো তাঁর জীবন—কিন্তু জীবনকে তিনি ভাসিয়ে দিলেন না—সুবর্ণস্রোতের ওপর ভাসিয়ে রাখলেন আপন হৃদপদ্মকে।

দেউলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হলে সে-ঋণ পরিশোধ না করলেও চলে, কিন্তু চিত্তরঞ্জন দেউলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হলেও এ-ঋণ শোধ করবার বাসনা ছিল তাঁর মর্মমূলে। তাই পিতার সংগে নিজেও দেউলিয়া আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, "পিতার সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র পায়, তেমনি তাঁর

ঋণের দায়ও পুত্রেরই।"

১৯১৩ সালের মে মাসে তিনি সমস্ত ঋণশোধ করে দেউলিয়া নাম হতে অব্যাহতি পেলেন। তাঁর জনৈক বন্ধু বলেছেন, "সেই দিনকার চিত্তরঞ্জনের হাস্যোজ্জ্বল এবং পরিতৃপ্ত মুখখানি কোনদিন ভুলতে পারবো না।" পরিতৃপ্ত হলেন পিতামাতা, মুগ্ধ হলো আত্মীয়স্বজনেরা, বিস্মিত হলো দেশবাসী। জাস্টিস ফ্লেচার বললেন, "I do not think we see it very frequently."

মে মাসের ১৫তারিখে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকা যা লিখলো, তার মর্মার্থ এই :—"মিঃ সি. আর. দাশ ৬৮ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করিয়া গৌরবজনক কার্য করিয়াছেন। ঋণের এক পয়সাও তাঁহার না দিলেও চলিত। সাত বৎসর পূর্বে 'দেউলিয়া' হইয়া এই ঋণ হইতে তিনি অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ইহা মনে করিতে হইবে যে, এ-ঋণ তাঁহার নহে, তাঁহার বৃদ্ধ পিতার ঋণের দায়িত্ব তিনি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই দায়গ্রহণ তাঁহার পিতৃভক্তির পরিচয়। দেউলিয়া হইয়া কেহ বড় আর এ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন না। মিঃ সিংহ সত্যই বলিয়াছেন যে, এরূপ কার্য প্রায় দেখা যায় না। জজও বিশেষভাবে ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। এই উচ্চাঙ্গের সাধুতার জন্য আমরা মিঃ সি. আর. দাশকে অভিনন্দন করিতেছি। তিনি যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, এরূপ ক্ষেত্রে তাহা অপরের অনুকরণের যোগ্য।"

চিত্তরঞ্জনের এই মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর Official Assignee গ্রে সাহেব ফি-স্বরূপ চিত্তরঞ্জনের নিকট একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি।

চিত্তরঞ্জন তখন নবীন ব্যারিস্টার। একদিন বিকেলে তিনবন্ধু পদব্রজে বেড়াতে বেরিয়েছেন। এক সাধুজী বললেন, "দাঁড়া বেটা।" তারপর সাধু চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বললেন, "তুই এক বছরের মধ্যে রাজা হবি।"

চিত্তরঞ্জন সাধুর একথা শুনে হেসে বললেন, "আচ্ছা সাধুজী, সত্যি

যদি রাজা হই, তবে আপনার কথা আমার মনে থাকবে এবং সেইদিন আমি আপনাকে যথোচিত বকশিস করবো।"

কালের চাকা আপনগতিতে ঘুরে চললো। ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হলো ব্যারিস্টার C. R. Das-এর নাম। সেই সংগে স্বুবর্ণ-স্রোতের বন্যায় ভেসে গেল জীবনের দুকূল।

এক সাধুজী দরজায় এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "চিনতে পারো?" চিত্তরঞ্জন একটু ইতস্তত করলেন। সাধুজী তখন তাঁকে একবছর আগেকার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলেন। চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির আয়নায় এবার ভেসে উঠলো পুরনো দিনের এক সন্ধ্যার ছবি।

তিনি সাধুজীকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন এবং পরদিন তাঁকে আসতে বললেন।

সেদিন একটা মোকদ্দমা থেকে পেলেন মোটা টাকা। সবটাই তিনি তুলে দিলেন সাধুজীর হাতে—সাধুজী চেকে টাকার অঙ্কটি দেখে বিশ্বাস করতে চাইলেন না। চিত্তরঞ্জন বললেন, "আপনার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। আপনি আমার এ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।" সাধুজী আশীর্বাদ করে বিদায় গ্রহণ করলেন।

প্রকৃতির বুকে সন্ধ্যা নেমেছে—দিক্‌পাল ব্যারিস্টার C. R. Das সারাদিন কর্মক্লান্তির পর গাড়ীতে করে হাইকোর্ট থেকে বাড়ী ফিরছেন। দেখলেন, একটি বাড়ীর সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে, বাড়ীর সব জিনিসপত্র রাস্তায় স্তূপ করা, এবং বাড়ীর ভেতর থেকে ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ।

তিনি ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলে ঢুকে গেলেন বাড়ীর ভেতর—নেমে এলেন গৃহস্বামী। চিত্তরঞ্জন বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখলেন, ইনি তাঁর মাষ্টারমশাই। পদধূলি গ্রহণ করে বললেন, "মাষ্টারমশাই, চিনতে পারেন?"

মাষ্টার মশাই উত্তর দিলেন, "বাবা, তুমি তো বিরাট বড় হয়েছ, তবু আমায় চিনতে পেরেছ দেখে আজ আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই।"

চিত্তরঞ্জন এবার আসল ঘটনা জানতে চাইলেন। মাষ্টারমশাই বললেন, "পাঁচ হাজার টাকা বাড়ী ভাড়া বাকী।"

চিত্তরঞ্জন ইতস্তত না করে পাঁচ হাজার টাকা মাষ্টারমশায়ের হাতে তুলে দিলেন। গুরু অবাক বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর এই ছাত্রটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

চিত্তরঞ্জন বিদায় নিলেন। যাবার আগে পুলিশের লোকদের ডেকে বললেন, "আমার হুকুম, এখনি তোমরা সব জিনিসপত্র বাড়ীর ভেতর তুলে দাও।" পুলিশের লোকেরা অবিলম্বে তাঁর আদেশ পালন করলো।

কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর লোকেরা এসে একবার চিত্তরঞ্জনের কাছে তাদের দুরবস্থার কথা জানালো। চিত্তরঞ্জনের দরদী হৃদয় তাদের জন্য বিচলিত হয়ে উঠলো। তিনি তাদের জন্য নিয়মিত মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

সন্ধ্যের পর কাজকর্মের শেষে তারা গানবাজনা করছে, এটা দেখে জনৈক ব্যক্তি চিত্তরঞ্জনের কাছে গিয়ে বললেন, "মিথ্যেই ওরা আপ-নাকে ওদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে মাসোহারা নিচ্ছে। দেখলাম তো গানবাজনা করে বেশ মনের ফুর্তিতেই আছে ওরা।"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "গরীব বলে ওরা কি একটু আমোদ-আহ্লাদও করতে পারবে না?" এরপর অভিযোগকারী নীরবে বিদায় নিলেন।

গভীর রাত্রি। বাড়ীতে চোর ধরা পড়েছে। সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, 'মার্! মার্!'—এগিয়ে এলেন চিত্তরঞ্জন। চোরকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি চুরি করলেন কেন?"

চোর—আমার যে সংসারে বড় অভাব। পরিবার প্রতিপালন করতে পারি না।

চিত্তরঞ্জন—ছিঃ! তাই বলে আপনি চুরি করলেন! আমার কাছে চাইলেই তো দিতাম।

এরপর তিনি চোরকে কুড়িটি টাকা দিয়ে বললেন, "আর কখনো চুরি করবেন না। দরকার হলে আমার কাছে চাইবেন।"

তাঁর একথা শুনে সেস্থানে উপস্থিত সকল ব্যক্তির চোখ ভিজে উঠলো জলে।

একবার এক প্রার্থী ভদ্রমহিলাকে তিনশো টাকা দেবেন বললেন। ভদ্রমহিলা জানালেন যে, পরদিন তিনি লোক পাঠিয়ে দেবেন।

পরদিন সকালবেলা এলেন এক ভদ্রলোক। ভদ্রমহিলার নাম করে বললেন, তিনি আমায় টাকা নেবার জন্য পাঠিয়েছেন।

চিত্তরঞ্জন তাঁকে ৩০০৲ টাকার চেক লিখে দিলেন। লোকটি বিদায় নিল। একটু পরেই এলো ভদ্রমহিলার চিঠি নিয়ে তাঁর প্রেরিত লোক। সকলের বুঝতে বাকী রইল না যে পূর্বের লোকটি প্রবঞ্চক।

সকলে বললেন, এখনো গেলে লোকটিকে ধরা যায়।

চিত্তরঞ্জন—কাজ কি বেচারাকে কষ্ট দিয়ে? ওর ভাগ্যে আছে, পেয়েছে।

এমনি পাত্রমিত্র নির্বিচারে তিনি দান করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই তাঁকে বলতেন, "আপনাকে কিন্তু লোকে ঠকায়।"

তিনি বলতেন, "তা আমিও জানি। কিন্তু কতখানি অভাবে পড়ে যে মানুষ একাজ করে, তা কেউ ভেবে দেখে না।"

আপিসে যাবেন, গাড়ীতে এসে বসেছেন—দরজায় হাত পেতে দাঁড়াল ভিখারিণী। তার হাতে দিলেন দশ টাকার নোট। বললেন, "এ দিয়ে তোমার ছেলেকে খাবার কিনে দিও।"

বাইরে গেলে চুল কেটে নাপিতকে দিতেন দশ টাকা। কুলীদের চার আনার জায়গায় দিতেন দু'টাকা। এ নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করলে বলতেন, "আমরা কি ওদের শ্রমের যোগ্য মূল্য দিই? এই ওরাই যদি কোট প্যাণ্ট পরে আসতো, তবে আমরা সানন্দচিত্তে দু'টাকার

জায়গায় চার টাকা দিতাম।"

মায়াবতী গিয়ে সেখানে তিনি কুলীদের এমনভাবে বকশিস করেছিলেন যে, তারা তাঁকে বলতো 'বঙ্গালকা রাজা বাবু'।

মহেশপুর মামলা থেকে এলো—লক্ষটাকা তোড়ায় বাঁধা। দু' তিনজন লোক ব্যস্ত হয়ে উঠলো সেই টাকা গুনতে। তিনি সকলকে বললেন, "যার মুঠিতে যত ধরে তুলে নাও।" সবাই নিলেন, কিন্তু একজন কুণ্ঠিত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। চিত্তরঞ্জন এক আঁজলা টাকা তুলে তার অঞ্জলি ভরে দিলেন।

সকালবেলা বাইরের ঘরে মক্কেল পরিবৃত হয়ে কাজ করছেন—কালীঘাট থেকে এক ভদ্রলোক এসে বললেন যে, আজই তাঁর মেয়ের বিয়ে—১০০৲ টাকা যৌতুক বরকে দিতে হবে।

চিত্তরঞ্জন—নিশ্চয়ই দেবো। আপনি পরে আসবেন।

ভদ্রলোকও এলেন না, তিনিও সারাদিনের কাজকর্মে ঘটনাটা ভুলেই গিয়েছিলেন। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর বিছানায় শুয়েছেন—ঘড়িতে রাত ১২টা বাজে। মনে পড়ল, সকালবেলার কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মুখ। বিছানা ছেড়ে নীচে নেমে এলেন। ক্লার্ক ললিতবাবুর হাতে ১০০৲টি টাকা দিয়ে বললেন, "আপনি শিগগির যান। ঈস্, কী ভুল হলো আমার। এতক্ষণে বোধহয় ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।"

রাণাঘাট থেকে এলেন এক ভদ্রমহিলা। মেয়ের বিয়ের জন্য তাঁর হাজার টাকার প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ভদ্রমহিলার কোন আত্মীয় স্বজন না থাকাতে তিনি বড় নিরুপায়।

চিত্তরঞ্জন বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমার লোক গিয়ে আপনার মেয়ের বিয়ের সব ব্যবস্থা করে দেবে এবং আপনার মেয়ের বিয়েতে যা ব্যয় হবে, তার সম্পূর্ণ ভার রইল আমার ওপর।" ভদ্র-মহিলা চোখের জলে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। "ছিঃ, কি করেন।" বলে চিত্তরঞ্জন পা সরিয়ে নিলেন।

আর একদিন সকাল বেলা এমনি একটি প্রার্থী এলো তাঁর দ্বারে। মা দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন, ছোট্ট একটি ছেলে এসে দরজায় দাঁড়ালো।

চিত্তরঞ্জন মধুরকণ্ঠে ছেলেটিকে বললেন, "কি চাও, বল?" ছেলেটি বলতে দ্বিধা করতে লাগলো। এবার তিনি অভয় দিলেন, "ভয় কি? বলো।"

ছেলেটি কুণ্ঠার সংগে কোনরকমে বললো, "মা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমার বোনের বিয়ে।

প্রশ্ন করলেন, "কত টাকার জন্যে আটকেছে, বল?"

বালক ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, "একশো টাকা।"

তিনি একটা কাগজে কি লিখে কাগজের টুকরোটি বালকের হাতে দিয়ে বললেন, "এর সংগে যাও।"

ছেলেটি একটু পরেই ফিরে এলো, মুখে হাসি, হাতে একশো টাকার নোট। বলল, "মা বললে—"

চিত্তরঞ্জনের বুঝতে বাকী রইল না যে, এবার কৃতজ্ঞতা জানানোর পালা। বললেন, "হয়েছে, হয়েছে। তোমার বোনের বিয়ে হয়ে গেলে আমায় বলে যেও, বুঝলে?"

এই বিরাট দানের বিনিময়ে যেন সামান্য কৃতজ্ঞতাটুকুও তিনি গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হতেন।

একদিন তিনি আপিসে যাবেন, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে বললেন, চিত্তরঞ্জনের সংগে তাঁর খুব দরকার। তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত, সুতরাং অর্থের প্রয়োজন।

চিত্তরঞ্জনের মনে কৌতুক করবার ইচ্ছে হলো। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন, "আপনি আমার সংগে চলুন। আমার তাঁর সংগে দেখা হবে।"

ব্রাহ্মণ চিত্তরঞ্জনকে চিনতেন না। সুতরাং তিনি তাঁর সংগে আপিসে গেলেন। তারপর আপিসে পৌঁছে তিনি একটা চেক লিখে লোক মারফৎ ব্রাহ্মণকে পাঠিয়ে দিলেন।

ব্রাহ্মণ ভাবলেন, এতো বড় দাতা যে, তাঁর সংগে তো একবার দেখা হওয়া দরকার এবং তাঁর সেই ইচ্ছের কথা লোকটিকে জানালেন।

লোকটির এবার অবাক হবার পালা। তিনি বললেন, "আপনি তো চিত্তরঞ্জনের সংগেই গাড়ীতে করে এসেছেন!" একথা শুনে ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে অভিভূত হলেন।

কন্যাদায়গ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ কয়েকদিন ধরেই ঘুরে যাচ্ছেন। এতো কাজের মানুষের কি সব আর সময় নাগাল পাওয়া যায়? ব্রাহ্মণ ভাবলেন, আজ শেষ চেষ্টা করবো। তাঁর সাধনা সফল হলো। দেখা পেলেন চিত্তরঞ্জনের। চিত্তরঞ্জন তাঁকে সেইদিন বিকেলবেলা আসতে বললেন। সেদিন একটা কেস থেকে পেয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকা—সবটাই তুলে দিলেন ব্রাহ্মণের হাতে। ব্রাহ্মণের তো আকাশ থেকে পড়বার পালা! তিনি বললেন, "আপনি কয়েকদিন ধরেই কষ্ট করছেন। ভেবেছিলাম, আজ যা টাকা পাবো, সব আপনার।" ব্রাহ্মণের দু' চোখ আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো।

কেস করে ফিরছেন ষ্টীমারে। এক বাল্যবন্ধুর সংগে দেখা। বন্ধু জানালেন যে, তিনি কন্যাদায়গ্রস্ত, তাই টাকার অভাবে চারিদিক ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

চিত্তরঞ্জনের তখন আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। তবুও বন্ধুর এই অভাবের এবং প্রয়োজনের কথা শুনে তিনি তাঁকে দেড় হাজার টাকা দিলেন। ফলে, কলকাতা ফিরে এসেই আবার তাঁকে ঋণ করতে হলো।

১৯০১ সালের কথা। তখন তিনি অর্থহীনই বলতে গেলে। ব্যাঙ্কে জমা মাত্র ১০৫০৲ টাকা।

মিঃ পোলক এসে বললেন; দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের জন্যে টাকা চাই।

সেই টাকা থেকেই তিনি হাজার টাকা পোলকের হাতে তুলে

দিলেন।

ময়মনসিংহ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে গেছন। আনন্দমোহন কলেজের একটি ছেলে এসে সাহায্য চাইলো। তিনি ব্যস্ত এবং অন্যমনস্ক ছিলেন। একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আমি কি এখানে টাকা নিয়ে এসেছি?"

ছেলেটি ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গেল। কাজকর্ম শেষ হলে বেয়ারা বেণীকে ডেকে বললেন, "যেখান থেকে পারো ছেলেটিকে ধরে নিয়ে এসো, নইলে আমি জলস্পর্শও করবো না।"

অনেক খোঁজাখুঁজির পর ছেলেটিকে ধরে আনা হলো। তিনি ছেলেটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, এবং ছেলেটিকে খাইয়ে এবং তার প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে পরিতৃপ্ত চিত্তে বিদায় দিলেন।

তাছাড়া যেখানে জ্ঞানের উন্নতির প্রচেষ্টা দেখতেন, সেখানেই তিনি দান করতেন অকাতরে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করবার পর তাঁর প্রায় দেড় হাজার পুঁথি তিনি সাহিত্য পরিষদকে দান করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দচন্দ্র দাশ, যেদিন রোগশয্যায় পড়ে অর্থাভাবে চিকিৎসা করাতে পারেননি, সেদিন কবিভ্রাতা সম্বোধনে তাঁকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য মনিঅর্ডার করে পাঠিয়েছিলেন টাকা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, তিনি বাঁচলেন না। মৃত্যুর পূর্বে চিত্তরঞ্জনের মহান হৃদয় স্মরণ করে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তা পাঠ করলে চোখের জল রাখা যায় না।

উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে তিনি বৈদিক সাহিত্য অনুশীলনের জন্য মাসে একশো টাকা করে বৃত্তি দিতেন। সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতি যেদিন ঋণের দায়ে তাঁর "সাহিত্য" পত্রিকা তুলে দেবার উপক্রম করেছিলেন, সেদিন চিত্তরঞ্জন তাঁকে অর্থ দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে তিনি মাসে দুশো টাকা করে দিতেন।

দেশবন্ধু দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ব্যাপারে চিরকালই উৎসাহী ছিলেন। তিনি বলতেন, "এতেই স্বরাজের ভিত্তি, দেশের বেকার লোকের অন্নসমস্যার সমাধানও এইভাবে হবে। প্রত্যেক বিষয়ে আত্মনির্ভর হতে হবে। দেখছেন না, আমাদের দেশের লোকেরা আত্মনির্ভর হতে ভুলে গেছে।"

১৯১৯ সালে তিনি প্রথম Press Employees' Association-এর প্রথম সভাপতিরূপে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্কের ব্যাখ্যা করেন। ১৯২৩ সালে ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছিলেন তিনি। তিনি বলতেন, "দেশকে economic slavery থেকে মুক্তি দিতে গেলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজন।" সেইজন্য তাঁর দানশীল জীবনে যেমন তিনি গরীব-দুঃখীদের অকাতরে বিলিয়েছেন, তেমনি নানা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন। নেভিগেশন কোম্পানীকে তিনি প্রচুর টাকা দিয়েছিলেন। যশোহর ঝিনাদহ রেল কোম্পানীকে তিনি বহু টাকা ধার করে জোগাড় করে দিয়েছিলেন। গ্লাস ওয়ার্কস এবং ওয়াটারপ্রুফ ও ছাতার ব্যবসায়ে অনেক টাকা সাহায্য করেছিলেন। কোন এক দৈনিক পত্রিকার সত্ত্বাধিকারী একবার খুব বিপদে পড়লে তিনি তাঁকে ২০ হাজার টাকা ঋণ করে দেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনির্ভর না হলে জাতির উন্নতি অসম্ভব।

পূর্ববঙ্গে প্রচণ্ড বন্যা। তিনি রিলিফ কমিটিতে দান করলেন দশ হাজার টাকা। তাছাড়া নিজে পরিশ্রম করে আরও অনেক টাকা তুলে দিলেন।

শিক্ষার ব্যাপারে কত ছেলেকে যে তিনি সাহায্য করতেন, তার ইয়ত্তা নেই। দেশী কীর্তন গান ছিল তাঁর প্রিয় সংগীত। এই কীর্তন অনুশীলনের জন্য তিনি প্রতি মাসে দিতেন হাজার টাকা করে।

প্রকাশ করলেন 'নারায়ণ' পত্রিকা। এতে সব লেখককেই তিনি শ্রমের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতেন এবং পারিশ্রমিক না দিয়ে এমন কি নিজের কন্যারও লেখা গ্রহণ করতেন না। সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন

যেমন এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল তেমনি অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল—পরোক্ষভাবে গুণীজনদের সাহায্য করা।

নিজের মেজ বোন অমলা দেবী পুরুলিয়ায় একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দুঃখী ও আতুরদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। চিত্তরঞ্জন এই আশ্রমের জন্য প্রত্যেক মাস হাজার টাকা করে দিতেন। নদীয়ায় নিত্যানন্দ আশ্রমে তিনি দু'লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। ভবানীপুরের অনাথ আশ্রমে তো তাঁর দানের সীমা-পরিসীমা নেই।

ব্রাহ্ম বিদ্যালয় এবং বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ নির্মাণকল্পে প্রচুর টাকা দান করেছিলেন তিনি। এই সময় অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু এই ঋণের জামিন হতে তাঁকে বারণ করেছিলেন। তিনি উত্তরে বলেন, "টাকাটা পাবো না জানি। তবু দেবার ইচ্ছে হয়েছে বলেই দেবো।"

গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য তিনি অর্থদান করেছিলেন এবং বিক্রমপুর সম্মিলনীতেও প্রচুর টাকা দান করেছেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে এক ভদ্রমহিলা এলেন, টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না। সেদিন দেশবন্ধুর হাতে টাকা ছিল না। তিনি নিজের হাতের আংটি বিক্রী করে ভদ্রমহিলাকে ৬০০ টাকা দিয়ে দিলেন।

স্বরাজ্য পার্টির যুগে—নিজের হাতে হয়তো পরের দিনের বাজার খরচের টাকা নেই—কোন সহকর্মী এসে তার অভাবের কথা জানালো। তিনি নিজের হাতে যা ছিল সব দিয়ে দিলেন। কেউ এ নিয়ে অভিযোগ করলে বলতেন, "আমার কাল যেখান থেকে হোক জুটে যাবে, কিন্তু ও যে টাকার অভাবে খেতে পাচ্ছে না।"

তাঁর এই দানশীলতা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, "তাঁহার কোন আত্মীয়ের জন্য দেশবন্ধু এক সময়ে শতকরা ৯ টাকা সুদ হিসাবে দশ হাজার টাকা ধার করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ দিতে পারেন নাই বলিয়া উত্তমর্ণের এটর্ণী খত পরিবর্তন করিবার জন্য তাঁহার

সহিত দেখা করিতে আসেন। দেশবন্ধু তখন আলীপুর জেলে এবং আমরা তাঁহার নিকটেই। তাঁহার পুত্র চিররঞ্জনও সেখানে ছিলেন, তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, এই ঋণের কথা পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ জানিতেন না। যে আত্মীয়ের জন্য টাকা ধার লওয়া হইয়াছিল, খত পরিবর্তন করিবার সময় তিনি তখন লক্ষপতি। কিন্তু দেশবন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া নূতন খতে সই করিয়া দিলেন। স্ত্রীপুত্র কিংবা অন্য আত্মীয়কে না জানাইয়া এইরূপ বহু ঋণ করিয়া তিনি অপরের সাহায্য করিতেন।

"দেশবন্ধুর নিন্দা ও কুৎসা না করিয়া যাঁহারা জলগ্রহণ করেন না, এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি বিপদের সময় তাঁহার শরণাপন্ন হইতে। এই জাতীয় কোন ভদ্রলোক ২০০৲ টাকার দাবী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন, 'আমার তহবিলে মাত্র ৬০০৲ টাকা আছে, আমি কি করিয়া ২০০৲ টাকা দিই?' ভদ্রলোকটি জিদ ধরিলেন; তিনি বিলম্ব না করিয়া তাঁহার হাতে ২০০৲ টাকা তুলিয়া দিলেন।"

আসলে, মানুষের প্রতি তিনি বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করতেন না বলে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে প্রয়োজনের সময় তাঁর কাছে হাত পাততে কেউ কুণ্ঠিত হতো না।

কালিদাস রায় এ সম্পর্কে লিখেছেন, "প্রতিদিনই সান্ধ্যসভায় সংগীত সাহিত্যালোচনা হাস্য পরিহাসের মধ্যে চেকের খাতা আসিত— নিঃশব্দে সানন্দে তাহার পাতায় পাতায় অঙ্কপাত করিয়া এক-এক-খানি করিয়া ছিঁড়িয়া আগন্তুক প্রার্থীদের পকেটে গুঁজিয়া দিতেন। গোপনে দান করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

"তিনি যেখানেই মোকদ্দমার জন্য কৌসুলী হইয়া যাইতেন, সেখানেই তিনি নানা সদানুষ্ঠানে প্রাপ্য অর্থের অনেকটাই দান করিয়া আসিয়াছেন।"

"যে সকল সাহিত্যিক 'নারায়ণে'র সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা

প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট প্রভূত অর্থানুকূল্য লাভ করিয়াছেন।"

বেলুড় মঠের উৎসবের জন্য তিনি প্রচুর টাকা দিতেন। একবার বেলুড় মঠের উৎসবে তিনি যোগদান করেছিলেন। সেবারকার উৎসবে ঘিয়ের দাম ২৫০৲ টাকা এবং চাকরদের বকশিস ৫০৲ টাকা তিনি বাড়ী এসেই পাঠিয়ে দেন।

একবার এক ভদ্রমহিলা মেয়ের বিয়ের জন্য এসেছিলেন চিত্তরঞ্জনের জনৈক বন্ধুর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে। বন্ধু বললেন, "আমি আপনাকে ৫৲ টাকা দিতে পারি। কিন্তু তাতে তো আপনাকে প্রকৃত সাহায্য করা হবে না। আপনি C. R. Das-এর কাছে যান।"

ভদ্রমহিলা—তাঁর নাম শুনেছি, কিন্তু অত বড়লোকের বাড়ী যেতে ভরসা হয় না।

ভদ্রলোক এবার সংগে করে ভদ্রমহিলাকে চিত্তরঞ্জনের বাড়ী নিয়ে এলেন।

চিত্তরঞ্জন—আপনার কত টাকার দরকার?

ভদ্রমহিলা—৭০০৲ টাকার দরকার, কিন্তু ৩০০৲ টাকা পেয়েছি।

চিত্তরঞ্জন—আচ্ছা, ও ৩০০৲ টাকা আপনার থাক্। পরেও তো দরকার হবে।

এই বলে তিনি ৭০০৲ টাকাই ভদ্রমহিলাকে দিলেন।

বিপিনচন্দ্র পালকেও তিনি নিয়মিতরূপে মোটা অর্থ দান করতেন।

সারাদিন ধরে তিনি যে কত চেক কাটতেন, তার আর সীমা পরিসীমা নেই। সেই চেক যেতো ভারতবর্ষের সর্বত্র। যার প্রয়োজন, সে-ই চিত্তরঞ্জনের দান থেকে বঞ্চিত হননি। এ ব্যাপারে পোস্ট অফিসের সংগে এতো বেশি যোগাযোগ করতে হতো যে, পোস্ট অফিসের লোকেরা শেষ পর্যন্ত বলেন, "আমরা আর পেরে উঠছি না—এ বার আপনার বাড়ীতেই একটা ডাকঘর বসাতে হবে।"

'মোছ আঁখি' কবিতায় তিনি বলেছেন :—

"অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে,
হাসি-আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও,

জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার স্তর ভাঙ্গি বিশ্বে ঢেলে দাও।"

এই আদর্শেই গড়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অমৃতময় জীবন আর তাঁর জীবনই তাঁর বাণী।

দেশের সেবায় দিলেন দেহমনপ্রাণ—উপার্জিত অর্থ নিঃশেষে দান করলেন দেশবাসীকে—জীবন-সাগরে শ্রান্ত পথিক ভাবলেন, আর কি দেওয়া যায়? নাঃ, এখনও আছে। রসা রোডের অত বড় বাড়ীটা তো দেশমাতৃকার সেবায় দান করা যায়। পাটনায় যাবার আগে তিনি ঐ বাড়ীটিও দান করে গেলেন।

বাড়িটি অবশ্য মর্টগেজ ছিল। কিন্তু ঋণ শোধ করে তিনি বাড়িটিকে মুক্ত করে তা নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য রেখে যেতে পারতেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা সে-চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু জীবনের সঞ্চয় রইল শুধু জীবন—এ ছাড়া কিছুই তিনি রেখে যাবেন না, এই তাঁর পণ।

বাড়িটির মোট মূল্য ছিল—৩,২৯,০০০টাকা
ঋণের পরিমাণ ছিল—২,২০,০০০ ”

অতএব মোট দানের পরিমাণ ছিল—১,০৯,০০০টাকা (এক লক্ষ ন'হাজার টাকা)।

এই টাকা তিনি নিম্নলিখিত যে কোন একটি সৎকার্যে ব্যয় করবার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করে দিয়ে যান :—(১) ভারতবাসীর শিক্ষা, (২) একটি মন্দির নির্মাণ, (৩) তাহার ভিতরে একটি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, দৈনিক ও সাময়িক সেবার ব্যবস্থা, (৪) হিন্দু বালকগণের ধর্মশিক্ষা, (৫) মাতৃমন্দির স্থাপন, (৬) দরিদ্র ও দুঃস্থ ভারতবাসীর সাহায্য ও এইরূপ কোন বদান্যতার কার্য।

ট্রাস্টি ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়, নলিনী সরকার, তুলসী গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর গান্ধীজী দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ফাণ্ডের জন্য আট লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন এবং বাড়িটিকে ঋণমুক্ত করে প্রতিষ্ঠা

করলেন চিত্তরঞ্জন সেবাসদন—যা আজ ভারতের মধ্যে একটি অন্যতম বৃহৎ হাসপাতাল—ধরে আছে দেশবন্ধুর জীবনের দানের স্মৃতি।

ত্যাগার্থে সঞ্চয়—এই ছিল দেশবন্ধুর জীবনের ব্রত। তিনি বলতেন, "দেনেওয়ালা ভগবান। আমার সাধ্য কি, দান করি!" ফুল যেমন ফুটে উঠলে তা আপন সুরভি বিস্তার করবেই, তেমনি দেশ-বন্ধুর এই নীরব দানের কথা তাঁর সান্নিধ্যে যিনিই এসেছেন, তিনিই জেনেছেন। এত বড় সাগরতুল্য হৃদয় কোন কালের কোন দেশের ইতিহাসে দেখা গিয়েছে কিনা জানি না।

যেদিন তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করলেন, সেদিন নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য দুঃখ হয়নি—দুঃখ হয়েছিল এই প্রার্থীদের কথা ভেবে। সারাদিন শুধু এক চিন্তা—এদের কি হবে? শেষ পর্যন্ত এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিলেন, "আমি না থাকলে যিনি ওদের দেখতেন, তিনিই ওদের ভার গ্রহণ করুন।"

আইন-ব্যবসা ত্যাগ করার পর ঐশ্বর্যের সমারোহময় জীবন থেকে নেমে এলেন সাধারণ জীবনে। তার ওপরে খাটুনি প্রচুর। শরীর খুব ভেঙে পড়ল। সবাই বললেন, একটু দুধ খান, নইলে চলবে কি করে? তিনি বলতেন, "না, যাদের দুধের খরচ জোগাতাম, তাদেরই যখন দিতে পারি না, তখন নিজে খাবো কেমন করে?"

এমন পরদুঃখকাতর হৃদয়ের কি তুলনা মেলে! দেশবন্ধুর তুলনা-বিহীন অমৃতময় জীবনের বাণী আজকের ক্লেদ, সঙ্কীর্ণতা ও দলাদলির ভারতবর্ষের বদ্ধ আত্মাকে, মৃতপ্রায় আত্মাকে মুক্তি দিক্, এই প্রার্থনাই রেখে যাবো।

এই মহান্ হৃদয়ের মহাপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দানের কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন :—

(১লা জুলাই ১৯২৫)—"আপন দানের দ্বারাই মানুষ আপন আত্মাকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে। চিত্তরঞ্জন তাঁহার যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান দেশকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা কোন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক কর্তব্য পালনের আদর্শমাত্র নহে, তাহা সেই সৃষ্টিশক্তিশালী মহাতপস্যা, যাহা তাঁহার ত্যাগসাধনের মধ্যেও অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে।"

পারিবারিক চিত্তরঞ্জন

পরিবার ও সমাজেই মানুষের হৃদয়ের সত্য পরিচয় নিহিত থাকে। গাছ যেমন মাটি থেকে করে আহার্য সংগ্রহ, তারপর একদিন ফুলে ফুলে ভরে ওঠে, যে-ফুলের সুরভি বসন্ত বাতাসে মানব-হৃদয়কে ব্যাকুল করে তোলে, তেমনি পরিবার গড়ে তোলে মানুষকে—স্নেহ, প্রীতি, প্রেমে তার জীবনে আনে পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি। সেই জীবনের সুরভি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে।

চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম পূর্ববঙ্গের এক অতি খ্যাতনামা পরিবারে, সে কথা পূর্বেই বলেছি। এই পরিবার থেকে তিনি পেয়েছিলেন অনেক গুণ, তাও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে তাঁর হৃদয়ের সুরভির যে পরিচয় পাওয়া যায়, এখানে তারই আভাস দেওয়া হলো।

চিত্তরঞ্জন ছেলেবেলা থেকেই বাবা-মাকে খুব ভক্তি করতেন এবং ভালবাসতেন। তাঁর পিতৃভক্তির পরিচয় তো পেয়েছি পিতৃঋণ পরিশোধের ব্যাপারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। শুধু কি তাই, বাবার বিরাট সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। ভাইবোনদের মানুষ করেছেন। দুই ভাই প্রফুল্লরঞ্জন এবং বসন্তরঞ্জনকে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করিয়ে এনেছেন। বোনেদের উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে দিয়েছেন। একদিকে কঠোর জীবন সংগ্রাম, অপরদিকে অম্লানবদনে করে গেছেন কর্তব্য পালন। কোনদিন এতটুকু বিরক্ত হননি। যদিও পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র তিনি, তবুও পিতা যেখানে বর্তমান, সেখানে ইচ্ছে করলে এতো দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে না তুলে নিতেও পারতেন।

চিত্তরঞ্জনের বড় বোন ২৮।২৯ বৎসর বয়সে বিধবা হয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী এলেন। বাপের বাড়ীর আর্থিক দুরবস্থাও তখন

শোচনীয়। ভুবন মোহন দেউলিয়া এবং ভাই চিত্তরঞ্জনেরও সে-পথ অনুসরণ করবারই উপক্রম হয়েছে। কি আর করবেন তিনি! নিজের যা কিছু গয়না এবং টাকা পয়সা সঞ্চিত ছিল, সব চিত্তরঞ্জনের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "চিত্ত, তোদের ভিখারিণী দিদির আর কোন সম্বল নেই। এই নিয়েযদি তোদের দেনার বিন্দুমাত্র লাঘব হয়, আমি বড় শান্তি পাবো।"

দিদির একথা শুনে তাঁর চোখে জল এসেছিল। পরবর্তীকালে ছেলেমেয়েদের কাছে একথা বলে তিনি বলতেন, "দিদির একথা কি জীবনে ভুলতে পারবো! তাঁর যথাসর্বস্ব তিনি আমাদের সংসারে দিতে চেয়েছিলেন। তখন তো তিনি জানতেন না, আমি কত উপার্জন করবো। কোন কিছুর প্রতিদানের স্বপ্ন তিনি কোনদিন দেখেননি।"

চিত্তরঞ্জনও তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন। তিনি বড় বোনের পুত্র সুধাংশু মোহন গুপ্তকে বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করিয়ে আনেন। তাঁর মেয়েদের তিনি নিজের মেয়েদের মতই ভালবাসতেন। এক-এক সময়ে, কুন্ঠিত হয়ে দিদি বলতেন, "চিত্ত, তোর কাছ থেকে কতই নিলাম।"

চিত্তরঞ্জন বলতেন, "দিদি, ও কথা বোল না। টাকাই কি সব? তোমার যে স্নেহাদর পেয়েছি, তা কি কিছুই নয়? সারা জীবনের অর্জিত ধন তোমার পায়ে ঢেলে দিলেও সেই স্নেহের সমতুল্য হবে না।"

তিনি যখন পাটনায় স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য গমন করেন, তখন দিদির ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখে তিনি চোখের জল সংবরণ করতে পারেননি। বলতেন, "দিদির যা শরীর হয়েছে! সংসারযাত্রায় দুটি ভাইবোন হাত ধরাধরি করে এসেছি—কে আগে যায়, কে পরে যায়।"

কিন্তু ভাগ্যবিধাতা ভাইকেই নিলেন আগে। দার্জিলিং থেকে দেশবন্ধুর শবদেহ এলো কলকাতা। তাঁর বাড়ীর সামনে রাখা হলো কয়েকমিনিটের জন্য দেশবন্ধুর শবদেহ। প্রাণপ্রতিম ভাইএর মৃতদেহের

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে—তারপর আদেশ দিলেন শবযাত্রা এগিয়ে যাবার।

তাঁর মেজ বোন অমলা দেবী বিয়ে করেননি। তাঁর জন্য চিত্তরঞ্জন প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন পুরুলিয়ার অনাথ আশ্রম। ইনি মৃত্যুর পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিতা হন এবং অপূর্ব কীর্তন গাইতেন। ১৯২০ সালে এই বোনটি মারা যান।

চিত্তরঞ্জনের তৃতীয়া ভগ্নী প্রমীলা দেবী আইনজীবী শরৎচন্দ্র সেনের স্ত্রী ছিলেন। শরৎচন্দ্র সেন চিত্তরঞ্জনের ব্যারিস্টারী জীবনের সূচনায় তাঁকে প্রভূতভাবে সাহায্য করেছেন। এই বোনটিও মাত্র ৩২ বছর বয়সে মারা যান।

চতুর্থ বোন উর্মিলা দেবী। তাঁর সংগে বিয়ে দেন অনন্ত নারায়ণ সেনের। উর্মিলা দেবী ছিলেন খুব সাহসী এবং দাদা-বৌদির সংগে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে জেলে যান।

পঞ্চম ভগ্নী মুরলা দেবী বিরাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর পরম আদরের, কারণ ভাইবোনদের মধ্যে তিনিই তো সবচেয়ে ছোট।

আর মেজ ভাই জাষ্টিস প্রফুল্লরঞ্জন দাশ তো P. R. Das নামে ভারতবিখ্যাত। এঁকে তিনি স্ত্রীর গয়না বাঁধা বিলেত পাঠিয়েছিলেন। ইনি বিলেত থেকে ইংরেজ মহিলা বিয়ে করে আনেন। কিন্তু দাশ পরিবারের সংস্কারমুক্ত এবং উদার আবহাওয়ায় এই ইংরেজ রমণী একদিনের জন্যও অসুবিধে ভোগ করেননি। অবশ্য ইনিও নিজেকে বাঙালী পরিবারের সংগে মানিয়ে নিয়েছিলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আচার-ব্যবহার সমস্তই আস্তে আস্তে আয়ত্ত করেছিলেন। এঁর এক ছেলে শঙ্কর অকালে মোটর অ্যাকাসিডেণ্টে মারা যায়। দুই মেয়ে গৌরী ও উমা—এরা ছিল জ্যাঠামশায় চিত্তরঞ্জনের নয়নের মণি। চিত্তরঞ্জন আইনজীবী জীবনে যখন পাটনা গিয়েছিলেন, তখন উমা ও গৌরী ছোট্ট মেয়ে। একঘর মক্কেল নিয়ে জ্যাঠামশায় কাজ করছেন, তার

মাঝেই আবির্ভাব ঘটলো দুই ভাইঝির—কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি আদরিণী ভাইঝিদের আবদার পালন করতেন হাসিমুখে।

ছোট ভাই বসন্তরঞ্জন বিয়ে করেন ব্রজনাথ শীলের মেয়েকে। প্রথমে এই নিয়ে পরিবারে একটু আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন মাকে বোঝালেন যে, ব্রজনাথ শীলের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি কজন আছেন।

এই ভাই আইনজীবী জীবনে তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন। ১৯১০ সালে টাইফয়েডে দার্জিলিংএ বসন্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু ঘটে। এই শোক চিত্তরঞ্জনকে বিহ্বল করেছিল। তিনি বলতেন, "আমার জামাকাপড়ের বিষয় আমি কিছুই জানতাম না। ভোলাই সব ঠিক করে দিত। 'এরকম করে টাই বাঁধতে পারবে না, ওরকম চাঁদনীর কোটের মত কোট পরা হবে না।' আজ আমাকে ছেড়ে সে কোথায় গেল? আমার ছেলেকে নিয়ে ভগবান তাকে রাখলেন না কেন?"

মা'কে তো তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসতেন বললেও কম বলা হয়। প্রত্যেক দিন কাজে যাবার সময় মাকে প্রণাম করে যেতেন। মায়ের কথামাতা তিনি যে কত গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করতেন তার ইয়ত্তা নেই। মাকে সুখী করার জন্য তিনি সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারতেন। পুরুলিয়ায় চিত্তরঞ্জন একটি বাগান-বাড়ী কেনেন। সেখানে চিত্তরঞ্জনের বাবা, মা থাকতেন এবং তাঁরাও যেতেন—পরিবারের সকলে মিলিত হয়ে সেই বাড়ীটি হয়ে উঠতো আনন্দ নিকেতন। সেই বাড়ীতে ফুলের বাগানের মালিক ছিলেন চিত্তরঞ্জনের পিতা আর তরকারীর বাগানটি ছিল তাঁর মায়ের সম্পত্তি। এই বাগান নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগতো। চিত্তরঞ্জনের মা তাঁর স্বামীকে শাসাতেন, "আসুক চিত্ত, এর একটা বিহিত করতেই হবে।" বলা বাহুল্য, চিত্তরঞ্জন সব সময়েই মায়ের পক্ষ নিতেন।

মায়ের হাতে রান্না ছিল তাঁর অতি প্রিয়। মা খুব ভাল আমসত্ত্ব করতে পারতেন। এজন্য গরমকাল এলেই মাকে হাজার টাকা দিয়ে

রাখতেন। বাবা-মাকে ভাল না বাসলে, শ্রদ্ধাভক্তি না করলে বড় হওয়া যায় না, তা আমরা প্রায় প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনেই দেখেছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনও তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯১৩ রাসপূর্ণিমার দিন পুরুলিয়ার বাড়ীতে চিত্তরঞ্জনের মা দেহ-ত্যাগ করেন। চিত্তরঞ্জন তখন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিলেতে। মা তাঁকে জোর করে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। বললেন, "আমাদের জন্যে এতো করে ওর স্বাস্থ্যটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঘুরে আসুক কিছুদিন।"

তার আগে শোধ হয়েছে পিতৃঋণ; মুক্ত হয়েছেন দেউলিয়া নামের অপবাদ থেকে। সেই স্মরণীয় দিনটিতে তাঁর পিতামাতার মনের আনন্দ ব্যক্ত করবার ভাষা নেই। পরের দিনের খবরের কাগজখানা মা যতবার শোনেন, সাধ মেটে না, বলেন, "আর একবার পড় তো কি লিখেছে চিত্তর নামে।"

শেষ বিদায়ের কালে জননীর প্রাণে ব্যাকুল আশা, চিত্তর সংগে দেখা হবে। বললেন, "ওই তো চিত্ত এসেছে, মনে হলো যেন আমায় মা বলে ডাকলো!" কিন্তু তা আর হলো না। মৃত্যুকালে বলে গেলেন, "জন্মজন্মান্তরে যেন চিত্তের মত ছেলে পাই।"

চিত্তরঞ্জন খবর পেয়ে ফিরে এলেন বিদেশ থেকে। আকস্মিক এই আঘাতে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। পুরুলিয়ার বাড়ীতেই মায়ের শেষ কাজ করলেন হিন্দুমতে। শ্রাদ্ধের দিন গরীব-দুঃখীদের সংগে একাসনে বসে খেলেন তিনি—চৈতন্যের আচণ্ডালে প্রেমধর্ম যে ধীরে ধীরে তাঁর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল, স্বামী বিবেকানন্দের সেবার মধ্যে দিয়েই ভগবৎ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তিনি, এ ঘটনা তারই নজির রেখে গেল।

এরপর ১৯১৪ সালে পিতা ভুবনমোহন রোগশয্যায় পড়লেন। বাবার চিকিৎসার যাতে কোন ত্রুটি না হয়, তার জন্য মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন তিনি। তিনি বলতেন, "বাবা যেন শেষ সময়ে দৈহিক সুখ বঞ্চিত না হন। এটুকু স্বাচ্ছন্দ্য যেন তাঁকে দিতে পারি।" ১৯১৪

সালে ২১জুন তিনি দেহত্যাগ করলেন।

রসা রোডের বাড়ীতে খুবই সমারোহের সংগে হিন্দুমতে পিতার শ্রাদ্ধ করলেন। শ্রাদ্ধের আগে ১৩ দিন কীর্তনের রবে বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠলো। বাংলাদেশের স্বনামধন্য কীর্তনীয়ারা সমবেত হলেন। পিতা ও মাতার প্রায় সমকালীন মৃত্যুতে চিত্তরঞ্জনের মনে গভীর শোকের ছায়া পড়ে এবং ফলে, সময় থেকেই বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তন, এই দুটির প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি বলতেন, "আমার জীবনে পরিবর্তন এনেছে গৌরাঙ্গ। সঙ্গদোষে জীবনে নানারকম দোষ আমার ঘটেছে, কিন্তু গৌরাঙ্গের আত্মহারা প্রেমের মূর্তি আমার সব সংস্কার সব দোষ দূর করে দিচ্ছে। মহাপ্রেমের মহাভাবের কি মহান্ আদর্শ।"

সেই মহান প্রেমধর্মের আদর্শেই সমগ্র বিশ্বের মানুষ একটি মহান জাতিতে পরিণত হবে, এই স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি, নিবিড়ভাবে ভালবেসেছিলেন মানুষকে। তাঁর এ ভালবাসার বাছবিচার ছিল না। ছিল না ন্যায়-অন্যায় বোধ। আর এই প্রেমই তাঁকে দিয়েছিল একটি শান্তিপূর্ণ পরিবার জীবন এবং অপরদিকে শক্তিমান নেতার জীবন—যাঁর আহ্বানে একদিন বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিল। 'এক সূত্রে বেঁধে দিব মানব জীবন, গড়িব এক ধর্ম-রাজ্য'—মহাভারতের কৃষ্ণের এই স্বপ্নকে সার্থক করতে চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। তাঁর সে-স্বপ্নের মন্ত্র ও পূজা ছিল প্রেম।

আর, তাঁর ব্যক্তিগত প্রেম-জীবনের পূর্ণতা এনেছিলেন বাসন্তী দেবী, সেকথা পূর্বেই বলেছি। তিনি বলতেন, "আমাদের সংসারের জন্যই ও জীবনটা তিল তিল করে নিঃশেষ করলো।" বড় মেয়েকে বিয়ের দিন বলেছিলেন, "মায়ের মতো হবি।" এই একটি কথা থেকেই বোঝা যায়, স্ত্রীর প্রতি তাঁর ছিল কি অপরিসীম শ্রদ্ধা।

বড় মেয়ে অপর্ণা দেবীর বিয়ে—কায়স্থের সংগে। তিনি ঠিক করলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনবেন না। কারণ, যে কোন জাতের

পণ্ডিত দিয়ে কাজ করলেই তো হয়। এ নিয়ে খুব সমস্যায় পড়লেন তিনি, কিন্তু বাসন্তী দেবীর কথায় দেখতে পেলেন আশার আলো। তিনি বললেন, "একেই তো অসবর্ণ বিয়ে দিয়ে জাত মানছো না, তার ওপর যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত না আনো তো সমাজে হৈ চৈ পড়ে যাবে। ভাঙতে হয় আস্তে আস্তে ভাঙো।"

স্ত্রীর একথা তিনি শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিয়ে শালগ্রাম শিলা সাক্ষী করে মহাসমারোহে মেয়ের বিয়ে দিলেন তিনি। বাংলাদেশের প্রায় কোন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিই সেই আসরে বাদ ছিলেন না। তবে অনেক গোঁড়া ব্রাহ্মরা আসেননি। কারণ চিত্তরঞ্জনের এ কাজকে তাঁরা সমর্থন জানাতে পারেননি।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের প্রতি চিত্তরঞ্জনের কোনদিনই খুব একটা শ্রদ্ধা ছিল না। এজন্য ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহন রায়কে তিনি ক্ষমার চক্ষে দেখেননি। তিনি বলেছেন, "রামমোহনের জন্যই আমাদের দেশটার এ অবস্থা ঘটেছে।" নিজে তাই ব্রাহ্মপিতার সন্তান হলেও পিতার পারলৌকিক কাজ করেছিলেন বৈদিক মতে।

যাক্, যে কথা বলছিলাম—১৯১০ সালে পুত্র চিররঞ্জনের বিয়ে দেন ব্যারিস্টার সুকুমার সেনের কন্যা সুজাতার সংগে। তিনি ভালবাসতেন গান, আর সুজাতার ছিল অপূর্ব দরদী গলা। তাঁর সুরের পিপাসা নিবৃত্ত হলো এমন পুত্রবধূকে পেয়ে। তাঁর বড় মেয়ে অপর্ণাও খুব ভাল কীর্তন গাইতে পারতেন। সারাদিন কর্মক্লান্ত হয়ে ফিরতেন সন্ধ্যাবেলা। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে মেয়েকে বলতেন পদাবলী গাইবার জন্য।

ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি ছিলেন পরম স্নেহশীল পিতা। জ্ঞানে বুদ্ধিতে তাদের জীবনকে উজ্জ্বল করে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সারাদিন জটিল আইনের নথিপত্রে ডুবে থাকতেন—রাত্রিবেলা নিজের ঘরে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসতেন নানা সাহিত্য আলোচনায়—পড়ে শোনাতেন ব্রাউনিং, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র। বাবার কাজ সেরে উঠতে

যতই রাত হোক না কেন, এই পরম প্রহরটির জন্য তারা আগ্রহভরে অপেক্ষা করতো। সে-সময় স্নেহময় পিতার অন্তরালে হারিয়ে যেতেন ভারতের দিক্‌পাল ব্যারিস্টার C. R. Das. তিনি আবৃত্তি করতেন :

"কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি করো।
নহে তুচ্ছ কীট এদের অন্তর।"—হেমচন্দ্র

আসলে, এর দ্বারা তিনি আপন সন্তানদের মনে জাগিয়ে তুলতেন স্বজাতি ও স্বদেশপ্রীতি। তাই রাজনীতি জীবনে ছেলেমেয়েরাও বাবার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

১৯১১ সালে ছোট মেয়ে বেবীর অসুখ হলো। তাঁর চিকিৎসার জন্য সপরিবারে বিলেত গেলেন। এই বিলেত যাত্রাকালেই সাগরের মধ্যে অসীমের আহ্বান উপলব্ধি করলেন কবি চিত্তরঞ্জন—জন্ম নিল 'সাগর সংগীত'। লণ্ডনে এসে ছেলেমেয়েদের নিয়ে লণ্ডনের সব দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো ঘুরে বেড়ালেন। তাদের দেখালেন সেক্সপীয়ারের সমস্ত নাটক।

এই সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন লণ্ডনে। একদিন রাত্রে ডিনারে এলেন রোদেনষ্টাইনকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ। আর্ট, কবিতা, ও সাহিত্য আলোচনার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' পড়ে শোনালেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে একে একে রাস্তায় লোক জমা হতে লাগল। কবিগুরুর অনুরোধে চিত্তরঞ্জন 'সাগর সংগীতে'র খাতা থেকে কিছু পড়ে শোনালেন। 'সাগর সংগীত' নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

পরিবারের জন্য নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েও তৃপ্তি ছিল না তাঁর মনে! তিনি বলতেন, "ঋণী আমি সবাকার কাছে।" কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁর ত্যাগ, ধর্ম, ক্ষমা, প্রেম ও দেশসেবা দিয়ে এই পরিবারকে শুধু নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে তিনি ঋণী করে রেখে গেছেন। আজকের দিনে তাঁর আদর্শে পরিচালিত হয়ে যদি আমরা গড়ে তুলি আমাদের জীবন, তাঁর স্বপ্নকে রূপায়ণের চেষ্টা করি আমাদের কর্মে, তবেই সে ঋণের কিছুটা অংশও পরিশোধ করতে পারবো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবি ও সাহিত্যশিল্পী চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রাজনীতিবিদ ছিলেন, এই পরিচয়টাই মানব-সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু তিনি যে একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, একথা আজকের দিনে অনেকেরই অজানা। তার কারণ, যে সাহিত্য ভাণ্ডার রেখে গেছেন উত্তর পুরুষের জন্য, তার যোগ্য মূল্য নিরূপিত হয়নি। কিন্তু যা তিনি রেখে গেছেন, তা দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে স্থান করে নিতে পারতেন।

শৈশব জীবন থেকেই তাঁর কাব্য প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল, তা আমরা দেখেছি। লণ্ডনে ছাত্রাবস্থাতেও তিনি কাব্য রচনা করেছেন, তার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি। সেই কবি-প্রতিভাই পরিপূর্ণরূপ লাভ করেছিল যৌবনকালে রচিত কাব্যগ্রন্থ সমূহের মধ্যে দিয়ে।

এখানে একটা জিনিস একটু লক্ষ্য করবার মতো—রাজনীতিক চিত্তরঞ্জনের সংগে কবি ও সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের প্রাণের সুগভীর যোগ। যে স্বপ্ন ছিল শৈশববেলায় কুঁড়িতে, যৌবনবেলায় তা কাব্যে রূপ নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলো ফুলে, আর সেই ফুলের সুরভি দেশপ্রেমের রূপ পরিগ্রহ করে বাংলার আকাশ বাতাসকে পাগল করে তুলল পরিণত জীবনে। যে-দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা তিনি পান বঙ্কিম সাহিত্য থেকে, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের কাব্য পড়ে, সেই দেশপ্রেমই রূপলাভ করেছিল তাঁর প্রবন্ধে। স্বদেশের প্রতি তাঁর ছিল সুগভীর প্রীতি। "বাঙ্গলার গীতিকবিতা" নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে ও নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শতসহস্র আবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

সুতরাং দেশবন্ধুর রাজনীতিক জীবন এবং কাব্য ও সাহিত্যিক জীবনের মধ্যে একটা সুগভীর যোগ আছে। রাজনীতিক দেশবন্ধুর জীবনের প্রস্তুতি কোথায়, তা জানতে হলে আমাদের কবি ও সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের জীবনের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে হবে। দেশবন্ধু বলতেন, "জীবনের সমগ্র অনুভূতিই সাহিত্য।" সত্যি কথাই। দেশবন্ধুর জীবনই তাঁর কাব্য ও সাহিত্য—কোন দেশে কোন কালে কোন রাজনীতিকই জীবন দিয়ে এমন কাব্য রচনা করে যাননি।

মালঞ্চ কাব্য

১৮৯৬ সালে লণ্ডন থেকে ফিরে এসেছেন তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন—চোখে যৌবনের প্রেম ও রোম্যান্টিকতার স্বপ্ন, আর বাস্তব জীবনে ব্যর্থ ব্যারিস্টারের হতাশা—এ দুয়ের সংঘাতে জীবন-মালঞ্চে গাঁথলেন কবিতার মালা—অপূর্ব কাব্য পুষ্প চয়ন করে সেই বছরে রচনা করলেন "মালঞ্চ কাব্য"।

মালিনীর মালঞ্চে যেমন নানা ফুল থাকে, চিত্তরঞ্জনের মালঞ্চও তেমনি নানা ফুলের সমাহারে রচিত। জীবনের নানা উপলব্ধির পূর্ণ পরিচয়ে রচিত এ কাব্যবীণার তার। এ সময়কার কবির মানসিকতার পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে মা ঞ্চ কাব্যে। এদিক দিয়ে বিচার করলে মালঞ্চ কাব্য কেবল রোম্যান্টিক প্রেম ভালবাসার সুখস্বপ্ন নয়—তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের জীবনদর্শন।

ব্রাহ্মসমাজপতিদের ধর্মের নামে সংকীর্ণতা তাঁর অন্তরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল, আর এই বিদ্রোহিতার রূপ পরিগ্রহ করেছে মালঞ্চ কাব্যের নানা কবিতায়। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও কপটতার মুখোস তিনি খুলে দিলেন 'সোহং' কবিতায়। কবি বললেন :—

আমার সকল জ্ঞান, ওহে ব্রহ্মজ্ঞানী,
তবে তুমি কার কর এত অহঙ্কার।
আপনারি উচ্চারিত মেঘমন্দ্রবাণী,
আপনার মনে আনে মোহ অন্ধকার।
ক্ষুদ্র তুমি ক্ষীণ প্রাণে কেমনে ধরিবে
অসীম অনন্ত শক্তি মহাদেবতার।
এ শূন্য বিশ্বের বক্ষে কাহারে বরিবে,
বৃথা বহ আপনার পুষ্প অর্ঘ্যভার।

ঠিক একই সুরে এই ভণ্ড ধার্মিকদের তিনি পরম অবহেলাভরে বিদ্রূপ করে উঠলেন 'ধার্মিক' কবিতায়। কবি বললেন :—

সুধাও ধর্মের কথা দিবস রজনী
সাক্ষী দিয়া ঈশ্বরের কথায় কথায়,
বক্তৃতা শুনিয়া শুধু স্তম্ভিত অবনী
আহা! আহা! বলি তব চরণে লুটায়।
ধরণীর সুখ দুঃখ অবহেলা করি
আঁকিছ স্বর্গের ছবি নাসিকা কুঞ্চিয়া,
নিমেষে নিঃশ্বাস ফেলি ভগবানে স্মরি
মানুষের শত পাপ দাও দেখাইয়া।

কিন্তু ঈশ্বর তো কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রতিনিধি নন—তিনি সবকার! তরুণ কবি চিত্তরঞ্জন 'আমার ঈশ্বর' নামক কবিতায় নিজের জীবনের স্বপ্ন সাধ আশা আশঙ্কা ও ব্যর্থতার কথা জানিয়েছেন ঈশ্বরকে। বলছেন :—

সম্মুখে পশ্চাতে মোর জীবন ব্যাপিয়া
ঘনায়ে আসিছে ধীরে অন্ধ অন্ধকার।
নিষ্প্রভ নয়ন হতে যেতেছে হারায়ে
জীবনের লক্ষ্যগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িছে

প্রাণের আবাস। তাই আজি ডাকিতেছি
বারেবারে, কোথা ওহে নিখিল নির্ভর।

তরুণ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের জীবনস্বপ্নের ব্যর্থতার ছবি অতি স্পষ্টভাবে এঁকেছেন এখানে। ভগবান ছাড়া তাঁকে এ দুঃখের অগাধ জলধি থেকে কেউ তো মুক্তি দিতে পারবে না, কারণ তিনিই তো নিখিল সংসারের অধিপতি। তরুণের চোখে যে অনেক স্বপ্ন—সে-স্বপ্ন কি সফল করে তুলতে পারবেন, এটাই তাঁর ঈশ্বরের কাছে একমাত্র জিজ্ঞাসা। তাই কবি বলছেন :—

বল দেব! পারিব কি লয়ে যেতে শেষে
নন্দনের পথে? আমার প্রাণের তরে
নাহি মোর কোন ভিক্ষা, কিন্তু ওহে দেব!
আমার প্রাণের মাঝে রেখেছি রুধিয়া
প্রাণ হতে প্রিয়তর অপূর্ব স্বপন।

এই স্বপ্নের মধ্যেই যেন আমরা দেখতে পাই আগামী দিনের Partriot দেশবন্ধুকে। কিন্তু ব্যর্থতা আর হতাশার ছায়া-অন্ধকারে জীবন-তরী বেয়ে চললেন চিত্তরঞ্জন—জীবনের কোনদিকেই দেখতে পেলেন না এতটুকু আশার আলো। তাই কবির অভিমান হলো ঈশ্বরকে প্রতি। যে ঈশ্বর তাঁর অন্তরের এই ঐকান্তিক কামনায় সাড়া দিলেন না, তাঁকে তিনি জীবন-নাট্য থেকে বিদায় নিতে বললেন :—

তুমি যাও আমি থাকি আপনাবেলায়
ডুবিয়া হৃদয় তলে গভীর—গভীর।
আমারি নন্দন আমি করি আবিষ্কার,
মধুর সুন্দর এক অপূর্ব নন্দন।
তারপরে শেষ আনন্দ উজ্জ্বল করে,
করুণা মলিন করে, সর্ব প্রাণ ভরে,
যত্ন করে গড়ে তুলি আমার ঈশ্বর।

আকুল পরাণ লয়ে ব্যাকুল নয়নে
তোমার চরণতলে আসিব না আর।

অন্ধকার হতাশা আর ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে তরুণ উপলব্ধি করলেন, ঈশ্বর কে? সে তো মানুষরই এক কাল্পনিক সৃষ্টি—যা মানুষের জীবনের সুখ আশা ও আনন্দের পরিসমাপ্তি ঘটায়। 'ঈশ্বর' কবিতায় তাই এবার তরুণ কবির চিত্ত এই ঈশ্বরের সম্বন্ধেই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। কবি বললেন:—

ঈশ্বর! ঈশ্বর! বলি অবোধ ক্রন্দন
প্রচণ্ড ঝটিকা বহি গগন ভরিয়া
আমাদের সুখ শান্তি নিতেছে হরিয়া
বাড়াইয়া আমাদের বিজন বেদন!
হায়! হায়! মিথ্যা কথা ঈশ্বর! ঈশ্বর!
করুণা ক্রন্দন উঠে অনন্ত গগনে
ঠেলে ফেলি জীবনের বিনীত নির্ভর
ধরণীর আর্তনাদ শুনি না শ্রবণে।
ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকি নিরন্তর
শতবার প্রতারিত কাঁদি মনে মনে।

এই কবিতাটির জন্যই চিত্তরঞ্জন ঈশ্বর-বিদ্রোহী ও নাস্তিক আখ্যা পেয়েছিলেন এবং তাঁর বিবাহের সময়ে পরম ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্রাহ্ম সমাজে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে যে এক পরম ভক্ত প্রাণের যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে, তা তথাকথিত ব্রহ্মজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন না। ঈশ্বরে তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং সমগ্র অন্তর দিয়ে তিনি তাঁকে প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু বধির ঈশ্বরের নীরবতা এবং নিজ জীবনের ব্যর্থতায় কবির অন্তরের সব আশা বিশ্বাস গেল ভেঙে—পরম ভক্ত হয়ে উঠলেন যেন চরম বিদ্রোহী। তাই, নিজের ভালবাসা দিয়ে সৃষ্টি করলেন এক নন্দন কানন, যে-কাননের অধিরাজ—সর্বমানবে প্রেম। মানুষের মধ্যেই তিনি অনুভব করতে

চাইলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

এখানে যেন বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জনের বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তি প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সবার উপরে মানুষ সত্য—বিবেকানন্দের এই অমরবাণীর নতুন করে প্রতিষ্ঠা দিলেন তিনি তাঁর কাব্যে। 'দেবতারে যাহা দিতে চাই, তাই দিই প্রিয়জনে, আর পাবো কোথা? দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—এই উক্তিরই পরিপূর্ণ প্রকাশ কবি মানুষ ও রাজনীতিক চিত্তরঞ্জনের জীবন। ধর্ম জীবনের মূল্যবান শাল গালিচা নয়, সে দক্ষিণা বাতাস ও ফুলের সুরভির মতো জড়িয়ে আছে আমাদের জীবনে। তাই যারা ধর্ম নিয়ে অহঙ্কার করে, তাদের প্রতি কবির অন্তরের চরম বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল 'অহঙ্কার' কবিতায়। কবি তাতে বলেছেন ঃ—

তুমি উচ্চ হতে ধার্মিকপ্রবর
তুচ্ছ করি অতি তুচ্ছ আমাদের প্রাণ—
ওগো! কোন্ শূন্য হতে আনিয়া ঈশ্বর
জীবনে তাহারি কর আরতির গান।
এস এস কাছে লয়ে মানবের প্রাণ
কাজ কি এ মিথ্যাভরা দেবতার ভান।

মানুষের পূজাই চণ্ডীদাস-ভক্ত চিত্তরঞ্জনের জীবনের ধর্মের সার কথা। মানুষের সৌন্দর্য ও সম্পদপূর্ণ অন্তরের তো তুলনা মেলে না। কবির মন-মালঞ্চের ফুল দিয়ে তিনি রচনা করলেন কাব্য মালঞ্চ, কিন্তু সেই সুগভীর অন্তরের ভাবরাশি কেমন করে প্রকাশ করবেন তিনি। 'দরিদ্র' কবিতায় কবি বললেন :—

তোমরা দেখিছ শুধু বাহিরের সাজ,
সৌন্দর্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের
হৃদয় সম্পদরাশি ফুটে না ভাষায়,
বাহিরে আনিলে তার সৌন্দর্য হারায়।

মন-মালঞ্চের সম্পদ পূর্ণ হয়ে আছে প্রেমে। কিন্তু কেমন সে

প্রেম? সংশয় আকুলিত চিত্তে বারেবার সে প্রেমের স্বরূপ জানতে চেয়েছেন কবি :—

তোমার ও প্রেম, সখি, শাণিত কৃপাণ।
দিবানিশি করিতেছে হৃদিরক্ত পান।
নিত্য নব সুখভারে,
ঝলসিছে রবি করে,
রজনীর অন্ধকারে যে আলো নির্বাণ! (তোমার প্রেম)

সুখ দুঃখ দুয়ের মিলনেই প্রেমের পূর্ণতা—শুধু সুখের লাগিয়া পিরিতি হয় না। কিন্তু প্রকৃত প্রেমের অধিষ্ঠান সুখ দুঃখের অতীত এক আনন্দলোকে। তাই, কবি বলে উঠলেন :

তোমার ও প্রেম, সখি, অমর জীবন
শান্তিরূপী নন্দনের চির আরাধন।

প্রেমের এই আনন্দের অনুভূতিকে কবি প্রেমিকার সত্তার মধ্যেই লীন করতে চাইলেন। তিনি বল্লেন :

তোমার ও প্রেম, সখি! তোমারি মতন
অনন্ত রহস্যময় সৌন্দর্যে মগন
সমস্ত হৃদয় তব
অজানিত নিত্য নব
বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন
তোমার ও প্রেম, সখি! তোমারি মতন।

কিন্তু অপার রহস্যময় এ প্রেমকে খুঁজতে গিয়ে কবির তরুণ হৃদয় বুঝি দেউলিয়া হয়ে গেছে—অতৃপ্ত কামনা নিয়ে তিনি সন্ধান করেছেন মানসী প্রিয়ার। ব্যাকুল মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কবি বলে উঠলেন :

কোথা তুমি? কাছে এসো, করহ সৃজন
ধরণীর ম্লানবক্ষে নন্দন কানন। (আকাঙ্ক্ষা)
সেই যে রহস্যময়ী প্রিয়া, যে

এই কাছে এসে চাও,
ওই দূরে সরে যাও—

তার এই লীলা খেলাতে, তার এই দূরে সরে যাওয়াতে, প্রেমিকের প্রাণ অসহ্য বিরহে কাতর হয়ে পড়েছে। মনে পড়ে সেই মায়াঘেরা সুখস্মৃতির দিনগুলি। 'চিরদিন' কবিতায় কবি পরম বেদনাভরে গেয়ে উঠলেন :

রেখে গেছ জন্মশোধ বিদায়ের বেলা,
প্রেমভরা অশ্রুভরা বিষাদ চুম্বন।
সুখ দুঃখে বিজড়িত হৃদয়ের মেলা
রেখে গেছ চিরস্মৃতি সজল নয়ন।

নির্জন সন্ধ্যায় আজ যে তোমার প্রেমপূর্ণ দুটি আঁখিতারা জেগে উঠেছে আমার মানস মন্দিরে—নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় শুনতে পাচ্ছি তোমার হৃদয়ের ব্যাকুল আহ্বান। 'সান্ধ্য সাগরে' কবি তাই গেয়ে উঠলেন :

আজ কেন মনে আসে
দুটি আঁখি ভরা বাসে
মধুর মুরতি হৃদে উঠেছে জাগিয়া।
কে তুমি ডাকিছ মোরে
সমস্ত হৃদয় ভরে
শুনিতে পেয়েছি তব আকুল আহ্বান।

কিন্তু তোমাকে একান্ত করে পাওয়া তো আমার কেবল মাত্র কল্পনা। আপন করে এ জীবনে কোনদিনই তোমায় আমি পাবো না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন ও কল্পনার হাত থেকে তো নিবৃত্তি নেই। 'কল্পনা' কবিতায় কবি বললেন :

তোমারে পাব না জানি, তবু মনে আসে
অনন্ত বাসনাপূর্ণ অসংখ্য কল্পনা,
অন্তরের কানে কানে মোহমন্দ ভাষে
দিবসে নিশীথে জাগে সহস্র জল্পনা।
কল্পনার স্বপ্ন ছল সত্য হয়ে ওঠে

আপনার বাসনার নিবিড় তৃষায়
আমার অন্তরতলে যত পুষ্প ফোটে
শরৎ প্রভাতে আর বসন্ত নিশায়!

অতীতের স্বপ্নময় প্রেমের মাধুরীতে ভরা দিনগুলি সে তো আজ হয়ে গেছে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস। এই মাটির পৃথিবীতেই একদিন ছিল সুখ, আনন্দ, প্রেম ও প্রিয়া। কিন্তু নির্মম বিধাতার অভিশাপে প্রেম হয়ে উঠলো পরিহাস, তাই 'প্রেম পরিহাস' কবি কবিতায় বলছেন :

সেদিন ধরণী ছিল নন্দন কানন
বসন্ত পবন অঙ্গে পুষ্পোজ্জ্বল হিয়া
তোমার সুন্দর মন, আনন্দ আনন,
স্বপ্নোজ্জ্বল মধু আঁখি পূর্ণ মেলিয়া।
মন মধুকর মোর, নয়ন পল্লবে
নিশি নিশি কত মধু করিয়াছে পান।
আজিকার রুদ্রালোকে জীবন বিল্পবে,
সে সত্য কাহিনী লাগে স্বপন সমান।
আমার কি দোষ বল? দেবতা নির্দয়
করিল মোদের লয়ে প্রেম পরিহাস।

ভগবানের এই নিষ্ঠুর পরিহাসের কাছে মানুষের অন্তর তো পরাজয় স্বীকার করে না, কারণ প্রকৃত প্রেম তো এই পৃথিবীতে তুলনাবিহীন নন্দনকাননের স্বপ্নভরা দিনের ছবি নিয়ে অন্তর মাঝে মাগে সুনিবিড় তৃষা! অন্তরের এই যে রক্ত ঝরানো প্রেম, এ তো মাটির পৃথিবীতে দুর্লভ সামগ্রী। 'তৃষা' কবিতায় তাই গেয়ে উঠলেন কবি :

তোমার সৌন্দর্য আর মোর ভালবাসা
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে দুই তুলনাবিহীন,
পিপাসিত প্রাণে তুমি আকাঙ্ক্ষিত আশা,
করুণ ক্রন্দনে হৃদি পূর্ণ চিরদিন।

ওগো তুমি দেখা দাও বারেক আসিয়া,
ক্ষুধিত তৃষিত চিত্ত চির অপেক্ষায়।

তুমি কি একবার আমার জীবনপ্রান্তে দেখা দিয়ে আমায় নিয়ে যেতে পার না সুখের সেই অমরাবতীতে ?

মধু হস্তে ধরি, পাত্র মুখে ধর মোর,
সুবর্ণ মদিরা মোরা এসো করি পান,
নয়নে আসুক নেমে রজনীর ঘোর,
তোমার কম্পিত লজ্জা হোক অবসান।
অপেক্ষায় সুখপুষ্প যেতেছে ঝরিয়া
দেবতারা হাসে যেন গগন ভরিয়া।

কিন্তু প্রেমের এই বিশাল এই পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে কবি উপলব্ধি করেছেন শুধু নিজের দেহবাসনাভরা সুতীব্র কামনাময় অন্তরের, তাই 'লালসা' কবিতায় প্রিয়াকে বলেছেন ঃ

তুমি তো জান না আজ সরল নয়নে
অনন্ত বিশ্বাসে তব কি দিতেছ আনিয়া
তোমার ও দেহমন
কুসুম মরনে
কত সুখ কত ভয়
আমি তাহা মানি
এখনো সময় আছে
ফিরে যাও সখি
আমার এ প্রেম শুধু
রক্তের লালসা।

কবির ব্যক্তিগত এই পরম তৃষ্ণাকে, এই প্রেমকে তিনি সমগ্র বিশ্বের পটভূমিকায় উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। তাই এ প্রেমের মধ্যে শুনেছেন বিশ্বের আহ্বান। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের ভাবধারার সংগে যে মিল আছে, সে কথা কিছুতেই অস্বীকার করা

যায় না।

'জাগরণ' কবিতায় কবি বললেন :

আমায় এ প্রেম তুমি রেখো না বাঁধিয়া
হৃদয় মন্দিরে গন্ধ বন্ধ কুসুমের
সমস্ত গগনভরা পবনে লাগিয়া
সমস্ত ধরণী পাক্ প্রেম মরমের।
প্রভাতে জাগ্রত হৃদি শেষ কর গান,
আমার জীবন ভরা বিশ্বের আহ্বান।

ব্যক্তিগত প্রেমকে বিশ্বপ্রেমে রূপান্তরিত করার মধ্যে দিয়ে কবি প্রকাশ করলেন তাঁর অন্তরমাঝে লুকায়িত পরম ধনকে। যে সুরটি লুকিয়েছিল তাঁর মরমের গভীরে, তারই সুন্দর প্রকাশ এই কবিতায়।

সুতরাং ব্যক্তিগত প্রেম জীবনের যে জ্বালা, যন্ত্রণা এবং অতৃপ্তি, তা থেকে আজ কবি মুক্তি পেয়েছেন বিশ্বপ্রেমের আহ্বানে। তাই যে প্রেমকে মনে হয়েছিল পরম অমৃতময় ভগবানের সত্তা, তাঁকেই আজ মনে হলো চরম অত্যাচার। 'মুক্তি' কবিতায় কবি বললেন :

তব প্রেম অত্যাচার হতে, হে সুন্দরি
লভিয়াছি মুক্তি আজ।
শ্রান্ত করি দেহমন ধোয়ান ধারণা
প্রভাতে দিবসে রাত্রে সমস্ত জীবন
কি তিক্ত অমৃত তুমি করেছ মগন
নিশীতের স্বপ্নভাতি দিবসের ভাবনা
নির্ভাবনা।

রোম্যান্টিক সমভূমি হতে বাস্তবের কঠোর ভূমিতে নেমে এলেন কবি। ব্যথিত হলেন বারবিলাসিনীর অন্তর বেদনা দেখে। তার অন্তরের বেদনা অতৃপ্ত কামনার ইতিহাসকে অতি নিপুণভাবে তুলে ধরলেন কবি। এই ভাগ্যহতা নারীর মর্মবেদনায় কবির অন্তর সমবেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এই কবিতাটি নিয়ে চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে

অনেকে নীতি এবং দুর্নীতির প্রশ্ন তুলে ছিলেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে। তিনি তো পাপীর পাপকে প্রশ্রয় দেননি! স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—Hate the sin, but not the sinner —এই কথাটিকেই তিনি পরম সত্য করে তুলেছেন এ কাব্যে। তাছাড়া আমার মনে হয়, কাব্য-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে চিত্তরঞ্জনের সমগ্র কাব্য-সাহিত্যেই শুধুমাত্র নয়—বাংলা সাহিত্যে এটি একটি অতুলনীয় কবিতা। পুরুষের অন্যায় নিপীড়িতা, সমাজ-পরিত্যক্তা নারীর অভিশপ্ত জীবনের বেদনার অশ্রুজল যেন কবিতাটির প্রতি ছত্রে ছত্রে :

আমি যেন চিরদিন ঋণী
অপার ঐশ্বর্য লয়ে
বিলাই ভিখারী হয়ে
বাসনাবিহীন উদাসিনী
লালসা উল্লাসহীন, পূর্ণ উদাসিনী—
কে করেছে মোরে চির ঋণী
ওগো আমি যৌবন যোগিনী।
এ লালসা ছাই
সর্বাঙ্গে মাখিয়া তাই
চলিয়াছি কলঙ্কবাহিনী
কোন্ মহাপ্রাণে ব্যথা
দিয়েছিনু তাই হেথা
প্রাণহীন প্রেম বিলাসিনী
সবারে বিলাসি তাই বারবিলাসিনী
তারি শাপে চিরকলঙ্কিনী। (বারবিলাসিনী)

'অভিশাপ' কবিতায় আমরা পাই চিত্তরঞ্জনের মর্মের গভীরের সুনিবিড় পরিচয় :—

স্বর্গসহচরগণ! আজি হতে আমি হ'ব
ধরণীর প্রাণ

বাজিবে আমারি মর্মে জগতের দীর্ঘশ্বাস
শত দুঃখতান।
চির অশ্রুজল চোখে জাগিয়া বহিব লয়ে
পূর্ণ পরিতাপ
বক্ষেতে বিঁধিয়া রবে শাণিত কৃপাণ সম
এই অভিশাপ।

তাঁর অন্তরের এই বাণী স্বর্গের দেবতাকে নামিয়ে আনল তাঁর সিংহাসন থেকে। অসহ্য কণ্টকবহুল পথ অতিক্রম করতে হবে জেনেও তিনি হতে চাইলেন ধরণীর প্রাণ—ঈশ্বর ও প্রেমে যে বাসনার স্ফুরণ দেখেছিলাম, মালঞ্চের মালাকার কবি চিত্তরঞ্জনের জীবনে তারই পূর্ণ পরিণতি দেখলাম রাজনীতিক জীবনের আভাসে। তাই বলছিলাম রাজনীতিবিদ্ চিত্তরঞ্জনকে জানতে হলে, জানতে হবে তাঁর মর্মকে, তাঁর হৃদয়ের ধর্মকে—পিছন ফিরে তাকাতে হবে কবি ও সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের প্রতি।

এর ভাষার পরিপাট্য আছে—আছে যৌবনের জয়গান, তার জ্বালা যন্ত্রণা আনন্দ বেদনা। কবি চিত্তরঞ্জনের প্রথম কাব্য হিসাবে 'মালঞ্চ কাব্য' অতি সুন্দর কাব্যপুষ্পের গুচ্ছ, একথা বোধহয় বাংলা সাহিত্যের কোন রসজ্ঞ পাঠকই অস্বীকার করবেন না।

মালা কাব্যগ্রন্থ

১৯০২ সালে মালঞ্চের কবি চিত্তরঞ্জনের জীবন মালঞ্চের ফুল দিয়ে রচনা করলেন 'মালা' কাব্যগ্রন্থ। যৌবনের যে অস্থিরতা, ব্যাকুলতা এবং উদ্দামতা মালঞ্চ কাব্যে সন্নিবেশিত—মালা কাব্যে তা স্থির প্রশান্ত অচঞ্চল।

মালঞ্চ কাব্যে কবি প্রেমের স্বরূপ বুঝতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রকাশ আমরা দেখেছি 'তোমার প্রেম' কবিতায়। কিন্তু মালা

কাব্যে এসে তরুণ কবি উপলব্ধি করলেন সে প্রেমের স্বরূপ—'সে কি শুধু ভালবাসা' কবিতায় কবি বললেন :—

কেমন যে ভালবাসা ? বলা কি সে যায় ?
সকল জীবন আর সব স্বপ্ন গায়
তোমারি তোমারি গীতি ; স্রোতস্বতী যথা
সমুদ্রের গান গাহে তারি পানে ধায়
আকুল আশায়।

এ প্রেম এনেছে কবির জীবনে পূর্ণতার প্রতিশ্রুতি, এনেছে স্বর্গের স্বপন। তাই 'স্বর্গের স্বপন' কবিতায় কবি গেয়ে উঠলেন ঃ

চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভুবন
স্বপ্নালোকে আলোকিত আমার এ মন
অর্ধনিমীলিত নেত্রে মনে হলো মোর
স্বর্গ হতে নেমে এলে।

সেই স্বর্গের প্রেয়সীকে কবি সর্ব অন্তর দিয়ে বরণ করে নিলেন আপনার হৃদয় রাজ্যে ; সে-প্রেমের মাঝে রেখে গেলেন না কোন সংশয়, কোন জিজ্ঞাসা। এই পর্যন্ত কবি ছিলেন সীমার প্রেমেই আত্মহারা—সীমার সহিত অসীমের যে নিবিড় মিলন-ব্যাকুলতা, তা তখনও তাঁর কাব্যে জন্ম নেয়নি।

কিন্তু একটা কথা রাখতে হবে, মনে চিত্তরঞ্জনের 'মালা' কাব্য শুধু মানবীয় প্রেমের জয়গানে মুখরিত নয়। সীমার সহিত অসীমের, মানুষের সংগে ভগবানের প্রেমের ব্যাকুলতায় এ কাব্যের পরিসমাপ্তি। বৈষ্ণব কবির সেই প্রাচীন সুর—'দেবতারে যাহা দিতে পারি, তাই দিই প্রিয়জনে, আর পাব কোথা, দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—সেই রাণীতে পূর্ণ আভাসময় এ কাব্যগ্রন্থখানি। তাই মানবীয় প্রেম এখানে গভীর স্তরে উপনীত হয়ে ধীরে ধীরে তা ভক্তির ব্যাকুল কামনারূপে পৌঁচেছে ভগবানের চরণে।

প্রথমে এই অন্তরভরা প্রেমকে তিনি দেবতার চরণে সমর্পণ

করেছেন। এই প্রেমের মধ্যে আছে তিনজনের খেলা, আর একজনের লীলা। তাই, সেই একজনের চরণেই তিনি তাঁর অন্তরের প্রেমকে নিবেদন করেছেন। 'প্রেম' কবিতায় কবি বলেছেন :—

তবে এস নমি মোরা দেবতা চরণে
সেইখানে বাঁধা রব জীবনে মরণে।

প্রিয়াকে প্রেম সমর্পণেও তাই তিনি ভগবানকেই সাক্ষী মানছেন; কবি বলছেন :—

এ প্রেম নির্মল ফুলের মতন
দেবতা সকলি মানে।

এই প্রেমই নতুন আলোর পথ দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে চলেছে পরমের অভিসারে—'প্রেম ও প্রদীপে' কবি তাই বললেন :—

আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো, প্রদীপ জ্বালিয়া
তোমার ও প্রদীপের কণক কিরণে
আমার সকল মন উঠে উথালিয়া।

এ প্রদীপ শুধুমাত্র প্রিয়ার জ্বালানো মণিদীপই নয়—এ প্রদীপের আলোতে এক সুরে এসে বাঁধা পড়েছে মানুষ ও ভগবান—সীমা ও অসীম—মিলন পিয়াসী কবির চিত্ত ব্যাকুল। সব সুখ, সব দুঃখের মাঝে শুধু তোমারি অনুসন্ধান করে ফিরি আমি। তাই কবি লিখেছেন :—

আমি যে তোমারে চাই সন্ধ্যার মাঝারে
তোমার ঐ প্রদীপের আলো অন্ধকারে
সকল সুখের মাঝে সর্ব বেদনায়
কর্মক্লান্ত দিবাশেষে চিত্ত ছুটে যায়
ওই তব প্রদীপের আলো অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া তাই খুঁজিবারে

হে মোর লুকানো ধন, হে রহস্যময়ী!
আজি জীবনের শেষে, আজো তুমি জয়ী।

কিন্তু রহস্যময়ীর আলো-অন্ধকারে কবির ভুবন আলোকিত হয়ে উঠল। সেই প্রদীপের আলো দিল আহ্বান-বাণী—

হাসি কহে প্রদীপ তোমার
আমি আছি, কোথা অন্ধকার?

এই প্রদীপের আলোর একদিকে রয়েছে সীমার প্রেয়সীর প্রেমভরা অন্তরের ইঙ্গিত আর অপরদিকে রয়েছে জীবনের পথে নূতন আলোর সন্ধান। মালঞ্চে যে কবি পরম অভিমানভরে হয়ে উঠেছিলেন ঈশ্বর-বিদ্রোহী, 'মালা' কাব্যে এসে সেই কবির প্রাণ ধীরে ধীরে ঈশ্বর অনুরক্ত হয়ে পড়ল। ব্যক্তিগত জীবনে এর কারণ খুঁজেতে গেলে আমার মনে হয় জীবনের যে ব্যর্থতা হতাশা ও অন্ধকার 'মালঞ্চ' কাব্যের যুগে কবির অন্তরকে বেদনায় বিমথিত করেছিল, আজ তিনি সেপথে সামান্য একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। তাই সে জীবন-তরণী বেয়ে এগিয়ে যাবার কাণ্ডারী ঈশ্বরকে নিজের মনের সর্ব ভালবাসা সমর্পণ করেছেন।

এই প্রদীপ হাতে জীবনের আলোর আঙ্গিনায় যে এসে দাঁড়ানো, তাকে কোন্ উপহার দেবেন তিনি আজ? 'উপহার' কবিতায় আছে সেই সুর :—

বিশাল এ জগতের বন উপবনে
ফুটিল যে পুষ্পরাশি আছিল যা মনে
থর থর সেই ফুলে সাজায়েছি ডালা
পর পর সেই ফুলে গাঁথিয়াছি মালা।

তারপর 'তুমি' কবিতায় এই সর্বময়ী অধিষ্ঠাত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

ওগো প্রিয়, তুমি মোর সর্বজীবনের
চির প্রেমার্জিত শত তপস্যার ফল।

তাই বিশাল এ জগতের বন-উপবনে যত ফুল ফুটেছে, তারই মালা গেঁথে কবি সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যদি তিনি আসেন, তবে—

খুলিয়া হৃদয়ভার আমি বিছাইব
যত না সৌন্দর্য আছে, যত না স্বপন।
সর্ব কোমলতা মোর আমি পেতে দিব
তুমি কর, ওগো কর, আমার জীবন
তব চরণভূমি। (তুমি)

এই তুমি কে? এই তুমির মধ্যে আমরা স্পষ্টই সেই মহানের, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি নিয়ন্তা, তাঁর আগমনের চরণধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তোমার আমার মাঝখানে জ্বলছে এক অনন্ত দীপ; কবি বললেন :—

তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি।
দুজনার মাঝে এক দীপ জ্বেলে রাখি।

সেই সুদূরের পরম অভিসারিকা জীবন রঙ্গভূমির একান্ত দয়িতকে তিনি কামনা জানালেন 'প্রার্থনা' কবিতায়, এই বলে :—

ভরি দিও শূন্য প্রাণ তব পূর্ণতায়
মহান্ করিয়া দিও তব মহিমায়।
আমারে জড়ায়ে নিও
আমারে ঢাকিয়া দিও
ওগো মহা আবরণ! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার।
তুমি যে—নিখিলের প্রাণ তুমি, তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার
জাগরণে কর্মভূমি
শয়নের স্বপ্ন তুমি
ওগো সর্বপ্রাণময়! তুমি যে আমার
দিবসের দিনমণি, নিশার আঁধার।

এই মহানের সংগে মিলনের জন্য ব্যাকুল হলো কবির অন্তর—নিবিড় মিলনের পরম তৃষায় ছেয়ে রইল তাঁর মন। ভগবানের অস্তিত্বের চেতনা পরিপূর্ণ করলো তাঁর হৃদয়রাজ্য। 'গান' কবিতায় কবি গেয়ে উঠলেন :

আমার পরাণ ভরে উঠে যত গান
তোমার পরাণ হতে পায় যেন প্রাণ।
ওগো প্রাণস্পর্শী! করহ পরশ মোরে
তোমার অনন্ত গানে প্রাণ থাক ভরে।
আমারে ভাসায়ে রাখ পরাণ পরশে
আমারে ডুবায়ে দাও পরম হরষে।
সকল ঐশ্বর্যে আমি সাজায়েছি ডালি
পরিপূর্ণ প্রাণ মোর করিয়াছি খালি,
আরো যে চাহিছ তুমি, কি দিব গো আমি,
চাও যদি লয়ে যাও শূন্য প্রাণখানি। (শূন্যপ্রাণ)

'মালঞ্চের' ঈশ্বর-বিদ্রোহী কবির পরম আত্মসমর্পণে পরিসমাপ্তি 'মালা' কাব্যগ্রন্থখানির—তাই বলছিলাম, মানবের পূজার তরে যে মালা গেঁথেছিলেন কবি প্রেমভরে তা পরিয়ে দিলেন ভগবানের গলায়—ভক্ত ও ভগবানের সুনিবিড় মিলনের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটল 'মালা' কাব্যের।

সাগর সংগীত

চিত্তরঞ্জনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ "সাগর সংগীত" রচিত হয় ১৯১১ সালে তাঁর ইংল্যাণ্ড যাত্রার পথে এবং তা প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। পাহাড় পর্বত সমুদ্র নদী এ সবের প্রতি কবি চিত্তরঞ্জনের অন্তরের একটা সুগভীর টান ছিল। হিমালয়ের সৌন্দর্য যেমন তাঁকে আত্ম-হারা করতো, তেমনি মহাসমুদ্রের অসীম জলরাশির মধ্যে কবি শুনতে

পেতেন অনন্তের আহ্বান। ১৯১১ সালে ইংল্যাণ্ড যাত্রার পথে সমুদ্র দেখে মনের সেই সুনিবিড় অনুভূতিকেই ছন্দে গাঁথলেন কবি তাঁর 'সাগর সংগীত' নামক কাব্যগ্রন্থে। যে অসীমের নিকট আত্মসমর্পণে কবি চিত্তরঞ্জনের 'মালা' কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল, সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা, মধুর শোভা—সবকিছুর মাঝেই কবি অনুভব করলেন সেই অনন্তকে। তাই সাগর সংগীতে কবি তাঁর সব সুখ দুঃখ আনন্দকে সেই অসীমের নিকট একান্ত বৈষ্ণব কবির ন্যায় সমর্পণ করেছেন।

এখানেও ব্যক্তিমানসের সংগে কবিমানসের একটা সুগভীর যোগ দেখতে পাবো। ১৯১১ সালে চিত্তরঞ্জনের আইনজীবী জীবনের দীপাবলীর উৎসব রাত্রি, অর্থ, যশঃ, প্রতিপত্তি সব কিছুরই স্বর্ণ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তিনি—আলিপুর বোমার মামলার চরম সাফল্যের পর ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হচ্ছে শুধু একটি নাম—ব্যারিস্টার C. R. Das। জীবনের এই স্থিতি, এই প্রতিষ্ঠার ফলে তাঁর মন থেকে সব সংশয় সন্দেহ দূর হয়েছে। জীবন মালঞ্চে আশার আলোকে উদ্ভাসিত মনোবীণার তার—তাই মালঞ্চের ঈশ্বর-বিদ্রোহী কবি আজ পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী। বৈষ্ণব কবিতার আত্মসমর্পণে ভরা সাগর সংগীতের কবিতাগুলি। কবি বললেন :—

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোক আঁধারে।

এখানে আমরা যেন ইংরেজ কবি শেলীর এবং রবীন্দ্রনাথের 'আমারে কর তোমার বীণা' এই ভাবটির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

সাগরের সংগীত শুনে কবির প্রাণে যে অজানা অনুভূতি জাগল, তাকেই কবি ভাষা দিলেন তাঁর কাব্যে। কবি বললেন :—

আজিকে পাতিয়া কান
শুনেছি তোমার গান,
হে অর্ণব। আলো ঘেরা প্রভাতের মাঝে·

একি কথা! একি সুর!

প্রাণ মোর ভরপুর

তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে

আবার বললেন:

তোমার গানের মাঝে কি জানি বিহরে,

আমার সকল অঙ্গ শিহরে শিহরে।

সাগরের এই অজানা সুরের মূর্চ্ছনায় অন্তরের সংগে মিলন পিয়াসী কবির হৃদয়ে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে এক অজানা সুর—তার কারণ তো তিনি আগেই বলেছেন—আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। কবি বললেন:

তাই আমি খুলিয়াছি হৃদয় দুয়ার,

তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে।

অপূর্ব এ মিলনের গোটাকত গীতে

পরাণ ভরিছে আজ তব পায়ে দিতে।

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভংগীতে কবি-হৃদয় এখানে শান্তি লাভ করেছে। তাই মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ভয়, ভাবনা দূর হয়ে নূতন উষার অরুণালোকে কবির জীবন উদ্ভাসিত। কবি বললেন:

কোথা তুমি নিয়ে যাবে, নিয়ে চল,

আমি তোমার মহান হস্তের যন্ত্রস্বরূপ

অতএব এবার বাজাও আমারে

দিবস রজনী ভরে আলোক আঁধারে

বাজাও নির্জন তীরে বিজন আকাশে

ওগো যন্ত্রী! আমি যন্ত্র বাজাও আমারে

তোমার অপূর্ব এই আলো অন্ধকারে।

মহাসাগরের সীমাহীন রূপের কাছে কবির হৃদয় মিলেমিশে হলো একাকার।

তোমার সংগীতের সুরে জেগে উঠল আমার অন্তরাত্মা, অবাক হয়ে ভাবি তাই আমার এ কুঁড়ির মতন প্রাণকে তুমি কেমন করে ফুটিয়ে

তুললে প্রস্ফুটিত ফুলে :—

আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন
তোমার সংগীতে তারে ফুটালে কেমন !
সফল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল !
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিনী
তব গীতে ওগো সিন্ধু ! দিবসযামিনী !

সাগরের অনন্ত রূপের মধ্যে যে অনিত্যতা, তারই মধ্যে যেন কবি অনুভব করলেন বৈষ্ণবীয় প্রেমকে—যে প্রেম জন্ম-জন্মান্তরের সামগ্রী। কবি বললেন :—

সোনার কমলে আমি মালিকা গেঁথেছি
দোলাইব আজ তব সোনার গলায়।
একসূত্রে বাঁধা রব আমরা দুজনে
তরুণ উষার কোলে স্বপন বিজনে।

এই উক্তির মধ্যে যেন বৈষ্ণবের ভক্ত ও ভগবান, সীমা ও অসীম একসূত্রে বাঁধা পড়েছে—সেই অসীম অনন্তের মধ্যে কবি অনুভব করেছেন পরম দয়িতের সংগে অচ্ছেদ্য এক বন্ধন, যে-বন্ধনকে তিনি সোনার কমলে সোনার মালায় গেঁথে রাখবেন।

কিন্তু কেবল বৈষ্ণবীয় প্রেমের আধার শান্ত মধুর রূপের অপূর্ব রূপায়ণেই সংগীতের একমাত্র কথা নয়—সাগর গর্জনের প্রলয় নৃত্যের মধ্যে কবি অনুভব করেছেন মহাকাল ভৈরবের তাণ্ডব নৃত্য :—

উন্মত্ত তরঙ্গ তব অযুত ফণিনী
বিস্তারিত অসংখ্য ফণা অনন্ত রঙ্গিনী
ঘন ঘোর ঝঞ্ঝাবায়ু আঁধার পরশে
ভীষণ ভৈরব একি প্রলয় বরষে
লক্ষ লক্ষ দানবের বিকট চীৎকার
মন্দ্রিছে মরণ গীতি অনন্ত আঁধারে।

হে রুদ্র মরণদেব! জটী জটাধর
প্রলয় ত্রিশূল তব সংহর! সংহর!

কিন্তু কেন এই সংহার মূর্তিতে রুদ্রের আবির্ভাব? এর তো কোন অর্থ খুঁজে পেলেন না কবি, কারণ কবি তো আপনা হতেই ধরা দিয়ে বসে আছেন। তাই তিনি বললেন:—

আমার পরাণ তরে বৃথা যুদ্ধ করা
আমি তো আপনা হতে দিতেছিনু ধরা,
জ্বেলে দিব সন্ধ্যাদীপ তোমার পরাণে
হৃদয় মন্দির তব ভরি দিব গানে।

কবির এই আশ্বাস-বাণীতে পরম রুদ্রের প্রলয় সংগীত আজ শান্ত—কবির চিত্তেও প্রলয়ের এই শান্তরূপ আনে চির প্রশান্তির আনন্দ। কবি গেয়ে উঠলেন:—

আবার ফিরেছে প্রভু! হৃদয় গহনে
ফলে ফুলে পরিপূর্ণ আনন্দ পবনে!
থেমে গেছে আজ তব প্রলয় সংগীত
অধরে নয়নে ভাসে জীবন ইঙ্গিত।
আমি চেয়ে আছি তব প্রভাতের পানে,
কি আনন্দ বহে হায় পরাণে পরাণে।

তুমি যে আমার বহুদিনের চেনা পরাণ বঁধুয়া, তোমার মধ্যে তাই মিশে আছে আমার জীবনের জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি। ঠিক মনে করতে পারেন না, কিন্তু বহুকালের পুরানো স্মৃতির পাতাটা কেমন যেন মানসপটে জেগে ওঠে—শুধু মনে হয়—

তোমারে দেখেছি বঁধু কবে কোন্ দেশে।

তাই তো আজ তোমার আমার মিলনের জন্ম চাই নিভৃতির আঁধার—দুজনের হৃদয়ের সুনিবিড় প্রেমের দান দুজনে অন্তর ভরে গ্রহণ করে পরম পরিতৃপ্তির সাগরে পরস্পরের আত্মবিলোপ ঘটাবো। আর, এই আত্মবিলোপই তো ভালবাসার জগতে সর্বশেষ

কথা। কবি গেয়ে উঠলেন :

যবে অন্ধকার আসি ঢাকিবে তোমায়
থেমে যাবে হেথাকার হাসির লহরী
দুইজনে মিলিবে হে! গাব দুজনায়
আঁধার রজনী যবে ঢাকিবে তোমায়!

ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের এই মিলন মন্দিরে—

সাধন ভজন আজি কুসুম উঠেছে ফুটি
সকল গগন ভরে। তোমার নয়ন দুটি
ভক্তিরসে ঢুলুঢুলু। বিগলিত করুণায়
তোমার তরঙ্গদল নেচে নেচে বহে যায়।

ভক্তের আত্মসমর্পণে ভগবানের প্রাণেও ফোটে আনন্দ কুসুম। কবি চিত্তরঞ্জন অনন্ত সাগরের বাধাবন্ধনহীন নীল জলরাশির মধ্যে অনুভব করেছেন ভগবানের অনন্ত শক্তিকে এবং সেই শক্তিরই জয়গানে মুখরিত এই কাব্য। তাই সাগরের রূপশোভা বর্ণিত হলেও একে আধ্যাত্মিক কাব্য রূপে মূল্যায়ণ করলে এর মূল্য এবং সৌন্দর্য কিছুমাত্র কমে না।

আর, এই প্রলয়ের আহ্বানের মধ্যেই যেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আহ্বানেরও ইঙ্গিত রয়েছে। কবি বলেছেন :

ছোট ছোট দীপ লয়ে খেলিতেছিলাম,
গুন্ গুন্ গান গাহি ঘরের ভিতরে।
কিন্তু যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জনে
অনন্ত রাগিনীভরা ধ্বনিতে তোমার,
হৃদয় মন্থন করা বিপুল তর্জনে,
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার।

এ আহ্বান মহাসিন্ধুর আহ্বান সত্য—কিন্তু মনের এই যে একটা বিশেষ অভিব্যক্তি তাই তো পরবর্তী জীবনে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনের জন্য সর্বত্যাগী রিক্ত এক অসীম সাহসী যোদ্ধার ইতিহাস

লিখে রাখলো ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায়, যা কোনকালে হারাবে না।

অন্তর্যামী

'অন্তর্যামী' কবি চিত্তরঞ্জনের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থখানির রচনাকাল ১৯১৪ সাল। 'অন্তর্যামী' রচনাকালে চিত্তরঞ্জনের জীবনে এসেছিল পরপর দুটি আঘাত—এক বছরের মধ্যে মাতৃবিয়োগ ও পিতৃবিয়োগ। জীবনপথের এই আকস্মিক আঘাতের বেদনা ভুলতে তিনি ডুবে গেলেন বৈষ্ণব সাধকের সব জুড়ানো সুধাস্রোতে—একদিকে কীর্তন গান আর অপরদিকে বৈষ্ণব কাব্য তাঁর হৃদয়পাত্রকে পরিপূর্ণ করে তুললো।

তাই একান্ত বৈষ্ণব কবির ভাবে বিভোর হয়ে ঈশ্বরের সাধনায় ঈশ্বরের সন্ধানে ব্যাকুল হল কবিমন। বৈষ্ণব কবির আত্মার সংগে পরমাত্মার গভীর মিলন পিয়াসী আত্মার কামনাময় অভিব্যক্তি 'অন্তর্যামী' কাব্য। এর মধ্যে কবির কাব্যজীবনের একটা পূর্ণতার স্তরও আমরা দেখতে পাবো

'মালঞ্চে' যে কবি ঈশ্বরের অস্তিত্বে হয়ে উঠেছিলেন সংশয়বাদী, 'মালা'য় এসে সে-সংশয়ের পথে উঁকি দিল ক্ষীণতম আলোর রেখা, যে-আলোর পথ ধরে অগ্রসর হলেন 'সাগর সংগীতে'—সাগরের অসীমতার মধ্যে অনুভব করলেন অনন্ত শক্তিকে, আর সে-শক্তির পূর্ণ উপলব্ধি ঘটল 'অন্তর্যামী' কাব্যে।

অন্তরের ধনকে কবি সমগ্র হৃদয় দিয়ে অন্বেষণ করতে লাগলেন। 'আমার এ দেহখানি তুলে ধর তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ কর'—এমনি সুরে যেন 'অন্তর্যামী' কাব্যের সুর বাঁধা। ভক্তের পরম ব্যাকুলতা, ভগবানের সংগে মিলন। কারণ, ভগবানই তো ভক্তের জীবনের একমাত্র আশ্রয়—ভক্তের জীবন তো মাটির পৃথিবীতে

ভগবানের পূজাতেই খুঁজে পায় সার্থকতার পথ। কবি চিত্তরঞ্জন লিখেছেন :

সকল দরশ মাঝে তুমি উঠ ভেসে,
সকল গগন মাঝে তুমি উঠ হেসে।
সকল গণনা মঝে তোমারেই গুনি,
সকল গানের মাঝে তব গান শুনি।
ওগো তুমি মালঞ্চের মনমালিকার
মালী তুমি সাক্ষী তুমি সব সাধনার।

ঈশ্বরই আজ কবির জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার ব্যাকুল কামনায় কবি তখন লিখেছিলেন :

এ পথেই যাব বঁধু! যাই তবে যাই!
চরণে বিঁধুক কাঁটা, তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।

কবির অন্তরের সেই ঐকান্তিক সাধনা কবিকে এনে দিল একান্ত ঈশ্বর সান্নিধ্য। কবির অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। কবি বললেন :

দিবস নিশি কতই তব কথা শুনি কানে,
প্রাণের মাঝে তোলাপাড়া মানে অভিমানে।
পরম তব স্বপন সম প্রাণে আনে ঘোর,
নিশাস তব লাগে কাঁপে প্রাণ মোর।

অন্তরলোকে ঈশ্বরের সংগে এ নিবিড় মিলনেও ঝরে পড়ে কান্না। কারণ কবি ঈশ্বরের দর্শন তো পান না। 'দরশ যদি নাহি দিলে সোহাগ করা মিছে।' ঈশ্বরের দর্শন লাভের ব্যাকুলতায় এক ভক্ত সাধকের কান্না ঝরা ইতিহাস 'অন্তর্যামী' কাব্য। বৈষ্ণবের রাধা যেমন পরমাত্মার সন্ধানে অভিসার করেন, যে-অভিসারের পথে আছে কত কাঁটার জ্বালা, কত যন্ত্রণা—তবু তিনি তো বিরত হন না, কারণ পরমাত্মার সঙ্গে মিলনেই জীবাত্মার পূর্ণতা—তেমনি 'অন্তর্যামী' কাব্যে

কবি চিত্তরঞ্জন একান্ত সাধনা ও ভক্তি নিয়ে সুরু করেছেন সেই পরমের পথে অভিসার, সে পথে কত কাঁটার জ্বালা, যন্ত্রণার অবধি নেই। কিন্তু তিনি তো সাধক, তাই তাঁকে কেবল কাঁদলেই চলবে না, তাঁকে তো যেতেই হবে—

যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর
আমার অন্তর আত্মা বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে
প্রাণ মোর ভরপুর কি কাতর গানে।

কিন্তু কোথায় সে জ্যোতির্ময়ের পথ?

পথখানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায়,
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায়।
পথের লাগিয়া মন মন পথবাসী
আমি তো আমাতে নাই, শুধু কাঁদি হাসি।
কে যেন আমার মাঝে পথ খুঁজে মনে,
আকুল নয়নে কার অশ্রুজল ঝরে!

কিন্তু একি!

তুমি হাসিতেছ বঁধু! তাই মনে হয়
সেই পথখানি মোর কাছে অতিশয়।

সেই পরমের সংগে মিলনের আশার আলোকিত পথ কবির অন্তরকে পূর্ণ করেছে—নিজের অন্তরের একান্ত সাধনায় ও ভক্তিতে মনের মাঝারে তিনি খুঁজে পেয়েছেন ভগবানের মন্দিরের পথ। সুতরাং সেই পথ ধরে এবার সুরু হলো যাত্রা। কবি বললেন :—

শুভ লগ্নে আজ তবে যাত্রা করিলাম,
মনোপথের পথিক হয়ে পথে ভাসিলাম।

শুভ লগ্নে যাত্রা করে কবি আজ কামনাময় বস্তুকে লাভ করবার আনন্দে আত্মহারা, তাই তিনি গেয়ে উঠলেন :

বাজা রে বাজা রে তব জয়ডঙ্কা,
নাহি লাজ নাহি ভয় নাহি কোন শঙ্কা।

কবির হৃদয়ে অন্তর্যামীর হৃদয়ের সুর এসে পৌঁছল—মনোলোকে সৃজন হলো অপূর্ব সুরের ভুবন। সেই সুর সাধনাময় কবির অন্তরকে পরিপূর্ণ করে তুলল। আজ তাই পূর্ণ হৃদয়ে সুরু হলো তাঁর চলা—

এবার এ চলিলাম সুরটি করে বুকে
সকল জ্বালায় বাজিয়ে দেব সকল সুখে দুখে
এই ও আমার পোষা পাখী, রবে বুকে জড়িয়ে।
তোমার গান আমার গান এক হয়ে যাবে,
পথের মাঝে তরুলতা সেই গানটি গাবে।

পরম বৈষ্ণবের মত জীবাত্মা ও পরমাত্মার, মিলনের মধ্য দিয়ে কবির ভক্ত হৃদয়ের পরম আত্মসমর্পণে পূর্ণ 'অন্তর্যামী'কাব্য। এখানে কবির অন্তর সাধনার পথে অগ্রসর হয়ে মনোজগৎ সাধকের নিষ্ঠায়, প্রেমে ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাই পরম বৈষ্ণবের মত তিনি বনমালীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন—তাঁর জন্য সাজিয়েছেন বরণডালা। কবি বললেন :—

এসো মনোবনবাসে। এসো বনমালী
চরণতলে ফোটা ফুল, তারি বরণডালি
সাজিয়ে রেখেছি আজ নয়ন জলে ধুয়ে
পরাণ ভরে প্রাণ জুড়াব তোমার পায়ে থুয়ে।

শুধু অবাক হয়ে ভাবি, ভারতের আইনজীবিদের যিনি মধ্যাহ্ন সূর্য—রাজনৈতিক দুঃখবেদনার কথা যিনি ভাবেন, তাঁর অন্তরেই অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে চলেছে পরমভক্তিরস—সুনিবিড় কাব্যরস, যাকে তিনি বাঁধলেন অপূর্ব গীতিকবিতায়।

কিশোর-কিশোরী

'কিশোর-কিশোরী' কবি চিত্তরঞ্জনের পঞ্চম এবং শেষ কাব্য। যে রূপান্তরের কথা চিত্তরঞ্জন বলেছেন, তারই পূর্ণরূপের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তাঁর কাব্য 'কিশোর-কিশোরী'তে। 'রূপান্তরের কথা' নামক প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জন বলেন, "ফুল যেমন জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া ফুটিয়া ওঠে, তেমনি মহাপ্রাণের লীলা রহিয়াছে, এ বিশ্বের প্রতিটি বস্তুতে। যাহাকে দেখিয়া প্রেমের উন্মেষ হয়, সে কোন মহাদেবতার জাগ্রত বিগ্রহ। এই প্রেমের খেলা তিনজনের খেলা, একজনের লীলা।"

তাই কবি 'তিনের কথা' নামে সুরু করেছেন তাঁর কাব্য 'কিশোর কিশোরী'। এই কাব্যটিতে বৈষ্ণব চিত্তরঞ্জনের মনোমুকুরের ছায়ায় যেন ধরা পড়েছে বৃন্দাবনের সেই চিরকিশোরের শাশ্বত লীলা। তাই এ কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে কবি চিত্তরঞ্জন জন্মজন্মান্তরের অবিনশ্বর কামনাহীন প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। 'অন্তর্যামীর' প্রেমে ভক্তি ও ভগবানের লীলার মধ্যে দিয়েই কবি পরিসমাপ্তি টেনেছিলেন ; 'কিশোর কিশোরী'-তে এসে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের মধ্যে অনুভব করলেন ভগবানের লীলাকে। অতএব আর্টের দিক থেকে এ কাব্যটি বৈচিত্র্যময় এবং চিত্তরঞ্জনের জীবনের কাব্যধারার ক্রম-পরিণতির একটি পূর্ণতা এনেছে।

বৈষ্ণব কাব্য অবলম্বনে মধুসূদন লিখেছিলেন 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'। কিন্তু তাঁরা এমন করে বৈষ্ণব হৃদয় নিয়ে তাঁদের কাব্যের মালা গাঁথেননি। আদিরসের ঊর্ধ্বলোকে কামগন্ধহীন এক অতীন্দ্রিয় লোকের জয়গানে মুখর এ কাব্য। তাই কবি বললেন :—

সমগ্র জীবন লীলা যুগযুগান্তর
জন্মজন্মান্তর ধরে, অনন্ত কালের

শুভ সংগীতের মাঝে উঠে যে ফুটিয়া
ফুটে না ফুটে না ফুল শুধু একদিন।

এর মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর সেই জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনের ইঙ্গিত রয়েছে। ফুলের প্রস্ফুটিত হওয়ার মাঝে যেমন রয়েছে কত যুগ-যুগান্তর, কত জন্ম-জন্মান্তরের ইতিহাস, তেমনি—

সেই যে মিলিনু দোঁহে সন্ধ্যাকাশতলে
সে কি শুধু মুহূর্তের মিলন উৎসব ?
অকস্মাৎ অকারণ সামান্য ঘটনা,
মুহূর্তে আরম্ভ তার মুহূর্তেই শেষ ?

না, তা নয়। তার মধ্যে রয়েছে কত বিচিত্ররূপে কত জন্ম-জন্মান্তরের লীলা। তাই আমাদের এই মুহূর্তের মিলনের মধ্যে রয়েছে মহামিলনের লীলার স্মৃতি, আর তার পেছনে রয়েছে সেই সৃষ্টির স্রষ্টা একজনের লীলা। কবির ভাষায়—

যেন কোন মহাদেবতার
মহামিলনের তরে মিলেছি আমরা।
যুগে যুগে জনমে জনমে বারেবার
তাই সন্ধ্যাকাশতলে উঠিলে ফুটিয়া,
ফোটেনি ফোটেনি প্রাণ শুধু একদিনে।

বিশ্বপ্রকৃতিতে সৃষ্টির অনাদিকাল থেকে সুরু হয়েছে যে প্রণয়ের লীলা, তা তো বিশ্বলীলারই অঙ্গীভূত। নিবিড় প্রেমের মধ্যে তাই তো ঝরে পড়ে ভগবানের আশীর্বাদ। প্রেমের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে মানুষ ভগবানের পূজার মন্দিরে প্রবেশের অধিকারী হয়ে ওঠে। নিত্য বৃন্দাবনে অনাদি অনন্তকাল ধরে চলেছে এই চিরকিশোরের অনন্ত প্রেমের লীলা। তারই ফলে জন্ম হচ্ছে কাব্য, সাহিত্য, সংগীত। এই মিলন-বিরহের তো শেষ নেই। কবি লিখেছেন ঃ

শত জনমের চাওয়া এ মধু মিলন !

তাই তো তারি লাগি—

যে ফুল ফোটেনি কভু, তারি গাঁথা মালা
যে দীপ জ্বালিনি ওরে! সেই দীপ জ্বালা!

এই দীপের আলো যেন জীবন হতে জীবনান্তরে আলোকিত করে ভুবন। সেই আলোতে যেন চিরকিশোর কবি খুঁজে পান তাঁর চিরকিশোরীকে। কবির অভিব্যক্তি—

তোমারেই পাই ওগো বারে বারে বারে
তরঙ্গের মত মোর মরম বেলায়।
মিলনে বিরহে কত! আর তারি সনে
যেন বেজে ওঠে অনাদি কালের বীণা।

সেই অনাদিকালের বীণার ধ্বনিতে কবির অন্তর পুলকিত। সেই আনন্দকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে। ভরা প্রাণে কবি চিত্তরঞ্জন গেয়ে উঠেছিলেন ঃ—

ওগো ফুল ওগো মিটি
ধন্য ধন্য সব সৃষ্টি!
ধন্য আমি ধন্য তুমি
পুণ্য সে মিলনভূমি।
কে বলে রে ধন্য ধন্য,
কে দেয় রে করতালি,
তোমার আমার মাঝে
অপর কেহ কি আসে,
কে বলে রে ধন্য ধন্য,
এ কার নুপুর বাজে
কার পদরজঃ
পরাণ পঙ্কজ
শোভা করে। হে মিলিত, হে মধুমিলন।
হে পূর্ণ অপূর্ণ তুমি! ধন্য এক জীবন!

'অন্তর্যামী'-তে যে-কবি ভগবানের অভিসারে যাত্রা করেছিলেন,

'কিশোর-কিশোরী'-তে সেই অভিসার-যাত্রা পূর্ণ হয়ে উঠল প্রেমের মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ প্রেমের মধ্যে ভগবানের উপলব্ধিতে। আজ আর কোন চাওয়া নেই—আজ তিনি পূর্ণ, তৃপ্ত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যে কেবলমাত্র কবি ছিলেন, তা নয়। তিনি একজন শক্তিশালী গদ্য লেখকও ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা ছিল সরল ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। তাঁর প্রবন্ধ 'রূপান্তরের কথা' ও 'বাঙ্গলার গীতিকবিতা' এই দুটির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সুগভীর সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের পরিচয়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই সব কিছুকেই একটা সহজভাবে দেখার মন তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর বাস্তবজীবনেও নানা ঘটনার মধ্যে যেমন দেখেছি এই সহজতার প্রকাশ, তেমনি তার সার্থক প্রতিফলন দেখেছি তাঁর সাহিত্য জীবনে। বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙ্গালী জাতি—এই তিনের প্রতিই ছিল তাঁর অন্তরের সুগভীর দরদ।

'রূপান্তরের কথা'

মানুষের জীবনে আসে একটি বিশেষ অনুভূতি—সেই অনুভূতির ক্ষণকেই বলা হয় জীবনের অনন্ত মুহূর্ত, যা থেকে জন্ম নেয় গীতি-কবিতা। প্রাণের সংগে মহাপ্রাণের যে মিলনলীলা সে তো বিশ্বসৃষ্টির আদিকথা। ফুল ফোটানোর খেলার মধ্যে যেমন রয়েছে অনন্তকালের প্রয়াস—বিশ্বসৃষ্টির লীলা, তেমনি সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যেই আছে সেই লীলার আভাস। একজন যখন অপরজনকে নিবিড় করে ভালবাসে, তখন সেই দুয়ের আনন্দের মধ্যে উপলব্ধি করি সেই ভগবানেরই লীলার বিলাস। এই প্রেমের পূর্ণতার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনে ভগবানের উপলব্ধি ঘটে।

তিনি আরও বলেছেন যে, ইন্দ্রিয় জগতে যায় আরম্ভ, অতীন্দ্রিয় জগতে তার পরিসমাপ্তি। অতএব কাব্যের সত্যরাজ্য থেকে এর

একটিকে বাদ দেওয়া যায় না। ইন্দ্রিয়লোক এবং অতীন্দ্রিয় জগৎ, এই দুয়ে মিলেই আর্টের জগতের পরিপূর্ণতা। ইন্দ্রিয় ভোগের মধ্যে তাই কোন পাপ বা অন্যায় নেই। কারণ মানুষ তো দেবতা হয়ে উঠতে পারে না। মানুষের প্রবৃত্তি সত্য, এবং তার মধ্যে রয়েছে-ভগবানেরই লীলারসের পরিপূর্ণতা। ইন্দ্রিয় জগতের মধ্যেই মানুষ শুনতে পায় অতীন্দ্রিয়ের আহ্বান।

শিল্পকলার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। কেউ কেউ বলেন, শিল্পকলার উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া। একদল বলেন, যা কিছু হিতকর এবং মঙ্গলকারী তাই যথার্থ শিল্পকলা। তৃতীয় দলের অভিমত, সামাজিক সংঘাতে পরাধীন প্রাণ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন সেই পরাধীন প্রাণকে একটা স্বপ্নের ঘোরে নিয়ে যাওয়াই শিল্পকলার উদ্দেশ্য।

কিন্তু কেবলমাত্র আনন্দ এবং আমোদের জন্য কল্পকলার সৃষ্টি হলে তার আসল উদ্দেশ্যটাই যায় নষ্ট হয়ে। কারণ সত্য তখনই সুন্দর, যখন তার বাইরের রূপ ভেদ করে ফুটে ওঠে অন্তরের রূপ। আর কল্পকলার উদ্দেশ্যই অন্তর্নিহিত জগতের সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করা! রূপে রূপে রসে রসে যে লীলা, তার ধ্যানজগতে অনুভূতিই কল্পকলা। জীবনের মধ্যে যে সত্য আমরা চোখের সামনে ধরি, প্রকৃতির বুকে যে সব সত্য আমরা জীবন্ত দেখি, কল্পকলা তার সৌন্দর্য নব নব রূপে আমাদের নিকট উদ্ঘাটন করে।

কল্পকলার যিনি স্রষ্টা, অসংখ্য সুরের মাঝে সাক্ষাৎ করেন সেই বিশেষ সুরের, অনন্ত রূপের মাঝে দেখা পান সেই একটি বিশেষ রূপের—যাকে কেন্দ্র করে শুনতে পান বিশ্বের সেই অনন্ত শক্তির আহ্বান। তার প্রাণের এই যে একটি বিশেষ অনুভূতি, সেই অনুভূতিই রূপান্তরের জন্মদাতা। চণ্ডীদাসে ও রামপ্রসাদের গানে এই রূপান্তরের সুরটি অনুভব করা যায়, কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতায় তা যায় না। তার কারণ আমাদের আধুনিক গীতিকবিতা খুব বেশি

রকমের পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনুকরণে কখনও জীবন আসে না। এই সাহিত্যও সেই কারণে অসার ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছে, ভরে উঠেছে শুধুমাত্র কাল্পনিক ভাবুকতায়।

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝে অঙ্গ। যতই তা রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, ততই বেড়ে যায় তার সৌন্দর্য। এই ভাব রূপের মাঝে সত্যরূপে ধরা দেয় প্রেমে।

জীবনের যদি কোন সংজ্ঞা থাকে, তবে তা প্রেম। এই প্রেমের ভুবনের অধিকারী হলেই নিখিল বিশ্বের পরম রসের আভাস পাওয়া যায়। প্রাণ হয় দর্পণের মত স্বচ্ছ আর তার দ্বারাই লাভ করি আত্মার প্রাণময় সৌন্দর্যকে।

বাংলা গীতিকবিতায় এ রূপান্তর ঘটেছে কেবল চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদে। চণ্ডীদাসের কল্পকলার পরিণতি মহাপ্রভুর জীবনে, আর রামপ্রসাদের এই কল্পনার পরিণতি যে জীবনে ঘটেছিল, তা সকলেরই জানা।

কবিতার কথা

কেউ কেউ বলেন, আধুনিক কবিতায় বাস্তবতার অভাব ; অন্য দলের মতে, ভাবুকতাই মানুষের জীবনের সারাংশ। অতএব এই ভাবুকতা ছেড়ে দিলে কবিতার জন্ম হতে পারে না। এ তর্ক অনেকটা ইংরেজী সাহিত্যে আইডিয়ালিজম্ ও রিয়ালিজম্-এর তর্কের মত। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে এ তর্কের সমাধান হয়ে গেছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর Skylark কবিতায় বলেছেন :

> Type of the wise who soar but
> never roam
> True to be kindred points of
> Heaven and Home !

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ—প্রত্যক্ষ রাজ্য ও ভাবরাজ্য—এই দুয়ের

প্রতিই সমানভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমাদের অন্তরের মাঝে সব সময়েই দুটি ভাবের খেলা দেখতে পাই—Subjective ও Objective.

আমরা প্রতিদিন যে জীবন ধারণ করি, সেটা বাইরের জীবন। কিন্তু মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি বলে আর একটা বস্তু আছে, যেখানে মানুষ অনুসন্ধান করে জীবনে সার্থকতার ও সৌন্দর্যের। সারাদিন যে নানা-কাজে ব্যস্ত থাকে, সে-ও মাঝে মাঝে শুনতে পায় সেই অনন্তের বংশীধ্বনি। বাস্তবতার ভূমি ছাড়িয়ে তার মন উপস্থিত হয় অন্য একটি রাজ্যে—জীবনের সেই মুহূর্তটির মধ্যে সে উপলব্ধি করে অনন্ত মুহূর্তের।

কৃষকের জীবন নিয়ে সে-ই কবিতা লিখতে পারে, যে কৃষকের জীবনের সার্থকতার কথা বুঝেছে। উদাহরণ স্বরূপ বার্নসের 'Ploughman'-এর কথা বলা যায়। বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের সার্থক কবিতা কালিদাস রায়ের পর্ণপুটের 'কৃষকের ব্যথা' নামক কাব্যটি।

শুধু নায়ক-নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের সত্য রাজ্যে যে না পৌঁছিতে পারে, তার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের প্রত্যেক সম্পর্কের মধ্যেই একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে এবং সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির প্রাণের খোঁজে ঘুরে বেড়াই। অন্তঃপ্রকৃতির সাক্ষাতেই আসে জীবনের অনন্ত মুহূর্ত এবং অনন্ত মুহূর্তেই জন্ম হয় কবিতার।

হিমালয়ের কোলে ধরণী ও আকাশের মিলনের মধ্যে তিনি সেই অন্তঃপ্রকৃতির সার্থক রূপ লাভ করেছেন। বলেছেন: "এইখানে সংসার ও পরমার্থ, ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃ-প্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, যাহা আত্মা তাহাই দেহ, যাহা অনন্ত তাহাই শান্ত, যাহা পরমার্থ তাহাই সংসার। জীবন এই মহামিলন মন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য।"

এ জীবনে যেমন মাত্র ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নেই, তেমনি

বস্তুহীন কল্পনাও নেই। যা আছে তা জীবনের স্বরূপ এবং তা নিয়েই কবিতা। কেবলমাত্র কল্পনা অথবা কেবলমাত্র রূঢ় বাস্তবের দ্বারা কবিতার সৃষ্টি হয় না। সার্থক কবিতার সৃষ্টি হয় এই কল্পনা ও বাস্তবের সার্থক সমন্বয়ে।

আজকাল আমরা সবাই খেলোয়াড়—কবিতা লিখতে বসে খেলতে বসি। একটা যে কোন ভাব জোগাড় হলেই তাতে রং চড়াই।

আধুনিক কবিতায় যে পরিমাণে ভাবের অভাব, ঠিক সেই পরিমাণেই বেড়ে গেছে ধরনের মাত্রা। তাই আধুনিক বাংলা কবিতায় আন্তরিকতার অভাব বেশ লক্ষ্য করা যায়। এ জন্যই আধুনিক কবিতা পড়লে মনে হয় যেন আমাদের ভাব, ভাষা, ধরন সবই গেছে বদলে। এখন সহজভাবে কথা বলতে বা লিখতে যেন আমরা ভুলে গেছি।

কিন্তু বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলকে সত্য করে তুলতে হলে বাঙ্গালীর কবিতাকে পুনর্জীবিত করে তুলতে হবে; বাঙ্গলা সাহিত্যের সেই হারানো ধারাকে, সেই শীর্ণা সরস্বতী নদীপ্রবাহকে আবার বালুকাবেলার ভেতর থেকে পুনরুদ্ধার করতে হবে।

"আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের কবিতা-মন্দিরে আমি যাকে বাঙ্গলা কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহারই প্রতিষ্ঠা হইবে।"

বাঙ্গলার গীতিকবিতা

বাঙ্গলার প্রকৃতিতে রূপ রসের বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। সে বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে একটি স্বকীয়তা আর সে স্বকীয়তার প্রকাশ গীতিকবিতায়।

ফুলের জন্মের মধ্যে লুকানো আছে অনন্ত কালের স্মৃতি ও সুরভি। হঠাৎ একদিনেই সে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেনি। তেমনি বাংলা গীতিকবিতারও একটি শাশ্বত ধারা আছে। তার জন্মের আদিম প্রত্যূষের খবরটি আমাদের অজানা। সান্ধ্য ভাষায় লেখা পুরাতন বৌদ্ধ 'গান ও

দোহায়' বাংলা গীতিকবিতার প্রথম উন্মেষ দেখতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসে তারই বিকশিত রূপ।

চণ্ডীদাসের গীতিকাব্যে বাংলার মাটি ও বাঙালীর হৃদয়ের যথার্থ সুরটি ধরা পড়েছে। চণ্ডীদাস গেয়েছেন ঃ

মনের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।

এই সুরের মধ্যে মিলে গেল বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় subjective ও objective. বাইরের জগতে যা আমরা দেখি মনের গভীরে তারই প্রতিফলন থেকে জন্ম নেয় গীতিকাব্য। প্রাণের সংগে মর্মের সংগে ভাবের সংগে ধর্মের সংগে—মহামিলন। এই মহামিলন মন্দিরের পূজার আরতি বাংলার গানে। বাংলার ভাষা তার মন্ত্র। সেই বাংলার কবি চণ্ডীদাস। সেই কবিতা বাঙালীর কবিতা।

কিন্তু আধুনিক যুগে এই বাংলা গীতিকবিতা নিয়ে দেখা দিয়েছে মতভেদ। তাই তার সুগভীর প্রাণের সুরটিও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কবি চিত্তরঞ্জন আশা করেছেন, আমরা আমাদের প্রাণের সেই হারানো ধারাটিকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবো।

এখন দেখা যাক, কি করে ধীরে ধীরে জন্ম নিল কবিতা। আদিম মানুষ যখন কুটিরবাসী ছিল, তখন থেকেই তাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছিল একটি সামাজিক ভাব। তারই ফলে তারা দলবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করতো। পূর্ণিমারাতে তারা নাচগান করতো দলবদ্ধ হয়ে। সেই প্রথম হৃদয়ের আবেগ জন্ম নিল গানে। আর এই দলবদ্ধ আবেগই পরিণত হলো স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণে। এই দুজনের মধ্যে যে আবেগ, যে ভাবের আদান-প্রদান, তার থেকেই জন্ম নিল কবিতা। দিন অতিবাহিত হলো, মানুষের মধ্যে এলো তৃষ্ণা—যে তৃষ্ণার পাত্রের মিলন-বিরহকে সে ভরিয়ে তুললো গানে গানে।

কিন্তু যিনি কল্পকলার স্রষ্টা, তিনি এই মিলন-বিরহের মধ্যে আবিষ্কার করলেন সৃষ্টিকর্তার আনন্দকে। তিনি বললেন, ভগবান যুগে যুগে এমনি করেই লীলা করেন। পাখীর মুখে শুনি তাঁর তো আদি অন্ত নেই।

জীবনের এই যে সমগ্র অনুভূতি, এরই নাম সাহিত্য।

মানুষের জীবনের সুনিবিড় অনুভূতির মধ্যেই কল্পকলার কবি লাভ করেন চিরন্তন সত্য। মানুষের প্রেমের লীলায় তিনি অনুভব করেন অনন্তের আভাস। বিশ্বসৃষ্টির খেলায় একজন প্রকৃত কলাবিদের কাছে আলো ও আঁধার সমানভাবেই সত্য। তাই বৈদান্তিকের মায়াবাদে একজন প্রকৃত কলাবিদ কখনও বিশ্বাসী হতে পারেন না, কারণ তাঁর কাছে পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণাও সমমূল্যে মূল্যবান। পাপপুণ্য, সত্য-অসত্য সমস্তই একজন প্রকৃত কলাবিদের কাছে সমান সত্য। ত্যাগের বিরাট ভাবও যেমন তাঁর কাছে সুন্দর, সংসারের স্বার্থপরতার খেলাও তেমনি তাঁর কাছে মধুর। আর এই সমদর্শিতাই ভারতের শ্রেষ্ঠ দান।

সংসার ও পরমার্থ, ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের মিলনে যে জীবন, সে জীবনই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর। আর এই মিলনের মন্ত্র প্রেম। কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছয়, তবে তা প্রাণের কবিতা হয়ে উঠতে পারে না। গীতিকবিতা সেই প্রাণের অতল স্পর্শের মণিমাণিক্যের সঞ্চয়।

এইবার কবিতার ভাষার কথা। ছন্দ, সুর থাকলেই যে কবিতার মধ্যে পরম চিন্তামণির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, একথা জোর করে বলা যায় না। বরং দেখা যায় যে, এই ছন্দ সুর তালই মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য দেখা যায়, যেখানে ভাবের দৈন্য, সেখানেই উপমার প্রাচুর্য। এ যেন অস্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা। ফুল থেকে যেমন তার বর্ণ, গন্ধ আলাদা করা যায় না, তেমনি কাব্যের ভাব ও ভাষা পরস্পরকে আশ্রয় করেই পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সৌন্দর্যকে বাড়াবার জন্য যেমন অলঙ্কার চড়ালে সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয়, কাব্যের ক্ষেত্রেও তেমনি অতিরিক্ত উপমা ও অলঙ্কার একই দোষে দুষ্ট।

এরপর রূপান্তরের কথা। বিশ্বে যে মিলন লীলা, তার মধ্যে ভাগবত সত্যকে তুলে ধরাই হলো রূপান্তরের কথা। প্রাণের সংগে মহাপ্রাণের সুনিবিড় যোগের কথা বর্ণনা করাই রূপান্তরের কথা। বাংলার গীতি কবিতায় সেই মহান সংগীতের সুরটিই বাঁচিয়ে তুলতে চেয়েছেন কবি চিত্তরঞ্জন।

প্রথম গীতিকবিতা সান্ধ্যভাষায় রচিত হয়েছিল। তারপর এলো গৌড়ীয় যুগ—আবির্ভাব ঘটল মহান্ কবি চণ্ডীদাসের। চিত্তরঞ্জন মনে করেন, এই দুই যুগের মধ্যে কালের অপ্রতিহত প্রভাব নিশ্চয় আছে। যে ভাষার ছাঁদ ও রীতি চণ্ডীদাসে ফুটেছে, অনেক ভাঙ্গা-গড়ার ভেতর দিয়ে না গেলে তা কখনও লাভ করা সম্ভব ছিল না।

এরপর বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা—একজন রাজসভার কবি, অপরজন পর্ণ কুটিরের কবি। একজন ভোগসুখে পালিত, অপরজন দুঃখ দৈন্য ও লাঞ্ছনা পীড়িত। বিদ্যাপতির লছিমা দূর আকাশের নক্ষত্রের মত, আর চণ্ডীদাসের রামী তাঁর প্রাণের ভিতর। দুইজনই জীবনের রূপকার, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মতে সমান পারদর্শী নয়।

দুজনেই এসে পৌঁচেছেন কবিতার মিলন-মন্দিরের দ্বারে। দ্বারে এসে থমেক্ গেলেন বিদ্যাপতি। আর চণ্ডীদাস ভেতরে প্রবেশ করে আহরণ করে আনলেন প্রাণ-চিন্তামণিকে। তিনি বললেন :

বঁধু যে নয়নে লুকায়ে থোব
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।

এই রসের সাধনাই গোড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা। এই রস যে রসামৃত মায়াধীশের প্রেমের খেলা।

কেউ কেউ বলেন, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি সুখের কবি। তাঁরা জীবনের সুখ-দুঃখকেই ভাল করে বোঝেননি। সুখ যখন ভাগবত

সত্যে রূপান্তরিত হয়ে ফুটে ওঠে, তখন তা সুখ নয়, দুঃখ। আর, দুঃখ যখন, ভাগবত সত্যে পৌঁছয়, তখন তা দুঃখ নয়, সুখ। তাই চণ্ডীদাস গেয়েছেন :

সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতী
দুখ যায় তার পঞি।

মানুষের এই সুখ দুঃখের লীলার ভিতর দিয়ে চণ্ডীদাস সেই ভাগবত সত্যকেই সার্থক রূপদানের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর কাব্যে তিনি বলেছেন এজীবনের নিবিড় অনুভূতির কথা। এই গভীর অনুভূতি বিদ্যাপতির হয়নি।

একদিকে জীবনের অনুভূতি, অন্যদিকে রসের ভিতর দিয়ে রূপান্তর চণ্ডীদাসের কাব্যের প্রধান কথা। বিদ্যাপতি শুধু রূপ, রসের রসিক, কিন্তু চণ্ডীদাস সেই রূপরসে ডুব দিয়ে আসল মাণিক্যটি তুলে আনলেন বিদ্যাপতি রাধার অন্তরে প্রবেশ করে তার সংগে যুক্ত করে দিলেন আপন মনের কথাকে, কিন্তু চণ্ডীদাস রাধাকে রাধাই রাখলেন এবং রাধার মরম বেদনার ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন সমগ্র বিশ্বের নারী-হৃদয়ের বেদনা—এইখানেই চণ্ডীদাস সার্বজনীন। বিশ্বকে আদর্শ করেই এ রচনা—এ যেন ভারতীয় শিল্পের মন্দির, যার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের সর্বাঙ্গীন রূপের কথা পাওয়া যায়।

চণ্ডীদাসে যে সাধনা শুধুমাত্র ভাব ও রূপে আশ্রয় করে ফুটে উঠেছিল, তা জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করলো মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনে। দিনমণি সূর্যের সংগে যেমন অরুণালোকের সম্পর্ক, চণ্ডীদাসের সংগে চৈতন্যদেবের সেই সম্পর্ক।

চণ্ডীদাসের গানে যে সুরের অভাব ছিল, মহাপ্রভু দিলেন তাকে পূর্ণতা। তিনি বললেন, "হে জগদীশ, আমি তোমার নিকট ধন চাহি না, মনোহর কবিতা চাহি না, এ সকলের কিছুই চাহি না। কিন্তু জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি অহৈতুকী শ্রদ্ধা, ভক্তি জন্মে, এই আশীর্বাদ কর।"—পরমভক্ত হৃদয়ের একান্তভাবে ভগবানের নিকট

আত্মসমর্পণ !

শতেক যুগের সাধনায় যে ফুল ফুটবে, তারই আভাস চণ্ডীদাসে, পরিণতি মহাপ্রভুতে।

এরপর আবির্ভাব ঘটল জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের। কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরা কেউই চণ্ডীদাস থেকে এক পা-ও অগ্রসর হতে পারেননি, তবে সেই মহান্ আদর্শের জন্য সবাই ছিলেন ব্যাকুল। জ্ঞানদাসের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর মুরলীশিক্ষায়।

চৈতন্যের পরবর্তী যুগে একমাত্র লোচনদাসই চৈতন্যের ভাব ও সুরে গেয়েছিলেন। এরপর এ ধারার শেষ। সমগ্র গৌরপদের মধ্যে আমরা এমন একজনও কবিকে পাই না, যিনি এ ধারাকে বজায় রেখেছিলেন।

এখন প্রশ্ন, হঠাৎ এই সুর নেমে গেল কেন? তবে এটা ঠিক, শতেক যুগ ধরে যে ফুল ফুটে উঠতে চেয়েছিল, যার সূচনা ঘটেছিল সান্ধ্য ভাষায়, তারপর কত যুগ অতিক্রান্ত হয়ে তার পূর্ণ পরিণতি দেখেছি চণ্ডীদাসে। তারপর আবির্ভাব ঘটলো চৈতন্যদেবের। সেই ফুলের গন্ধে দশদিক আমোদিত হয়ে উঠল। শত শত যুগের কল্পনা সত্যরূপে প্রতিভাত হলো।

কিন্তু কালে সব কিছুরই বদল হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের সেই সব-জুড়ানো সুধাস্রোতে পড়ল ভাঁটার টান। সূচনা হলো মুসলমান যুগের। মুসলিম ধর্ম থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য হিন্দুরা চারিদিকে এক গণ্ডী টেনে দিল। আত্মরক্ষার জন্যে নিজের মধ্যেই নিজেকে আবৃত রাখল। হারিয়ে ফেলল আত্মবিশ্বাস।

ক্রমে ধর্মও হারিয়ে ফেলল তার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ভাব—এলো নানামত। একদিকে শাক্তের পঞ্চ মকার, অন্যদিকে বৈষ্ণবের শুকনো মালার ঠকঠকি, আর চারিদিকে শৈব দলের হুঙ্কারের ফলে দেশটার হলো রসাতলে যাবার অবস্থা। এতদিন ধরে যে শক্তি সঞ্চয় করে বাংলা দেশ নিজেকে একটা আদর্শের সমান করে এনেছিল, তা গেল

হারিয়ে। সুরু হলো অন্ধকার অভিযান। “তাহার পর কত নিশি পোহাইয়াছে, কত পাখী গাহিয়াছে, অরুণ কিরণে শ্যামলা অঞ্চল উড়িয়াছে, কিন্তু যে মিলনের কথা বলিয়াছি তাহা একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেল।” মুসলমান বাংলা দেশ অধিকার করবার পর বাঙালী শ্রীহীন ও দুর্বল হয়ে পড়লো। মানসিংহ হলেন বাংলার রাজা—বাংলা কবিতা দেশ ছেড়ে পালালো।

এমনি করে সুখে দুঃখে আলো অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আবির্ভাব ঘটলো ভারতচন্দ্রের। তবে ভারতচন্দ্রের কবিতায় বৈষ্ণব প্রভাব থাকলেও তা যে আরবী ও ফার্সী ভাষায় পরিপূর্ণ, একথা অস্বীকার করতে পারি না।

তারপর আর-এক শুভ মুহূর্তে জন্ম নিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ। দেশ আবার ভরে উঠল গানে গানে। তিনি বৈষ্ণবের অহৈতুকী ভক্তির কামনা নিয়ে ডাকলেন ভগবানকে। গাইলেন:

ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী,
নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।

এরপর আবির্ভাব ঘটলো কবিওয়ালাদের। এই যুগকে বাংলার গানের যুগ বলা যেতে পারে। নিধুবাবু, হরুঠাকুর, রূপচাঁদ পক্ষী প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ বসলেন আসন জাঁকিয়ে।

নিধুবাবু গাইলেন, ‘তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।’ এ যেন বাংলার প্রাণে রাগিণী। এর সৌন্দর্য ও গভীরতার তুলনা নেই।

আনন্দের রজনী পোহাল, জাতীয় জীবনে আবার নেমে এলো অন্ধকার। বাঙালী চিরদিনের পূর্ব গগনেই সূর্যের উদয় দেখতে অভ্যস্ত ছিল। পশ্চিম গগনে সূর্যের উদয় দেখে তার চোখ গেল ধাঁধিয়ে। বাংলা আবার হারিয়ে ফেলল তার প্রাণের রাগিনী। পরিশেষে আবির্ভাব ঘটলো ঈশ্বর গুপ্তের—এলেন বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, নীলকণ্ঠ, রবীন্দ্রনাথ। এঁরা সকলেই গীতিকাব্য রচনা করে গেছেন।

কিন্তু গীতিকাব্যে চিত্তরঞ্জন যে রূপান্তরের কথা বলেছেন, ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় তো তা বিন্দুমাত্র পাওয়া যায় না। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' ও 'সারদামঙ্গল' আদরের সামগ্রী সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই রূপান্তরের কথা, এতে তেমন করে ফুটে ওঠেনি।

সেই ধারাকে কিছুটা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন গিরিশচন্দ্র এবং নীলকণ্ঠ কিন্তু কল্পকলার যে স্বর্ণলোক, সেখানে কেউই পৌঁছিতে পারেননি। তবে সব শিল্পীর লক্ষ্য ও সাধনা সেই এক পথে—তা হচ্ছে রূপান্তরে পৌঁছানো। বাংলার প্রাণস্পন্দন শোনা যাচ্ছে—আশা, আবার দিন ফিরে আসবে।

বাঙলার গীতিকবিতা (২য় কল্প)

বাংলার রূপের যে মধুর পরিচয়, তা ছড়িয়ে আছে আকাশে, বাতাসে, জলে, মাটিতে—এক্ষেত্রে বিশেষ করে মাটির ভূমিকা অনন্য। মাটি শুধুমাত্র আমাদের শরীরই দান করে না, মন প্রাণে উৎসাহ দিয়ে করে আমাদের নবজীবন দান, প্রাণের মধ্যে জ্বালিয়ে দেয় প্রদীপ। মুসলমান আমলের অনাচারের যুগে সাধক কবি রামপ্রসাদের দ্বারা বাংলার উষর ভূমিতে জ্বলে উঠেছিল সে প্রদীপ। আবার সেই নিভে যাওয়া প্রদীপকে ফেরেঙ্গবাদ যুগেও গঙ্গাতীরে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

চণ্ডীদাস, মহাপ্রভু, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ বাঙালী জাতির অস্তিত্বকে সজাগ করে দিয়ে গেলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ আমরা সোনা ফেলে কাঁচকে আঁচলে বেঁধেছি। এর কারণ, আমাদের জাতীয় জীবনের চরম অধঃপতন, আর তার প্রভাব পাশ্চাত্য আবহাওয়া। এই পাশ্চাত্য আবহাওয়ার কবল থেকে মুক্ত হয়ে যদি আমরা দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করি, তবেই আমাদের পূর্ব মর্যাদা আমরা আবার ফিরে পেতে পারি।

বাংলার এই প্রাণ এই অনুভূতি লুকিয়ে আছে বৈষ্ণব সাহিত্যে।

বৈষ্ণব সাহিত্য খাঁটি বাংলার প্রাণের জিনিস। অতএব বাংলার প্রাণকে জানতে হলে জানতে হবে বৈষ্ণব সাহিত্যকে। অবশ্য তাই বলে কবি চিত্তরঞ্জন একথা বলছেন না যে, এই আধুনিক যুগকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে সেই বৈষ্ণব যুগে। কারণ, নদীস্রোতের মত যুগকে ফিরিয়ে আনা যায় না। —আনলে সে যুগের আবহাওয়া দ্বারা জীবনকে জীবনের ধর্মকে স্বাভাবিক করতে হবে।

কেউ কেউ বলেন, বহুদিন আমাদের জাতি পরমুখাপেক্ষী থাকার ফলে তার অনুশীলন ও বৃত্তিসমূহ নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু সেকথা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। তা যদি হয়, তবে চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ তো আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার দিনে জন্মাননি। তবু দারিদ্র্য, পরাধীনতা তো তাঁদের মনের বৃত্তিকে নষ্ট করতে পারেনি। স্বাধীনতা মানুষের অন্তরের জিনিস। সেই অন্তরকে বিকশিত করে তুলতে হবে। তার গভীরে জ্বালাতে হবে জ্ঞানের দীপ, তবেই সার্থক হবে সাধনা আর সে সাধনাকে পরিপূর্ণ করবে খাঁটি বাংলার মর্মমূলের অন্তরঙ্গ সুর বৈষ্ণব সাহিত্য।

এই বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে আধুনিক পাশ্চাত্যপন্থী সমাজের কাছ থেকে শুনতে হয় নানা অভিযোগ। কেউ কেউ বলেন, বৈষ্ণব সাহিত্য রূপক। ইউরোপীয় সাহিত্যের অভিজ্ঞতা দিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যকে বুঝতে গেলে রূপকের আবশ্যক হয় সত্যি কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বৈষ্ণবের সাধনা বাঙালীর সাধনা। বৈষ্ণব কবিদের প্রতিটি অনুভূতি তাদের হৃদয়ের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি না করলে বৈষ্ণব কবিতার রসমাধুর্য অনুধাবন করা যাবে না। বৈষ্ণব কবিদের আদর্শ রাধাকৃষ্ণ সবই চরম ও পরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক সত্য—যুগে যুগে মহাপ্রাণের ভিতর সেই লীলা আভাস চঞ্চল মূর্তিতে বাংলা ও ভারতবর্ষে মুখরিত ও বিকশিত।

দ্বিতীয়তঃ, বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে অভিযোগ যে, তাতে ইন্দ্রিয়ের গন্ধ বড় বেশি। কিন্তু মানুষের রক্ত মাংসের দাবীকে অস্বীকার করে পৃথিবীর মাটিতে কোন ভালবাসার কথাই সত্য হয়ে উঠতে পারে না। আধুনিক ইংরেজ নবীনদের পাল্লায় পড়ে শুনতে হচ্ছে বৈষ্ণব সাহিত্য erotic—কিন্তু বাংলা সাহিত্য চিরকালই ইন্দ্রিয়কে সত্য বলে গ্রহণ করেছে। বৈষ্ণব-কবি জানেন যে, তাঁর দেহে মনে এবং প্রাণে দ্বৈতাদ্বৈতের লীলা চলছে। এ ইন্দ্রিয় ভাগবত ভোগের ইন্দ্রিয়।

খৃস্টান পাদরীদের কাছে আমাদের এই ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য পাপবোধ বলে অনেকদিন ধরেই শুনে আসছি। আর আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তার সংগে তাল মিলিয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যকে erotic পদবাচ্য বলে দূরে সরিয়ে রাখছি। কিন্তু এই ফেরঙ্গ যুগের দূষিত আবহাওয়া থেকে মুক্ত হয়ে চণ্ডীদাস ও চৈতন্যদেবের আদর্শিত পথকে অনুসরণ করে বাংলার আদর্শকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে।

আমাদের আধুনিক কবিরা কি করছেন? তাঁরা আত্মাকে চোখের সামনে রেখে প্রেমের মধুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। আত্মায় আত্মায় যে মিলনের আনন্দ তার রূপকে তাঁরা তুলে ধরতে পারেননি। তারা কেবল সমুদ্রের তীর থেকে শুকনো ফেনা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে বোঝা বাড়িয়েছেন।

আমাদের গানের সঙ্গে বিলাতী গীতিকবিতার পার্থক্য আছে। বিলাতী গীতিকবিতা বিশ্বের সব জিনিসকেই নিজের প্রাণের ভিতর টেনে নেয়, তারপর সেই ভাবকে নিজের মনের মত করে প্রকাশ করে। সুতরাং তার মধ্যে কবির ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকে লেগে।

আমাদের দেশের রামপ্রসাদ, চণ্ডীদাস বা কবিওয়ালারা কেউই এ ধরনের গীতিকবিতা লেখেননি। সেখানে আমরা কবিকে দেখি দ্রষ্টা, দুজনের প্রাণের খেলায় দর্শক হয়ে আনন্দরস উপভোগ করছেন। সেই আনন্দের প্রকাশ কবিতার ছত্রে ছত্রে। ইংরেজী গীতিকবিতায় ভাবের রূপ কবির মনের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বাংলা গীতিকবিতা

তার আত্মার নিজস্ব সম্পদ।

প্রাণের ভিতর দিয়ে যখন ভগবৎ অনুভূতির একাত্মতা আসে, তখনই ঘটে জীবনে রূপান্তর। এই রূপান্তর এসেছিল বুদ্ধের জীবনে, চণ্ডীদাসের জীবনে, মহাপ্রভুর জীবনে, রামপ্রসাদের জীবনে। বাংলা দেশের গান ও চিত্রে সেই আধ্যাত্মিক ভাব-ভাবনার ছবিই ফুটে উঠেছে।

বাংলাকে এই ফেরঙ্গ আবহাওয়ায় দীক্ষা দেবার গুরু কে? তিনি রামমোহন রায়। রামমোহন রায় আরবী ও ফার্সী পণ্ডিত হয়ে যে মনোভাব গড়ে তুলেছিলেন, সেই ছাপে বাংলার ধর্মকে ভেঙে সমাজ সংস্কারের জন্য গড়ে তুলেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ। পৌত্তলিকতার ওপর আঘাত হানলেন—বৈষ্ণব ধর্মের ওপর অযথা অন্যায় অবিচার করলেন। রামমোহনের হাতে পড়ে হিন্দুর দেবদেবীর যে দুর্গতি হলো, তা আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পেলো রামকৃষ্ণ দেবের যুগে।

রামমোহন রায় প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলার প্রাণের মর্মমূলটির সংগে তাঁর পরিচয় ছিল না। তাই, বাংলার নিজস্ব বৈষ্ণব ভাবকে পরিত্যাগ করে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন মায়াবাদী বেদান্ত এবং কোরাণের সংগে হিন্দুর শাস্ত্রকে ফেললেন গুলিয়ে।

একথা চিত্তরঞ্জন জোরের সংগেই বলেছেন যে, আমাদের দেশে এই ফেরঙ্গবাদ এই ইংরেজী আবহাওয়ার আমদানী হতো না, যদি না তাকে রামমোহন বরণ করে ঘরে তুলতেন।

রামমোহনের জ্ঞানবুদ্ধির কাছে তর্কের অবকাশ নেই সত্যি, কিন্তু এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মায়া নয়, ভগবান যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখের লীলায় সমভাবে বর্তমান, একথা শঙ্করশিষ্য রামমোহন বুঝতে পারেননি।

এ জীবন স্বপ্ন নয়, সত্যি। কিন্তু এ জীবনের ওপর এবং সবচেয়ে বড় কথা নিজেদের ওপর আমরা হারিয়েছি বিশ্বাস। তাই ধানের

ক্ষেতের দোলা, আকাশের রং আমাদের আধুনিক সাহিত্যের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। যদি পারতো, তাহলে মায়ের আঁচলে সোনা ফলতো।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত ধারা লক্ষ্য করা যায়—মুসলমানী ধারার পাশে যেমন আবির্ভাব ঘটেছিল রামপ্রসাদের। তেমনি রামমোহনের পর এলেন কবিওয়াল—গানে গানে ভরিয়ে তুললেন ভুবন। এই কবিওয়ালার পর আবির্ভাব ঘটল ঈশ্বর গুপ্তের—হাস্যরসের সুধাভাণ্ড নিয়ে। অর্থাৎ একটা অবরোধের পর আবার আসে স্বতঃস্ফূর্ততা, বাংলাদেশ আপনাকে জাগিয়ে তোলে।

আজ ফেরঙ্গ যুগের আবহাওয়ায় আকাশ অন্ধকার। একটিও তারা নেই। দেশবাসী অসহ্যরূপে চঞ্চল হয়ে উঠেছে—কোথায় বাংলার আত্মা, জাগরিত হও, বলো—বাংলার আত্মা আমরাই গড়ে তুলবো, বাংলার সাহিত্য আমরা নিজেদের প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে পরিপুষ্ট করে তুলব।

'ডালিম' গল্প

প্রেম মানুষের জীবনে অনন্ত মুহূর্ত। প্রেমের মুগ্ধতায় মানুষ নিজেকে করে আবিষ্কার। প্রেমের আবির্ভাবে পুরনো অভ্যস্ত জীবনের ভাল লাগা মন্দ লাগা সব মুহূর্তের ফুৎকারে উড়ে যায় কালবৈশাখীর ঝড়ের মত।

'ডালিম' গল্পের নায়ক উশৃঙ্খল ধনী সমাজের প্রতিনিধি। চল্লিশ-উত্তীর্ণ একজন মানুষ, যে জীবনকে ভাবতো হাসি ছড়ানো আর ফুল কুড়ানোর মেলা। এই হাসি ঝরানোর বাসর ঘরে এলো তার জীবনে ব্যথার রজনী—তা বয়ে আনল এক নারী দুটি চোখের অপূর্ব মণিদীপ জ্বালিয়ে।

প্রতিবারের মত সে এসেছিল পূর্ণবাবুর বাগানবাড়ীর আনন্দ উৎসবে। কিন্তু সেদিন প্রথম থেকেই কেমন করে যেন তার মনের

তন্ত্রীটি গিয়েছিল ছিঁড়ে। বন্ধুরা হাতে তুলে দিল সুরার পাত্র। ওদিকে বাঈজী নাচের তালে তালে গান করে চলেছে—চমকি চমকি যাও। চারিদিকে ফুলের সুবাস, মদের গন্ধ, সিগারেটের ধোঁয়া—সব মিলিয়ে এক বিচিত্র অনুভূতির জগৎ। কিন্তু গল্পের নায়কের মনটা এই আনন্দ উৎসবের মাটি ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেক দূরে—চোখ পড়ল এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে থাকা একটি অতি সাধারণ মেয়ের দিকে। তার চোখ দুটি যেন উদাস ভাব। মুহূর্তের মধ্যে তার প্রাণের মধ্যে কি যেন এক অব্যক্ত সাড়া অনুভব করলো।

নায়ক পরে জানল, মেয়েটির নাম ডালিম। এই কোণে জড়সড় হয়ে বসে থেকেই সে লোক ধরে। শুধু তাই নয়, এই কলকাতার কত কাপ্তেনকে ভাসিয়েছে সে। কিন্তু এদের কথার সংগে তো মেলে না মেয়েটির নয়নের ভাষা! বাঈজীর নৃত্যগীত শেষ হলো, নায়কের বিশেষ অনুরোধে ডালিম গান ধরলো ঃ—

কেমন করে মনের কথা কইব কানে কানে,
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে।
প্রাণের পাতে ফুলের মত
রাখব তোমায় অবিরত
তফাৎ থেকে দেখব শুধু, রাখব প্রাণে প্রাণে।

গানের সুর, গানের কথা যেন তার হৃদয়ের কান্না হয়ে ঝরে পড়ল। নায়ক মুগ্ধ হলো—ভাবলো, এমন গান তো সে জীবনে শোনেনি। আনন্দের প্রমত্ততায় বন্ধুরা আলো নিভিয়ে দিল। নায়ক ডালিমকে বুকে চেপে ধরলো। তারপর দুজনে মিলে এলো নির্জন লতাবিতানে। নায়ক অনুভব করলো তার পুরনো পৃথিবী যেন তার চোখের সামনে থেকে সরে গেছে—ডালিমকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তটির ওপর সে যেন হয়ে গেল এক নতুন পৃথিবীর সম্রাট। যে ভুবন কেবল দুজনেরই সৃষ্টি। নায়কের অনুরোধে ডালিম তার ব্যথাভরা জীবনের কাহিনী শোনাল।

ছোটবেলায় বাবা মা মারা যায়—মামাবাড়ীতে মানুষ। মামা-মামীর অত্যাচারের সীমা ছিল না। তারপর বিয়ে হলো, শ্বশুর ঘর করতে এলো। স্বামী যে কেমন, তা ভাল করে চোখেও দেখেনি। শুধু নীরবে সহ্য করেছে শাশুড়ীর অত্যাচার। কিন্তু একদিন বুঝি তা অসহ্য হয়ে উঠল, যেদিন শাশুড়ী তার প্রিয় গ্রন্থগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

প্রতিদিন সে যখন পুকুরঘাটে বাসন মাজতে যেত, একটি ছেলে নীরবে শুধু তার দিকে তাকিয়ে থাকত। শাশুড়ীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ছেলেটিকে বললো, 'আমাকে আমার মামার বাড়ী পৌঁছে দাও।' ছেলেটির সংগে মামার বাড়ী এলো। কিন্তু মামী মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। আবার ফিরে এলো শ্বশুর বাড়ী, কিন্তু সেখানেও একই ঘটনা ঘটল। ছেলেটি সব সময়েই সংগে সংগে ছিল। এবার সে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবে!
—যেখানে ইচ্ছে।

তারই ফলে আজ সে কলকাতার নামকরা বেশ্যা ডালিম। প্রথম সাতদিন ছেলেটি আঠার মত গায়ে লেগে থাকতো—তারপর তাকে আর দেখা গেল না। কোনদিন না! মেয়েটি এই পর্যন্ত বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল। বলল, আজ জীবনে আমি সুখ-ঐশ্বর্য সবই পেয়েছি, কিন্তু পাইনি ভালবাসা।

সেই নিভৃত নির্জন রাতে নিবিড় সান্নিধ্যে অনেক সময় তারা দুজনে এক সংগে কাটিয়েছিল। তারপর কোন এক সময় কিছু না বলে ডালিম বিদায় নিয়েছিল। নায়ক তার বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ করেছিল, দেখা পায়নি, শুধু পেয়েছিল একটি চিঠি।

তুমি আমাকে খুঁজিতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। মনে করিও, আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই, মরিতে পারিব না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ,

তাহা আমি এজীবনে কখনও পাই নাই। তাহারই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহি। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসারে যাহাকে সুখ বলে, তাহাও পাইয়াছি। কিন্তু কাল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি, তাহা কখনও পাই নাই। তাহারই স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি তাহা আর হারাইতে চাই না। তুমি আমাকে খুঁজিও না। প্রাণসর্বস্ব আমি বড় দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বাড়াইও না। এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই।—তালিম।

এ ছাড়া সাহিত্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগ স্বরূপ ১৯১৪ সালে তিনি প্রকাশ করেন 'নারায়ণ' নামক মাসিক পত্রিকা। পাশ্চাত্য আবহাওয়ার প্রভাবে যখন বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য ম্লান হয়ে আসছিল, চিত্তরঞ্জন তাকে নতুন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। 'নারায়ণ' একটি খুবই উঁচুদরের মাসিক পত্রিকা ছিল—তৎকালীন প্রতিটি নামী ও দামীলোকের রচনাসম্ভারে পরিপুষ্ট হতো এই পত্রিকাখানি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিন বিহারী পাল, শরৎচন্দ্র এবং আরও প্রখ্যাত ব্যক্তিরা এ পত্রিকায় লিখতেন। এর বঙ্কিম সংখ্যা অতি সুন্দর ছিল। তাছাড়া দুর্গোৎসব এবং এই ধরনের আরও উচ্চমানের প্রবন্ধ বের হতো। প্রচুর অর্থব্যয় করতেন তিনি এই পত্রিকাটির জন্য। প্রত্যেক লেখককেই পরিশ্রমের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছিলেন বাংলার বাণীর বৈশিষ্ট্যকে, যা ছিল তাঁর মর্মমূলে।

দেশবন্ধুর অপ্রকাশিত গান

মিটাও না এই পিয়াসা
এই তো আমার মিষ্টি লাগে।
ওগো বিরহী! চির বিরহী
এই তৃষ্ণা যেন নিত্য জাগে!
মিলন আমি চাই না হে
এই তিয়াসা যেন থাকে
চোখের জলে এত মধু!
প্রাণ বঁধু হে, প্রাণ বঁধু!
মুছায়ো না চোখের বারি।
নাই-বা এলে আঁখির আগে!
নাই-বা হলো মিলন যদি
এই বিরহ নিত্য জাগে।

দেশবন্ধুকে নিবেদিত

নচিকেতা ভরদ্বাজ

মানুষের জন্য যারা সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে, মানুষের
কথা ভেবে, মানুষের অন্তহীন দুঃখ আর যন্ত্রণার কথা,
পরাধীনতার জ্বালা, মানুষের পাশে এসে
সব ফেলে দাঁড়াতে যে পারে
এবং যে বুকের মধ্যে অস্থির মহাজীবনের
বহ্নি জ্বালা: সে রকম লোক খুব বেশি নেই পৃথিবীতে,
অথচ তাদেরই জন্যে পৃথিবীর আশ্চর্য বহতা।

তারাই প্রাণের নদী ছুঁয়ে গেছে শান্তি সঙ্গীতে,
তারাই প্রীতির জন্য পারাপার করে গেছে প্রাণের নদীতে।

"কে পেয়েছে সব চেয়ে—কে দিয়েছে তাহারও অধিক।"
এবং প্রাণের সর্তে দুঃস্থ এই জীবনের সহজ শরিক।
"দাও আর ফিরে নাহি চাও—থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"
সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তবু কার সম্রাটের মতন উজ্জ্বল
আভিজাত্য ? কোটি কোটি হৃদয়ের দুর্লভ বিজয়ী সিংহাসন
কার জন্য সংরক্ষিত—কে কোথায় দেখেছে এমন!
পিতার হৃদয় নিয়ে কে এমন প্রসারিত হাতে
সকলকে বুকে নিয়ে—সকলের কথা ভেবে
অনুভাবী আহত দুর্জয়
দুর্বার নদীর মত বেরিয়েছে অন্তহীন রাতে
সার্বজন্য সুধার সন্ধানে।

দেশের দশের জন্য কার এমন সমর্পিত স্বচ্ছন্দ হৃদয়।
তোমার মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়
এত ব্যাপ্ত ভালোবাসা কোনদিন দেখিনি এখানে ত!
বন্ধ্যা এ মাটিতে তুমি দুর্লভ বিস্ময় :—

একশ বছর আগে যে নদীটি বয়েছিল আমাদের ধূসর প্রান্তরে
দুকূলে এখনো তার সৃষ্টির সবুজ স্নিগ্ধ সমারোহ ;
পললে প্রস্তরে
এখনো সে নদীটির নিহিত স্বাক্ষর,
যদিচ এখন এই দুর্বিনীত বালুরাশি চারিদিকে
সর্বগ্রাসী ঝড়,
তবুও যে তাঁকে মনে পড়ে॥

গ্রন্থপঞ্জী

১। মানুষ চিত্তরঞ্জন—অপর্ণা দেবী

২। কবিচিত্ত—অপর্ণা দেবী সম্পাদিত

৩। দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

৪। দেশবন্ধু স্মৃতি—হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

৫। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুকুমার রঞ্জন দাশ

৬। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—কুমুদ রায় চৌধুরী

৭। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুধাকৃষ্ণ বাগচী

৮। গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

৯। চিত্তকথা—শৈলেন্দ্র নাথ বিশী

১০। জাতীয় মহাযজ্ঞের ইতিহাস—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১১। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত

১২। মায়াবতীর পথে—উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

১৩। যা পেয়েছি যা দেখেছি—সুধীররঞ্জন দাশ

১৪। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

১৫। শরৎচন্দ্র—গোপাল রায়

১৬। আমি সুভাষ বলছি—শৈলেশ দে

১৭। শরৎচন্দ্র—কানাইলাল ঘোষ

১৮। দেশবন্ধুর কথা—সত্যকিঙ্কর বিশ্বাস

১৯। জহরলালের আত্মজীবনী

পত্রিকা : প্রবাসী, বঙ্গবাণী, মর্মবাণী, নারায়ণ।